পল্লীবৈচিত্র্য

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়

রায় এণ্ড রায়চৌধুরী
কলেজষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

প্রকাশক :—
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী।
রায় এণ্ড রায়চৌধুরী
২৪নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, (দোতালা)
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীগোষ্ঠবিহারী মান্না
—মিত্র প্রেস—
৪৫নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য আড়াই টাকা।

নিবেদন

মৎপ্রণীত 'পল্লীচিত্রে' পল্লীসমাজের বিশেষত্ব সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিতে পারি নাই, 'পল্লীবৈচিত্র্যে' সেই সকল কথার আলোচনা করিলাম। যে সকল সাহিত্যরসজ্ঞ পাঠক মহোদয় পল্লীচিত্রখানি পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন, এই পুস্তকখানিও তাঁহাদের সাহিত্যরসলিপ্সা পূর্ণ করিবে, বন্ধুগণের নিকট এরূপ আশা পাইয়াই ইহার প্রচারে হস্তক্ষেপ করিয়াছি; কিন্তু এ আশা দুরাশা কি না—পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন। পল্লীবৈচিত্র্যখানি শিক্ষিত পাঠকসমাজে পল্লীচিত্রের ন্যায় সমাদৃত হইলে শ্রম সফল মনে করিব।

বঙ্গে আজ বাঙ্গালীর হৃদয়ে নূতন স্পন্দন অনুভূত হইতেছে, আজ যেন হঠাৎ বাঙ্গালীর নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে; আজ আপনার জননীকে আমরা চিনিয়াছি; জননীর যাহা আপনার, তাহার আদর করিতেছি, তাহা গৌরবের সহিত গ্রহণ করিতেছি! আজ বঙ্গলায় যে বাতাস বহিতেছে, —তাহা সহস্রাধিক বর্ষের অভিশপ্ত পতিত জাতির দীর্ঘশ্বাসে যেন কলুষিত নহে।

কিন্তু আমরা এই কোটী কোটী বাঙ্গালী,—সকলেই কি নগরবাসী? সাত কোটী বাঙ্গালীর কয় জন নগরে বাস করেন?—কয় দিনের জন্য বাস করেন? অধিকাংশ বাঙ্গালীই পল্লীবাসী। আমরা পল্লী-গ্রামের গাছের ছায়ায় মানুষ হইয়াছি; পল্লীগ্রামে প্রভাতে নদীর ধারে আমবাগানে যে পাখী ডাকিয়াছে, তাহার কলগীতে আমাদের

নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে; সেখানকার নাপিত কাকা, পুরুত জ্যাঠা, কামার দাদা, গয়লা মাসী ও মালী-বৌ আমাদের কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে; সেখানে দেবায়তন হইতে প্রতিদিন যথানিয়মে সংকীর্ত্তনধ্বনি উত্থিত হয়, প্রভাতে ও সন্ধ্যায় কাঁশর ঘণ্টার সুরব ধূপ-ধূনার সৌরভের সহিত মিশিয়া বায়ুপ্রবাহে ভাসিয়া যায়; সেখানে হেমন্তের প্রভাতে শ্যামল শস্যক্ষেত্র ও পত্রপুষ্পশোভিত সুদৃশ্য কুসুমকুঞ্জ নির্ম্মল শিশিরবিন্দুতে ঝল্‌মল্ করে; এবং বসন্তের শুক্লাযামিনীতে বিমল চন্দ্রকিরণে বংশতরুবেষ্টিত ক্ষুদ্র মৃৎকুটীরগুলি চিত্রবৎ প্রতীয়মান হয়। আজ আমাদের স্নেহময়ী বঙ্গজননীর সেই সুরম্য লীলানিকেতন,—আমাদের বহু স্বদেশ-বাসীর সুমধুর শৈশবের সেই সুখময় ক্রীড়াকুঞ্জ, ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ পরিশ্রান্ত যৌবনের সেই আরামপ্রদ বিশ্রামনিলয়, তাপদগ্ধ কর্ম্মহীন বার্দ্ধক্যের সেই শান্তিময় অন্তিম আশ্রয়—বঙ্গপল্লীর বৈচিত্র্যের কথা কি এই অপবিত্র প্রণয় ও ব্যভিচারে পূর্ণ লোমহর্ষক উপন্যাসের হলাহলে জর্জ্জরিত সমাজের বক্ষে এক বিন্দু সুখের ও শান্তির হিল্লোল বহন করিয়া আনিবে না? বলা বাহুল্য, সে চেষ্টা যদি বিফল হইয়া থাকে, সে অপরাধ আমার; পল্লীজননীর দৈন্য তাহার কারণ নয়।

মেহেরপুর, নদীয়া।
১লা আশ্বিন, ১৩১২ সাল।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

নব সংস্করণের কথা

১৩১২ সালে, স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগে 'পল্লীচিত্রে'র শেষার্দ্ধ 'পল্লীবৈচিত্র্য' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং পল্লীচিত্রের দ্বিতীয় সংস্করণের সঙ্গে সঙ্গে কয়েক মাসেই তাহা নিঃশেষিত হইয়াছিল; তাহার পর সুদীর্ঘ সপ্তদশ বৎসর অতীত হইয়াছে! তখন যাহাদের 'হাতে খড়ি' হয় নাই, এখন তাহারা এক এক জন বিদ্যার জাহাজ; সুতরাং এখন এ পুস্তক অনেকেরই পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন, এই নগণ্য সেকেলে গ্রন্থকারও নব্য বঙ্গের অপরিচিত।

এখন স্বদেশীর দ্বিতীয় যুগ চলিতেছে; কিন্তু সপ্তদশ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ প্রকাশের উপযোগিতা সম্বন্ধে যাহা 'নিবেদন' করিয়াছিলাম, তাহার অতিরিক্ত আর একটি কথাও নূতন করিয়া বলিবার নাই; তথাপি প্রসঙ্গ-ক্রমে দুই একটি কথা বলিতে হইতেছে। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে, আমাদের শৈশবকালে বঙ্গপল্লীতে উৎসবানন্দের যে চিত্র ও বৈচিত্র্য দেখিতে পাইতাম, পল্লীবাসীদের ক্রিয়াকর্ম্মে, সামাজিক সম্মিলনে যে প্রাণস্পন্দন, যে হর্ষোচ্ছ্বাস অনুভব করিতাম, তাহার শতাংশও এখন নাই! বঙ্গপল্লীর সে শ্রী নাই, সে মাধুর্য্য বিলুপ্ত; যাঁহারা পল্লীদেহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতেন, পল্লীবক্ষে আনন্দরসের উৎস উৎসারিত করিতেন, ত্যাগে ও ভোগে সমান অবিচল থাকিতেন,—তাঁহারা একে একে সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহাদের কেহ নির্ব্বংশ, কাহারও বংশধরেরা নদীমেখলা বনরাজিকুণ্ডলা শস্যশ্যামলা পল্লীজননীর স্নেহাঞ্চলচ্ছায়া হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, এক মুষ্টি অন্ন সংস্থানের আশায় সুদূর প্রবাসে সপরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বঙ্গপল্লী আজ নিরানন্দময় শ্মশান, চতুর্দ্দিক

নীরব, নিস্তব্ধ! এই অন্ধকারাচ্ছন্ন শ্মশানে আজ একাকী বসিয়া অশ্রুরুদ্ধ নেত্রে বাল্যের সেই উৎসবানন্দের ও সুখ দুঃখের স্মৃতির রোমন্থন করিতেছি!

এই পুরাতন স্মৃতির নিদর্শন স্বরূপ এতদিন পরে 'পল্লীবৈচিত্র্য' পুনঃ-প্রকাশের জন্য আগ্রহ হইয়াছিল; কিন্তু বাঙ্গলার রস সাহিত্যের অন্তর্ভূত বহু সদ্‌গ্রন্থের প্রকাশক—রায়, রায়চৌধুরী একমাত্র স্বত্বাধিকারী শ্রীমান্ নলিনীমোহন রায়চৌধুরী বি, এ, ইহার প্রকাশ-ভার গ্রহণ না করিলে আমার এই আগ্রহ পূর্ণ হইত কি না সন্দেহ। 'পল্লীচিত্র' প্রকাশের জন্য তিনি সাহিত্য-সমালোচকগণের ও বহু শিক্ষিত পাঠকের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। তাঁহার এই ব্যয় সাধ্য অনুষ্ঠান সফল হইলেই আনন্দের বিষয় হইবে।

বঙ্গপল্লীর বর্ষার্দ্ধব্যাপী বিবিধ উৎসবের চিত্র 'পল্লীচিত্রে' অঙ্কিত হইয়াছে; আর বৎসরের শেষার্দ্ধে—কার্ত্তিক হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত যে সকল উৎসবের অনুষ্ঠান হইত, তাহাদের অনতিরঞ্জিত চিত্র 'পল্লীবৈচিত্র্যে' সন্নিবিষ্ট করিয়া এই উভয় পুস্তকে বঙ্গপল্লীর উৎসব-চিত্র সম্পূর্ণ করিয়াছি। আশা করি পল্লীচিত্রের আধুনিক পাঠকগণের নিকটে ও পল্লীবৈচিত্র্য উপেক্ষিত হইবে না।

আজকাল কোন কোন প্রতিভাবান নূতন লেখক পল্লীজীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না করিয়া, এমন কি, পল্লীবাসীদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে না আসিয়াও, সহরে বসিয়াই তাঁহাদের অপূর্ব্ব রচনা-কৌশলে, কল্পনার কুহকময় তুলিদ্বারা যে সকল ঘোরাল রঙ্গের উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিতেছেন, তাহাই তাঁহারা আমাদের পল্লীজীবনের ও পল্লীসমাজের আলেখ্য বলিয়া অকুতোভয়ে পাঠক সমাজে চালাইয়া আসিতেছেন; অঙ্কন-কৌশলে সেই সকল অতিরঞ্জিত কাল্পনিক চিত্র আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া অসঙ্কোচে সত্যের শাসন অধিকার করিতেছে! বলা বাহুল্য, আমাদের এই সকল কলা-কৌশলহীন চিত্রের সেরূপ মনো-রঞ্জিনী শক্তি নাই; তবে বঙ্গপল্লীর এই অখ্যাত চিত্রকর বানরকে বানর

করিয়াই আঁকিয়াছে, কল্পনার ও কলাকুশলতার দৈন্যবশতঃ বানরকে শিব সাজাইয়া বা শিবকে বানরের মুখোস পরাইয়া পাঠকসমাজে জাহির করিতে পারে নাই। এই জন্যই আশঙ্কা হইতেছে বাঙ্গলার মনমাতানো কলার হাটে কলা-কৌশল বর্জ্জিত এই সব অনতিরঞ্জিত চিত্র হয় ত বিকাইবে না!—সুতরাং সতের বৎসর পরে এই পুরাতন চিত্রগুলি নূতন করিয়া তুলি বুলাইয়া এ হাটে বাহির করা সঙ্গত হইল কি না বুঝিতে পারিতেছি না।

মেহেরপুর, নদীয়া।
১লা চৈত্র, ১৩২৯ সাল।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

ভূমিকা

আমার পরমস্নেহভাজন সুলেখক শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের 'পল্লীচিত্র' পল্লীবাসিগণের দৈনন্দিন জীবনের আলেখ্য; কিন্তু পূজা পার্ব্বণ উপলক্ষে এই পল্লীজীবনে যে আনন্দের উচ্ছ্বাস, যে অপূর্ব্ব উন্মাদনা, যে যে বিশেষ ভাবের অভিব্যক্তি হয়, তাহা বড়ই উপভোগ্য; তাহাই পল্লীজীবনের বৈচিত্র্য। সুনিপুণ সহৃদয় চিত্রকর সেই জন্যই এই পুস্তকের নাম 'পল্লীবৈচিত্র্য' রাখিয়াছেন।

পল্লীজীবনের এই সরল সুসধুর বৈচিত্র্য ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতেছে; কিছু দিন পরে হয় ত ইহার অস্তিত্বই লুপ্ত হইবে। যাদুঘরে রক্ষিত লুপ্ত জীবের দেহাবশেষ দেখিয়া আমরা অতীতের কতকটা অনুমান করিতে পারি। পরিবর্ত্তনের প্রবল প্রবাহে বাঙ্গালীর সবই ভাসিয়া যাইতেছে:—দীনেন্দ্র বাবুর 'পল্লীবৈচিত্র্য'ও যে কিছু দিনের মধ্যে পল্লীর চিত্রশালায় পরিণত হইবে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে?

কলিকাতা

শ্রীজলধর সেন।

পল্লীচিত্র

(উত্তর খণ্ড)

কার্ত্তিক—চৈত্র

"আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥
ওমা ফাগুনে তোর আমের বনে
ঘ্রাণে পাগল করে,
ওমা অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে
কি দেখেছি মধুর হাসি॥

* * *

ধেনু-চরা তোমার মাঠে,
পারে যাবার খেয়াঘাটে,
সারাদিন পাখী-ডাকা, ছায়ায় ঢাকা
তোমার পল্লিবাটে,—
তোমার ধানে ভরা আঙিনাতে
জীবনের দিন কাটে
ওমা আমার যে ভাই তারা সবাই
তোমার রাখাল তোমার চাষী॥"

রবীন্দ্রনাথ।

গ্রাম্য-শব্দ

পৃষ্ঠা

অ

১৬৮ অলকা তিলকা—মুখে ব্যবহৃত চিত্র-বিচিত্র চন্দনচর্চ্চা।

২০২ অধিবাস—উৎসবের পূর্ব্বদিবসীয় মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান।

আ

৬ আড়—ভারা।

৬১ আড়ানি—বড় হাত-পাখা।

৬২ আড়ং—উৎসবমত্ত জনসমারোহ।

৭১ আড়—প্রস্থভাবে, এড়ো করিয়া।

৭২ আঁচা—সূঁয়োপাকা।

৭৩ আরজ—আর্জ্জি, দরখাস্ত।

৯২ আলতাপাতি—পাশরাঙ্গা (শিম্)।

১০০ আগডাল—সর্ব্বোচ্চ শাখা।

১০১ আটপিটে—সর্ব্বকার্য্যে দক্ষ।

১০৬ আঁদোসা—পিষ্টকবিশেষ।

১০৯ আটি—গোছা।

১০৯ আড়ি—শস্য মাপিবার কাঠার চারি কাঠা।

১১০ আন্‌কোরা—নূতন কোরা বস্ত্র।

১২১ আগ্‌লাইতে—অভ্যর্থনা করিতে।

১৩৫ আইরি—অরহর।

১৪৩ আলখেল্লা—গলা হইতে পা পর্য্যন্ত ঢাকা ঢিলা জামা।

১৪৯ আর্জ্জি—দরখাস্ত।

১৬০ আজাই—মাতামহ, আজা ম'শায়।

১৬৮ আসর—যাত্রা, পাঁচালী প্রভৃতির বৈঠক।

১৮২ আর্চ্চা—অর্চ্চনা।

১৯৫ আখড়া—আশ্রম।

২১০ আড়া—কড়ি।

ই

২১২ ইয়ার—বয়স্য।

ঈ

১৫০ ঈশ্বরবৃত্তি—ব্যবসায়ী কর্ত্তৃক দেবোদ্দেশে রক্ষিত লভ্যাংশ।

উ

১৩ উঠবন্দী—অনিশ্চিত, যাহাতে স্থায়ী অধিকার নাই।

১০৫ উকুনে—ভাঁটুই, চোরকাঁটা।

১২৮ উৎরুণি—উত্তরায়ণ।

১৪১ উবু—মাটীতে বুক দিয়া পড়া।

১৭৭ উপোস পাড়ছে—উপবাস করিয়া আছে।

এ

৪ এঁটুলি—যে চটচটে মাটীতে বালির ভাগ নাই।

১১৬ এক টোপ—এক ফোঁটা।

১৪৩ একরঙ্গা—লাল কাপড়।

১৯৭ এড়ো—গাছের এক হাত বা আধ হাত লম্বা ডাল, কোন্ দ্রব্য লক্ষ্য করিয়া ছুড়িবার জন্য।

ও

১১৩ ওড়ং—বংশদণ্ড-বিশিষ্ট নারিকেলমালার হাতা।

১৭৪ ওস্তাদ—শিক্ষক

ক

১৭ কচেবার—পাশার দানবিশেষ।

২৫ কপাটী—খেলা বিশেষ, দম বন্ধ করিয়া 'কপাটী কপাটী' শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে বিপক্ষের দলে খেলা দিয়া আসিতে হয়, এই জন্য এই নাম।

২৫ কৃষাণী—চাষী মজুরের কাজ।

৩২ কুনো—পুরুষ বিড়াল।

৮১ কণ্ঠি—কণ্ঠসংলগ্ন কাঠের মালা।

৯১ কাটাই মাড়াই—ধান্যকর্ত্তন ও শস্যনিষ্কাশন।

৯২ কানাচ—খড়ো ঘরের চালের জল যে কোণে পড়ে।

৯৫ কাঁধাভাঙ্গা—কানাভাঙ্গা।

১০৩ কোঁচড়—আধার-রূপে পরিণত কোঁচার খুঁট।

১০৯ কাঁদাল—শস্য মাড়িবার সময় তাহা উল্টাইবার জন্য লোহার হুকবিশিষ্ট অনতিদীর্ঘ বংশদণ্ড।

১১০ কাঠা—ধান্যাদি শস্য মাপিবার বেত্রনির্ম্মিত বৃহৎ পাত্র।

১২০ কাণ্টা—গৃহপ্রাঙ্গণস্থ জঞ্জাল ফেলিবার স্থান, আঁস্তাকুড়।

১২৬ কাবারি—বাখারি।

১৩৫ কাঁকুই—চিরুণি।

১৩৮ কড়াই—কড়া, কটাহ।

১৪৮ কিনারা—উপায়।

১৬০ কাতার—ভীড় ঘন সন্নিবিষ্ট ভাবে।

১৫৬ কাচকাক—নীলকণ্ঠ পাখী।

১৭৭ কাঁচা—মেটে।

১৮১ কুড়িকুষ্ঠ—কুষ্ঠব্যাধি।

১৮৫ কাঠরা—কাঠের বা বাঁশের বেড়া।

১৯৯ কোমরপাটা—বালক বালিকার কোমরে পরিবার অলঙ্কার বিশেষ।

২০৪ কাড়া—চর্ম্মাবৃত অর্দ্ধবর্ত্তুলাকার বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।

২১৪ কুলে দামড়া—কাল বলদ।

২২৭ কাকবলি—ভূতের ভোগ।

খ

২০ খাস—উৎসবে ব্যবহৃত রঙ্গিন পশমী বস্ত্রাবৃত কাষ্ঠ দণ্ড।

৮২ খোলা—কলাগাছের বাক্‌লা, পেটো।

৮৪ খোরা—পাথরের বড় বাটী।

১০১ খালুই—বাঁশের চটী বা কঞ্চিনির্ম্মিত সঙ্কীর্ণমুখ মৎস্যপাত্র।

১০৯ খোলা—ধান মাড়িবার স্থান।

১২৮ খুঁট—বস্ত্রের কোণ।

১৩৫ খাড়ু—হাতের অলঙ্কার বিশেষ।

১৩৯ খাব্‌রে—দুধ দুহিবার মৃণ্ময় বা কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্র।

১৪০ খুঁটআখুরে—যাহারা অক্ষর খুঁটিয়া খুঁটিয়া পড়ে, স্বল্পশিক্ষিত।

১৫৪ খাক্—খাগড়া।

২০৫ খড়ো—খড়ের চাল বিশিষ্ট।

২০৬ খুলী—খোল-বাদক।

গ

২৭ গুছি—গুচ্ছ।

৫০ গেন্দা—লম্বা তাকিয়া।

৭৬ গোয়ালকাড়ুণী—যে স্ত্রীলোক গোয়াল কাড়ে, অর্থাৎ পরিষ্কার করে।

৮৬ গুবা—দাঁড়াগুলি খেলিবার গর্ত্ত, গাবু।

১০১ গাছী—যাহারা খেজুর গাছ কাটিয়া রস সংগ্রহ করে।

১০৯ গোপীযন্ত্র—বৈষ্ণবদিগের একতারা বিশেষ।

১১৩ গাদ—রসের ময়লা।

১১৪ গুড়মুচি—সরাগুড়।

১২০ গোলা—তরল চালবাটা চূর্ণ মিশ্রিত জল।

১৪৩ গাব্‌গুবাগুব—বৈষ্ণব বৈরাগীদিগের তন্ত্রীবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র, আনন্দলহরী।

১৪৮ গদীয়ান—আড়তের প্রধান কর্ম্মচারী।

১৭৫ গাহনা—যাত্রা গান।

ঘ

১৫৯ ঘোষাণী—গয়লানী।

চ

২৯ চন্দনপাটা—চন্দন ঘষিবার প্রস্তর, চন্দনপিঁড়ি।

৭১ চুরাইতে—চূর্ণ করিতে।

৮৫ চাম্‌চু-চু—দম্ বন্ধ করিয়া এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া চাম্‌চু খেলায় বিপক্ষ পক্ষকে আক্রমণ করিতে হয়।

৯৭ চুলঝাড়—কেশদাম।

১০৯ চিটা—শস্যহীন খোসাসর্ব্বস্ব ধান।

১২৫ চৌরী—চারি-চাল-বিশিষ্ট ঘর।

১২৬ চাপড়ি—কাঁচা ঘুটে।

১৭৯ চড়াতে—চড় মারিতে।

১৯৩ চৈতালী—চৈত্রমাসে উৎপন্ন শস্য, রবিশস্য।

২১৩ চাকি—পদ্মের ফল।

২১৪ চারা—উপায়।

ছ

৩৩ ছাপা—ছাবে প্রস্তুত সন্দেশ বিশেষ।

৯০ ছালা—বস্তা।

১১৮ ছাঁই—নারিকেল ও গুড়ে প্রস্তুত মিষ্টান্ন বিশেষ।

১৩৬ ছোত্‌ড়া—সোটা, কদলীতন্তুর সমষ্টি।

১৪২ ছুলিয়া ছাড়াইয়া।

১৫৪ ছড়—দীর্ঘ কাণ্ড, ডাঁটা।

১৭৫ ছড়—বেহালা বাজাইবার ছড়ি।

১৮ ছড়া ঝাঁট—সকাল সন্ধ্যায় বাড়ী জল গোময় ছড়াইয়া ঝাঁট দেওয়া।

১৮২ ছেয়োত—স্রোত।

১৮৬ ছোকরা—যাত্রা বা পাঁচালীর দলের বালক গায়ক।

২১১ ছোবা—ছোট ভাঁড়।

২১৪ ছাবালটা—ছেলেটা।

জ

২৯ জাফ্রি—বাঁশের, কঞ্চির, বা বাখারী-নির্ম্মিত বেড়া।

৫১ জিঞ্জিরি—শৃঙ্খল।

৭১ জাবনা, জাব—খড় ও খলি মিশ্রিত গবাদির খাদ্য।

৯২ জলটানা—জলাশয় যেখান হইতে অনেক দূরে আছে; অনেক দূর হইতে যেখানে জল টানিয়া অর্থাৎ বহিয়া আনিয়া কার্য্য-নির্ব্বাহ করিতে হয়।

পৃষ্ঠা

১১৩ জঙ্গল—ছোট ছোট গাছ ও গুল্মাদি।

১১৩ জন্মের ভাত—শেষ আহার, মৃত্যু অর্থবাচক।

১৩০ জিরেনকাট—রসের জন্য খেজুর গাছ কাটিতে কাটিতে একদিন জিরেন (বিশ্রাম) দিয়া পরে প্রথম দিনের কাটা।

১৪২ জাওর—রোমন্থন।

১৭৫ জুড়ি—যাত্রার দলের গায়কযুগল, এখন অনেক বয়স্ক গায়কের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত।

ঝ

১৯ ঝিঁকে—নৌকা দ্রুত চালাইবার জন্য হালের ধাক্কা, সজোরে হালের 'ঠেলা'।

১১৯ ঝিকিমিকি বেলা—বেলাবসান।

১২০ ঝাঁঝুরী—তলায় বহুছিদ্রবিশিষ্ট পাত্র।

১৬১ ঝিউনি—চাউল ভাজিতে ভাজিতে পোড়াইয়া ফেলা।

১৬৪ ঝাঁকাইতে—ঝাঁকানী দ্বারা নাড়িতে।

১৭৮ ঝেঁটিয়ে—দল বাঁধিয়া।

ট

১০ টাপোর—অস্থায়ী চালা।

১১৩ টাটি—খর্জ্জুরপত্রাদিনির্ম্মিত ঝাঁপ।

১৪০ টোঙ্গ—বংশাদিনির্ম্মিত খড়ের ছাউনিযুক্ত উচ্চ মঞ্চ।

১৫৭ টাল—মাচা।

১৭৮ টাট—সংসারধর্ম্ম ও বিষয়সম্পত্তি।

ঠ

২৫ ঠিলি—ছোট কলসী।

৭৮ ঠেকো—অবলম্বন।

১৬৭ ঠুক্‌নি—চক্‌মকির ইস্পাত।

১১১ ঠুঁটো—অঙ্গুলিহীন।

ড

৮ ডাবগাছ—নারিকেলের গাছ।

৪৫ ডাকের গহনা—রাংতা, অভ্র, শোলা প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত ডাকের সাজ।

৫৭ ডেল্‌কো—মৃত্তিকাদিনির্ম্মিত দীপাধার ; মাটীর ছোট ছোট প্রদীপও বুঝায়।

৮৮ ডুগি—বাঁয়া।

১১৪ ডালা—বংশনির্ম্মিত আধার বিশেষ।

১৩২ ডেগ্‌ড়ো—তাল নারিকেল জাতীয় বৃক্ষের ডাল।

১৬৫ ডাকের সাজ—ডাকের গহনা (৪৫ পৃষ্ঠা)।

২০৪ ডগর—চর্ম্মাবৃত বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।

ঢ

৫০ ঢপ— মধু কানের প্রবর্ত্তিত কীর্ত্তনাঙ্গের গান।

ত

৩৭ তিলপিটিলী—তিল ও চালের গুঁড়ার গোলায় মাখান।

৭৬ তক্‌তকে—পরিচ্ছন্ন।

৯৬ তিউড়ি—অস্থায়ী উনন।

১১২ তিলুয়া—তিলযুক্ত গুড়ের বা চিনির মিষ্টান্ন বিশেষ।

১৭৯ তাওত—সেবাশুশ্রূষা।

১৯৯ তত্ত্ব—পার্ব্বণাদিতে প্রেরিত উপঢৌকন।

২০৭ তরাতে—ত্রাণ করিতে।

২২২ তবলা—এক জাতীয় ভাঁড়।

থ

১০২ থাওক—বিনা ওজনে।

১১৭ থাবা—হস্তপূর্ণ।

১৩৩ থোকা—গুচ্ছ।

১৮১ থুড়থুড়ে—অথর্ব্ব।

১৮৫ থেলো—ছোট ডাবা হুঁকো।

দ

৭৮ দোহাপাতা—নবপ্রসূতা গাভীর দোহনারম্ভ।

৭৮ দোয়াল—দুগ্ধদোহনকারী।

৮১ দামাট—ছাতার বাঁট।

৮৩ দোবজা—চাদর।

১১২ দাকাটা—ঢেঁকিতে কোটা নয়, দা দিয়া কাটা।

১৫২ দাঁড়ি বাটখরা—মানদণ্ড ও সের, আধ সের প্রভৃতি লৌহাদিনির্ম্মিত পরিমাপক দ্রব্য, দাঁড়ি পাল্লা।

১৫৩ দেয়ালগিরি—দেওয়ালে লাগাইবার কাচময় আলোকাধার।

১৮৭ দরগা—পীরস্থান।

১৮৩ দণ্ডবৎ—সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত।

২০২ দেউড়ী—সিংহদ্বার।

২০৪ দীপক—অগভীর মৃৎপাত্রস্থ রঙ্গশাল জাতীয় আলোক।

ধ

১১৭ ধনঞ্জয়—প্রহার।—প্রহার করিয়া ধনঞ্জয়কে শ্বশুরবাড়ী হইতে তাড়াইতে হইয়াছিল, এইজন্য 'ধনঞ্জয়' বলিলে প্রহার বুঝায়।

১২৮ ধাউত—ধাত, ধাতু।

২০০ ধড়া—অপ্রশস্ত বস্ত্রখণ্ড।

২২৯ ধূপবাণ—চড়কের অগ্নিক্রীড়া।

ন

৩৮ নলের গুড়—উৎকৃষ্ট পাত্‌লা খেজুরে গুড়।

৭৮ নটাইয়া—নষ্ট হইয়া।

১০২ নউচি—রোহিতশাবক।

১১১ নড়ি—লাঠী।

১১১ ন্যাংড়া—খোঁড়া।

১১২ নওয়া—নয়।

১১২ নোট—ঢেঁকির গড়।

১১৯ নুড়ি—গোময়পিণ্ড।

১৩৩ নলি—রসনিঃসরণের নল।

১৩৩ নগি—অঁাকুষি।

১৪৩ নেড়ানেড়ি—সম্প্রদায়বিশেষের বৈষ্ণব বৈষ্ণবী।

১৮৪ নাকি—অনুনাসিক।

১৯৯ নগি—নৌকা ঠেলিবার বংশদণ্ড।

প

৪ পরচালা—চালার সংযুক্ত ছোট চাল।

২৮ পচাইয়া—পচিত ও নিষ্ফল হইয়া।

৬০ পাট—প্রতিমার কাষ্ঠনির্ম্মিত বেদী।

৭১ পানাই—কাষ্ঠ ও চর্ম্মে নির্ম্মিত পাদুকা বিশেষ, পয়জার।

৭৮ পেট্‌কো—কলাগাছের অখণ্ড খোলা।

৭৮ পাখরা—গরুর নাম; যে গরুর গায়ে সাদা, লাল ও কালো দাগ আছে।

৮৩ পিতিয়ে—পিত্তবৃদ্ধি হওয়ায়।

১০০ পৈতা কাটিয়া—পৈতা প্রস্তুত করিয়া।

১০৯ পালা—রাশীভূত করা।

১০৯ পাচন—গো মেষাদি তাড়াইবার যষ্টি।

১০৯ পাথী—ধান্যাদি মাপিবার বেত্রনির্ম্মিত ক্ষুদ্র পাত্র।

১১৪ পৌষবাউড়ি—পৌষ পার্ব্বণের অঙ্গ বিশেষ।

১১৯ পোয়াল—ধানের খড়।

১২০ পোঁচড়া—লেপ।

১৩৪ পারানি—পার-পণ্য।

১৩৯ পরাত—কানাওয়ালা বড় থালা।

১৪২ পড়িতেছে—লাগিতেছে।

১৫০ পাকপাড়া—পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করা।

১৬৭ পতিত—অনাবাদী।

১৭৫ পালা—গীতাভিনয়ের বিষয়।

২১১ পসারী—ব্যবসায়ী।

২১৪ পরবী—পার্ব্বণী।

ফ

৮ ফানুস—কাগজের লণ্ঠন।

৫১ ফর্‌সী—গুড়গুড়ি।

১৭৭ ফাল্‌তো—অকিঞ্চিৎকর।

২১৫ ফুপুতো ভাই—পিসতুতো ভাই।

ব

২২ বেল—গোলাকৃতি কাচের লণ্ঠন।

৩৩ বেচাল—ব্যবসায়চতুরা।

৭০ বাড়ি—লাভের জন্য ধান্যাদি ধার দেওয়া।

৮৬ বুড়ি—খেলার সংসৃষ্ট ব্যক্তিবিশেষ, খেলার সাক্ষী।

৯১ বাইন—গুড় জ্বাল দিবার স্থান।

৯৬ বায়সা—আবদার।

১১১ বাথান—গোচারণক্ষেত্রে গো-মহিষাদির সংরক্ষণস্থান।

১১৩ বাঁকের বাড়ি মারিয়া—বাঁক অর্থাৎ বংশনির্ম্মিত ভারবহনদণ্ডের আঘাতে।

১১৩ বাইতি—যাহারা চুন প্রস্তুত করে, চুনরী।

১১৪ বীজ—সদ্যোজাত গুড় যাহাতে জমিয়া যায় ও পরিষ্কার হয়, সেই উদ্দেশ্যে গুড়ে মিশাইবার নিমিত্ত বিশেষভাবে প্রস্তুত দলা গুড়।

১১৪ বয়—অনেক দিন স্থায়ী হয়, টেঁকে।

১২৮ বার্ণিয়া—গ্রামের নাম।

১২৮ বিয়েন—প্রসব।

১৩৪ বুঁদি—খড়ের মশাল।

১৪৭ বারদোল—দোলের একমাস পরে দ্বাদশটি বিগ্রহের একত্র সমাবেশে কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ীর প্রবর্ত্তিত যে দোল হয়।

১৪৮ বিলাত—বাকী।

১৫৫ বেসবত—অশিষ্ট।

১৫৬ বেড় বাতাড়—বেড়া ও ঘেরা, জঙ্গলময় স্থান।

১৬১ বাড়িতে—কাটিতে।

১৭৬ বেথো—শাক বিশেষ।

১৮৫ বাঁধানো—রৌপ্যমণ্ডিত।

১৮৮ বাথারী—চেরা ও খণ্ডিত বাঁশ।

১৯০ বটখিরি—বৈঠকী গান।

১৯৩ বর্গী—মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্য (বর্গ শব্দজ)।

২০০ বার—সভাধিষ্ঠান।

২০৫ বৈকালী—দেবতাদিশের অপরাহ্নের জলযোগ।

২১৪ বাদা—চামড়ার বন্ধনযুক্ত কৃষকগণের পাদুকা।

২১৫ বাজীকন্যে—সোলার স্ত্রীমূর্ত্তি, ব্যায়াম করিতেছে, এইরূপ ভাবে গঠিত।

ভ

৩ ভাসমনে জলে—যাহাতে ভাসিতে পারে, এমন জলে।

৬৯ ভরা—দ্রব্যাদিপূর্ণ নৌকা।

৭১ ভিত—ভিত্তি, দেওয়ালের গোড়া।

৭৮ ভাঁড়ভাঙ্গি—গরুর নাম, দুয়িবার সময় দুধের ভাঁড় ভাঙ্গে বলিয়া এই নাম।

১৮৫ ভাজিতে—রাগিণী আলাপ করিতে।

২০৬ ভিজে—ভিজান ছোলা মটর প্রভৃতি।

২০৮ ভুঁইচাঁপা -এক প্রকার আতসবাজী।

২২৫ ভর—অধিষ্ঠান।

ম

১১ মানসা—দেবোদ্দেশে পূজাসঙ্কল্প।

২১ মেরজাই—জামা বিশেষ, মির্জ্জা নামক সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা পূর্ব্বে ইহা ব্যবহার করিতেন।

২২ মহাতাপ—সোরা গন্ধকাদি পূর্ণ কাগজে মোড়া মশাল।

৭৭ মেটে মজুর—যে সকল মজুরেরা মাটীর দেওয়াল ইত্যাদি প্রস্তুত করে

৮৫ মরিবার খেলিবার অধিকারচ্যুত হইবার।

৮৬ মূল খেড়ু—দলস্থ প্রধান খেলোয়াড়।

৮৬ মালামো—মল্লক্রীড়া, কুস্তি।

১০৫ মশক—মহিষচর্ম্মনির্ম্মিত জালার মত আধার বিশেষ।

১১৩ মালো—জেলে, মৎস্যজীবী জাতিবিশেষ।

১১৫ ময়া—মোরলা মাছ।

১১৫ মুচি—সরা অপেক্ষা ছোট খুরোবিশিষ্ট মৃতপাত্র।

১২৯ মুচি—কাঁটালের প্রথম অবস্থা।

১২৯ মানত—মানসিক।

১৪৮ মন্দা—নরম।

১৪৮ মোকাম—ব্যবসায়ীদিগের মফস্বলের আড়ত।

১৬৭ মেঠোসুর—চাষার গানের সুর।

১৮৩ মোড়ামুড়ি দিয়ে—হস্তপদ প্রসারিত করিয়া আলস্য ভাঙ্গিয়া।

১৯৯ মাচান—পাটাতন।

২০৪ মৈমশাল—মৈয়ের উপর রক্ষিত শ্রেণীবদ্ধ মশাল।

য

১৬৫ যজ্ঞি—বৃহৎ ভোজ।

র

২৪ রেজাগিরি—রাজমিস্ত্রীর সহকারিণী মেয়ে মজুরের কাজ।

৫৩ রেকাবদল—ঘোড়ার পৃষ্ঠপ্রলম্বিত লৌহনির্ম্মিত পাদান।

১০৪ রাশি—পাতলা ও শস্তা, নিকৃষ্ট।

১৪৩ রসকলি—বৈষ্ণবীর তিলক।

১৪৯ রসুম—মকদ্দমার দাবীর পরিমাণ অনুসারে উকীলের প্রাপ্য 'ফি'।

১৮১ রসানি—পাতলা পূয-রক্তের ধারা।

২১৪ র মান্‌তি—স্থির থাকিতে।

ল

৭২ লাল—প্রথম শ্রেণীর উর্ব্বর জমি।

১১২ লক্ষি—লক্ষ।

১৭৯ লালিয়ে—লালায়িত হইয়া।

২১৮ লালন—নদীয়া জেলার এক জন উদাসী ফকির, এই গানের রচয়িতা।

শ

৪ শোলা কচু—মানকচু অপেক্ষা দীর্ঘ ও সরু কচু।

১০৪ শুকো—ঘন ও উৎকৃষ্ট।

১২৮ শৈত্যক—ঠাণ্ডা।

১৪৭ শ্রীপঞ্চমী—সরস্বতীপূজার দিন।

১৬৭ শরাণ—প্রশস্ত রাস্তা, শরণি।

১৭৯ শলে—লম্বা।

স

১০ সান—পাকা মেজে।

৩৭ সূধ্যি কুমড়ো—বিলাতী কুমড়া।

৫৫ সেজ—কাচাবরণমধ্যস্থ বাতিদান।

৭১ সাঁজাল—ধূমযুক্ত অগ্নি।

৮২ সাঁকারকন্দ—শকরকন্দ, অর্থাৎ শর্করাবৎ মিষ্ট কন্দ; এক জাতীয় আলু।

৯৪ সরাগুড়—কলসীর মুখে কাপড় বাঁধিয়া সরার আকারে জমান খেজুর গুড়।

১০৮ সীতাহার—হারের আকার বিশিষ্ট এক প্রকার বাজি।

১১৭ সড়াসড়—সপাসপ।

১১৮ সিদ্ধপুলি—পিষ্টক বিশেষ, ইহা ভাজিতে হয় না।

১৪৮ সেরা—প্রধান, উৎকৃষ্ট।

১৬৪ সুপ্‌লো—শোলের সঙ্গে প্রস্তুত কুলের চাটনী বিশেষ।

১৬৮ সঙ্গত—গীত বাদ্যের তাল লয় যোগ।

১৭৮ সুবচনী—মঙ্গলকারিণী দেবী বিশেষ, শুভসূচনী।

১৮৮ সাঁচ্চা—জরির কাজ।

১৯৩ সাঁজা—দধি প্রস্তুত করিবার অম্লরস।

হ

৪৭ হাডুডুডু—এক প্রকার কপাটী খেলা, খেলিবার সময় ডু-ডু শব্দ এক নিশ্বাসে উচ্চারণ করিতে হয়।

৫০ হাঁড়ি—কাচের বেল-লণ্ঠন।

১১৭ হাতড়াইয়া—হস্ত দ্বারা অন্বেষণ করিয়া।

১৫৯ হাম্‌সে দিগর নাস্তি—আমার অপেক্ষা কেহ বড় নাই।

১৮২ হেনেস্তা—অবজ্ঞা।

১৮২ হত্যা—শুভকামনায় দেবতার দ্বারে পড়িয়া থাকা।

১৮২ হেঁই—দোহাই।

১৯৯ হাঁসুলী—শিশুর গলার অলঙ্কার বিশেষ।

২২৫ হামা টানিয়া—হাঁটু ও হাতের ভর দিয়া চলিয়া।

২২৬ হাতসাঁই—একাধিক ব্যক্তির একত্রবদ্ধ প্রসারিত হস্তের উপর রাখিয়া লইয়া যাওয়া।

৩২ হালুম্—ব্যাঘ্র গর্জ্জনের অনুকৃতিমূলক হুঙ্কার।

ক্ষ

৮৩ ক্ষেত্তুরে বাটি—জগন্নাথক্ষেত্রের বাটি।

১৯৯ ক্ষয়া—ক্ষয়প্রাপ্ত।

সূচী

বিষয়				পৃষ্ঠা
কালীপূজা	...	...	...	১
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া	...	...	...	২৩
কার্ত্তিকের লড়াই	...	...	...	৪১
নবান্ন	...	...	...	৬৫
পোষলা	...	...	...	৮৯
পৌষ-সংক্রান্তি	...	...	...	১০৭
উত্তরায়ণ মেলা	...	...	...	১২৩
শ্রীপঞ্চমী	...	...	...	১৪৫
শীতল ষষ্ঠী	...	...	...	১৭১
দোলযাত্রা	...	...	...	১৯৫
চড়ক	...	...	...	২১৯
গ্রাম্যশব্দ	...	...	...	২৩৫

কালীপূজা

পল্লীবৈচিত্র্য

পল্লীবৈচিত্র্য

—*:*—

কালীপূজা

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে, এমন কি, ভারত-রাজধানী কলিকাতাতেও দেওয়ালী উপলক্ষে জনসাধারণের মধ্যে তীব্র উদ্দীপনাপূর্ণ আনন্দের উচ্ছ্বাস অনুভূত হয়। শস্যশ্যামলা বনরাজি-কুন্তলা প্রসন্নসলিলা বঙ্গভূমির বহু-দূরবর্ত্তী পল্লীপ্রান্তে, শান্তিপূর্ণ গৃহস্থ-পরিবারে ও দীনদরিদ্রের গোময়-মার্জ্জিত জীর্ণ পর্ণকুটীরেও সেই উদ্দাম উল্লাসের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি উত্থিত হইয়া থাকে। দীপমালাবিভূষিতা, সহস্র হাউই-বোম-তুবড়ি মুখরিত অতুল ঐশ্বর্য্যময়ী সুসজ্জিত রাজধানীর অধিবাসিবৃন্দের আলোকপ্রদীপ্ত নয়নের বিস্ময়কৌতুক-চ্ছটা দরিদ্র পল্লীবাসিদিগের চক্ষেও প্রতিফলিত দেখিতে পাই। যে প্রখর আনন্দ-স্রোত নাতিশীতোষ্ণ হেমন্তের মধুর সন্ধ্যায় দেশের একপ্রান্তস্থ নরনারীর হৃদয়ে প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহাই মন্দীভূত হইয়া সুমন্দ সান্ধ্যসমীরণে দেশের অন্যপ্রান্তের মানবহৃদয়ে মৃদুকম্পন উপস্থিত করে।—পল্লীসমূহ বিচ্ছিন্ন, দূর-দূরান্তরে অবস্থিত; কিন্তু সমাজ-দেহ অবিচ্ছিন্নভাবে দেশকাল আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মানব-হৃদয় সর্ব্বত্র অভিন্ন; তাই পল্লীজীবনের সুখদুঃখ, ও উৎসবানন্দের বার্ত্তা দেশের প্রতিক্ষেত্রেই ধ্বনিত হয়; পল্লীগ্রামের এই বৈচিত্র্য নগরবাসিগণের হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইবার অযোগ্য নহে।

কেবল কালীপূজার রাত্রিটিই পল্লীবাসিগণের নিকট উৎসবময়ী নহে, কালীপূজার পূর্ব্বদিন হইতেই পল্লীগ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের হৃদয়ে আসন্ন উৎসবের উল্লাস-চাঞ্চল্য অনুভূত হয়। এই চতুর্দ্দশীতে 'চৌদ্দ শাক' খাওয়া পল্লীবাসিগণের একটি অবশ্য-প্রতিপাল্য প্রথা। আমাদের গোবিন্দপুরে যথেষ্ট উৎসাহের সহিত এ নিয়মটি রক্ষিত হয়। গ্রামের বালকবালিকাগণ সকালে উঠিয়াই চতুর্দ্দশ প্রকার শাকের অন্বেষণে বাহির হইল; কিন্তু চতুর্দ্দশপ্রকার শাক একই ঋতুতে সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নহে। সকল জাতীয় শাক একস্থানে না পাইলেও, ভিন্ন ভিন্ন পাড়া হইতে তাহারা 'চৌদ্দ শাক' সংগ্রহ করিয়া আনিল। ছেলে মেয়েরা একত্র বসিয়া গণিয়া দেখিল,—১ কলমী, ২ হেলাঞ্চা, ৩ নটে, ৪ পালং, ৫ চুকো (টকপালং), ৬ কচু, ৭ বেথো, ৮ ছোলা, ৯ মটর, ১০ শরিষা, ১১ সজিনা, ১২ পুঁই, ১৩ সূর্য্যি কুমড়োর ডগা;—বহু তর্কবিতর্কে ও প্রচুর অনুসন্ধানে অম্ল-তিক্ত-কষায় প্রভৃতি স্বাদবিশিষ্ট এই ত্রয়োদশ প্রকার শাক সংগৃহীত হইল, এখনও এক রকম বাকি!—আর কি শাক সংগ্রহ করা যায়? বিস্তর চিন্তার পর দত্তদের নটবর বলিল, "পেয়েছি! পেয়েছি!" চারি দিকে শব্দ উঠিল, "কি, কি?" নটবর মধুর হাস্যে অধর রঞ্জিত করিয়া বলিল, "গাধাপণ্যে!" সকলে মহা উৎসাহে গাধাপণ্যে সংগ্রহ করিয়া আনিল। সে জন্য কাহাকেও কষ্ট পাইতে হইল না; শোথরোগের ঔষধ বলিয়া অনেক পল্লীগৃহস্থই এই অযত্নোদ্ভূত শাক স্ব স্ব গৃহপ্রাঙ্গণে সযত্নে রক্ষা করে।

হেলাঞ্চার শাক সংগ্রহ করিতে বালকদিগকে অনেক পচা পুকুরে নামিতে হইয়াছে; কেহ কেহ হেলাঞ্চা সংগ্রহ করিয়াছে বটে, কিন্তু

কলমী পায় নাই; তাহারা অগত্যা দল বাঁধিয়া নদীতীরে উপস্থিত হইয়া শুশুনির শাক তুলিয়া আনিল। নদীতীরে শুভ্র বালুকারাশির উপর প্রাতঃসূর্য্যের পীতাভ কিরণ প্রতিফলিত হইতেছে; সেই বালুকারাশি ভেদ করিয়া স্বচ্ছ শীতল জলধারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎস-মুখ হইতে উৎসারিত হইয়া নদীতে পড়িতেছে। এই সকল উৎসের সন্নিকটে পুরু সবুজ মখমলের গালিচার মত সুকোমল পুঞ্জ পুঞ্জ শুশুনিশাক অনেকখানি স্থান আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। অনাথা দরিদ্রা গ্রাম্য-বিধবাগণ ও জেলে বাগ্দীর ছেলেরা অবনতমস্তকে নিবিষ্টচিত্তে কোঁচড় ভরিয়া সেই শাক তুলিতেছে। শাকগুলি নদীতীরে ঢালিয়া রাখিয়া, কেহ কেহ বা কোঁচড়ে বাঁধিয়াই স্নান করিতেছে, এবং স্নানান্তে শাকগুলি 'ভাসানে জলে' ধুইয়া লইয়া তীরে উঠিয়া গামছা দিয়া গা মুছিতেছে।

চতুর্দ্দশীতে চৌদ্দশাক আহার উপলক্ষে অনেক পরিবারে রন্ধনের একটু বিশিষ্ট আয়োজনও দেখিতে পাওয়া যায়। সেদিন অনেক বাড়ীতে নূতন খেজুরে গুড়ের 'পরমান্ন'—যেন অন্নপূর্ণার হাতা হইতেই সশরীরে নামিয়া আসে! যাহা একদিন ক্ষুৎপিপাসাতুর বিপন্ন বিশ্বেশ্বরের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়াছিল, তাহার কণামাত্র পাইয়াই পল্লীবাসিগণের অন্তর তৃপ্তি ও প্রসন্নতায় পূর্ণ হয়।

আহারাদির পর আজ আর বিশ্রামের অবকাশ নাই। মেয়েরা দাওয়ায় বসিয়া মাটীর প্রদীপ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইল। বেলা থাকিতে থাকিতে প্রদীপগুলি প্রস্তুত হওয়া দরকার; রৌদ্রে একটু শুকাইয়া না লইলে তৈল ও শলিতার অপব্যয় হইবে ভাবিয়া, তিন চারিটি মেয়ে

দীপনির্ম্মাণকার্য্যে যোগদান করিল। কেহ কেহ প্রদীপ একটু শক্ত করিবার জন্য 'এঁটুলি' মাটী সংগ্রহ করিয়া উত্তমরূপে ছানিয়া লইল। প্রদীপ প্রস্তুত হইলে তাহারা রৌদ্রে তাহা কিছুক্ষণ শুকাইয়া লইয়া ছোট ছোট শলিতা দিয়া সাজাইয়া রাখিল ; সন্ধ্যার অন্ধকার যখন গাঢ় হইয়া আসিল, তখন চতুর্দ্দশটি প্রজ্জ্বলিত মৃৎপ্রদীপ বাড়ীর বিভিন্ন অংশে সংরক্ষিত হইল। (পল্লীগ্রাম, সন্ধ্যাকাল ; ক্ষুদ্র গ্রামখানির তৃণাচ্ছাদিত কুটীর, নিস্তব্ধ কুটীরে ঝাঁপের বেড়া, আঙ্গিনায় শাকের ক্ষেত, গোটাকত শোলা কচুর ঝাড়, একপাশে একঝাড় কলাগাছ, এক কোণে একটি সজিনা গাছ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃৎপ্রদীপগুলির ক্ষীণ আলোক প্রকৃতির সেই শ্যামল স্নেহাঞ্চলে প্রতিফলিত হইতেছে। তরু-অন্তরালে জোনাকির মৃদুস্ফুরণ, আর লক্ষকোটী ক্রোশ উর্দ্ধে কোটী কোটী তারকার শুভ্রদীপ্তি সেই নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন নিশীথিনীর কৃষ্ণাবগুণ্ঠনের শোভা পরিস্ফুট করিতেছে।

পরদিন উৎসবের দিন। সেদিন সকলেরই হৃদয় আনন্দোৎফুল্ল। গ্রামের মধ্যস্থলে কুমারপাড়া। গৃহস্থদের কাছে বায়না পাইয়া কুমারেরা কালীপ্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছে ; তাহাদের অপ্রশস্ত গৃহকক্ষে, উননের পাশে, পরচালার নীচে, খড়ের গাদার কাছে, ঢেঁকির ঘরে—যেখানে-সেখানে কালীপ্রতিমাকে উলঙ্গিনীবেশে লোলজিহ্ব হইয়া ও চারিখানি বাহু প্রসারিত করিয়া দণ্ডায়মান দেখা যাইত। আজ সকালে রঙ্গ দিয়া সেগুলির চিত্রাঙ্কন আরম্ভ হইল। গ্রামের মাতব্বর লোকের বাড়ীতে যে সকল প্রতিমার পূজা হয়, সে সকল প্রতিমা কুম্ভকার-গৃহে নির্ম্মিত হয় না ; মাতব্বর মহাশয়দের গৃহেই কুম্ভকারকে উপস্থিত হইয়া প্রতিমা-নির্ম্মাণ

করিতে হয়।—মালীরা চিত্রকর ও বেশ-কারী উভয়ই; আজ আর তাহাদেরও অবসর নাই, তাহারা কতকগুলি নারিকেলের 'মালায়' নানা রকম রঙ্গ গুলিয়া তুলি দিয়া 'ঠাকুর চিত্রি' করিতেছে। অপরাহ্নকালে চিত্রাঙ্কন শেষ হইল; তখন কালী ঠাকুরাণী স্বীয় স্বাভাবিক মূর্ত্তিতে শোভা পাইতে লাগিলেন।

সূর্য্য পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িতে না পড়িতে চারি দিক হইতে ঢাক বাজিয়া উঠিল। পাড়ার ছেলেরা উদ্যতকর্ণেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, ঢক্কাধ্বনি তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেই তাহারা "ঐ বাজনা এসেছে রে!" বলিয়া সমস্বরে কোলাহল করিয়া পূজাবাড়ীতে উপস্থিত হইল। ঢাক আসিয়াছে, কিন্তু তখনও ঠাকুর আসে নাই! এক দল ছেলে একটা ঢাক ও একখান কাঁশি সঙ্গে লইয়া কুমার-বাড়ী ঠাকুর আনিতে গেল; এক জন লোকের মাথায় সেই মুক্তকেশী, দিগ্বসনা, নিরাভরণা, 'নবনীলঘনশ্যামা ঘোররূপা ঘোরদংষ্ট্রা' কালীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া ঢাক বাজাইতে বাজাইতে বাড়ী লইয়া আসিল।

কালী ঠাকুরাণী গৃহে উপনীত হইলে, ছেলেরা মহা উৎসাহে ডাকের গহনা দিয়া তাঁহাকে সাজাইতে লাগিল।—ঝোড়া হইতে ডাকের সাজ বাহির করিয়া তিন চারি জনে প্রতিমার অঙ্গ বিভূষিত করিতেছে, দীপালোক-প্রতিফলিত ডাকের গহনা ঝক্‌মক্ করিতেছে; কুলুঙ্গীতে একটা কেরোসিনের 'ডিবে' জ্বলিতেছে, দীপশিখায় সমস্ত কুলুঙ্গী ঝুলে পূর্ণ হইয়াছে; রাশি রাশি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হরিতপক্ষ পতঙ্গ সেই আলোকশিখার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে, তাহার পর কুলুঙ্গীর উপর পড়িয়া পতঙ্গ-লীলা সংবরণ করিতেছে। অসংখ্য পতঙ্গের মৃতদেহে কুলুঙ্গী পরিপূর্ণ!

প্রতিমা সুসজ্জিত হইল। মাথায় মুকুট, মুকুটের অভ্র শুভ্র হীরক-প্রভা বিকীর্ণ করিতেছে; দেবীর এক হস্তে খড়্গ, অন্য হস্তে অসুরমুণ্ড; আর এক হস্তে তিনি 'বর' ও অন্য হস্তে 'অভয়'-প্রদানে উদ্যত; সৃষ্টি ও প্রলয়ের দৃশ্য একত্র সম্মিলিত! করচতুষ্টয়ে নানাপ্রকার ডাকের গহনা। কণ্ঠে রক্তাক্ত মুণ্ডমালা, তাহার উপর মোমের ফুলের লাল মালা। কটিতট বেড়িয়া তিন সারি ছিন্নহস্ত, মস্তকে আজানুলম্বিত নিবিড়কৃষ্ণ কেশদাম,—মাথার উপর রাঙ্গতার সুগোল 'ছটা'। লোহিতবর্ণ লোলজিহ্বা প্রসারিত। উজ্জ্বল ত্রিনয়নের দৃষ্টি ভাবহীন। অর্দ্ধনিমীলিতনেত্র ঈশান পদতলে নিপতিত; তাঁহার বর্ণ শ্বেত, হস্তে শিঙ্গা ও ডম্বরু, কর্ণে 'ধুতুরার ফুল', মস্তকে পিঙ্গলবর্ণ জটা, তাহার উপর চিত্রবিচিত্র সর্প ফণা উদ্যত করিয়া কুণ্ডলাকারে অবস্থিত।

চণ্ডীমণ্ডপের আঙ্গিনা একখানি চাঁদোয়া দ্বারা আবৃত। তাহার নীচে একখানি তক্তপোষের উপর কতকগুলি ছেলে মেয়ে জুটিয়া গণ্ডগোল করিতেছে; ঢুলিরা এক পাশে চাটাইয়ের উপর বসিয়া নিশ্চিন্তমনে তামাক টানিতেছে, দুই চারিটি ঢোল সম্মুখে পড়িয়া আছে; গোটা দুই ঢাক চিত্রবিচিত্র ফরাসী ছিটের পোষাক পরিয়া, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ পালক পিঠে বাঁধিয়া নীরবে উপবিষ্ট, যেন কখন ঢাকীর ঘাড়ে চাপিয়া বিকট বাদ্যনাদে পল্লীবালকগণের ব্যগ্র-হৃদয় আলোড়িত করিয়া তুলিবে— ঔৎসুক্য-ভরে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছে!

সন্ধ্যা অতীত হইল। উৎসব-ভবনের প্রাঙ্গণে বাঁশের যে 'আড়' বাঁধা হইয়াছিল, তাহার উপর অর্দ্ধহস্ত ব্যবধানে অল্পপরিমাণ গোবর রাখিয়া তাহাতে ছোট ছোট মাটীর প্রদীপ বসাইতে ছেলেরা ব্যস্ত হইয়া

উঠিল; ক্রমে দুই এক করিয়া সকল বাড়ীতেই বহুসংখ্যক মৃৎপ্রদীপ প্রজ্বলিত হইল।

আজ পল্লীগ্রামের নৈশ শোভা বড়ই রমণীয়! অমাবস্যার নিবিড় অন্ধকারে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন; অরণ্যবেষ্টিত অপ্রশস্ত গ্রাম্যপথ, গ্রাম-প্রান্তবাহিনী ক্ষুদ্রকায়া তরঙ্গিণীর তরল বক্ষ, জোনাকী-খচিত বিশালকায় পাদপশ্রেণী, দূরস্থ শ্যামল শস্যক্ষেত্র—চরাচরের সর্ব্বত্র গাঢ় অন্ধকার! ঊর্দ্ধাকাশে অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জ, আজ তাহারা অত্যন্ত শুভ্র, অধিকতর জ্যোতির্ম্ময়; যেন প্রকৃতিরাণী তাঁহার দ্যুতিময় হীরকরত্নখচিত কৃষ্ণ পরিচ্ছদে মণ্ডিত হইয়া প্রিয়জনসমাগমের প্রতীক্ষা করিতেছেন; তাঁহার নিশ্বাসবায়ুতে শুষ্ক বৃক্ষপত্র ঝরিয়া পড়িতেছে, তাঁহার নয়ন-বিগলিত-প্রেমাশ্রু-তুল্য হেমন্তের নির্ম্মল শিশির-বিন্দু শেফালিকা ও রজনীগন্ধার কলিকা-গুলিকে ধীরে ধীরে বিকশিত করিয়া তুলিতেছে।

প্রত্যেক গৃহ দীপমালায় বিভূষিত। যাহাদের অট্টালিকা আছে, তাহারা বাহিরের বারান্দায়, ও কার্নিশের উপর সারি সারি প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়াছে; ছেলে মেয়েরা চিলে-কোঠার উপর উঠিয়া তাহার ধারে ধারে সারি সারি প্রদীপ বসাইতেছে; কার্নিশ হইতে পাছে মৈ পিছ্‌লাইয়া পড়ে, এই ভয়ে একটি বালক মৈখানির নিম্নপ্রান্তে সর্ব্বশরীরের ভর দিয়া তাহা চাপিয়া ধরিয়া আছে—আর একটি মেয়ে অতি সন্তর্পণে এক একটি প্রজ্বলিত মৃৎপ্রদীপ লইয়া মৈএর নিকট আসিয়া দাঁড়াইতেছে; প্রদীপ হাতে হাতে চিলে-কোঠার ছাদের উপর আশ্রয়লাভ করিতেছে। যাহাদের খড়ের ঘর, তাহারাও বারান্দায় প্রদীপ সাজাইয়া দিয়াছে। কাহারও বাড়ীর সম্মুখে আমবাগান, কলা পেয়ারা ও ডালিমগাছে পরিপূর্ণ ছোট ছোট

বেড়; এক দিকে একটা বাঁশের ঝাড়; চারি দিকে সুপারি ও ডাব গাছের সারি,—এই সকল বৃক্ষের ব্যবধানপথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদীপগুলি মৃদু আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ করিতেছে।

ক্ষুদ্র বাজারখানিও আজ আলোকমালায় সুশোভিত। দোকানদারেরা স্ব স্ব দোকানের সম্মুখে বাঁশের খুঁটি বসাইয়া তাহাতে নানা ভঙ্গিতে বাখারি বাঁধিয়া দিয়াছে; বাখারির উপর চক্রাকারে মাটির প্রদীপ জ্বলিতেছে। স্থানে স্থানে মালসার ভিতর আল্‌কাতরা ঢালিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে। কেহ কেহ বা আল্‌কাতরা-মাখা বড় বড় পিপায় আগুন দিয়াছে; ধূ ধূ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে, প্রজ্বলিত অগ্নি ঊর্দ্ধে অনেক দূর পর্য্যন্ত ধূমময় শিখা বিস্তার করিয়াছে; গ্রামের ছেলেরা অদূরে দাঁড়াইয়া বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে সেই অগ্নিক্রীড়া দেখিতেছে। বাজারের দুই পাঁচটা কুকুর এই অনভ্যস্ত দৃশ্য দেখিয়া দূরে দাঁড়াইয়া অত্যন্ত অসন্তোষের সহিত চীৎকার করিতেছে, এবং সহসা কোনও বালক-হস্তনিক্ষিপ্ত অতর্কিত লোষ্ট্রপ্রহারে আহত হইয়া লাঙ্গুল সঙ্কুচিত করিয়া বিশ পঁচিশ হাত দূরে পলাইয়া যাইতেছে, সেখানে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বিকট চীৎকার করিতেছে! দুই তিনটি দোকানের সম্মুখে পাঁচ ছয় হাত ঊর্দ্ধে এক একটা কাগজের বৃহৎ 'ফানুস' ঝুলিতেছে; তাহার মধ্যে একটা উজ্জ্বল আলো, তাহার চারি পাশে মানুষ, বানর, হাতী, ঘোড়া, উট, গরু প্রভৃতির ছোট ছোট প্রতিকৃতি—কাগজে নির্ম্মিত; ধূমের জোরে ছবিগুলি ক্রমাগত ঘুরিতেছে, আর ফানুসের ঘেরের পাতলা কাগজে সেই সকল ছবির ছায়া পড়িতেছে; ছেলেরা স্থিরভাবে নীচে দাঁড়াইয়া মাথা তুলিয়া এই দৃশ্য উপভোগ করিতেছে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের

সঙ্গে লইয়া মধ্য শ্রেণীর গৃহস্থরমণীগণ পর্য্যন্ত পায়ের মল খুলিয়া, ময়লা কাপড় পরিয়া, ঘোমটা টানিয়া, সারি বাঁধিয়া, আলো দেখিতে বাহির হইয়াছেন ;—তাঁহাদের সসঙ্কোচ পদক্ষেপে ও সলজ্জ দৃষ্টি-নিক্ষেপে তাঁহাদের কুলের পরিচয় ব্যক্ত হইতেছে। কোন যুবতীর ক্রোড়স্থ তিন বৎসরের শিশুটি একটি দোকানের সম্মুখস্থিত উজ্জ্বল আলোক-শিখার দিকে কোমল চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহার মাতার দীর্ঘ অবগুণ্ঠন সজোরে খুলিয়া দিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "দেখ্ মা, কেমন আলো !"—লজ্জাবনতমুখী সাধ্বী পুত্রের ব্যবহারে বিষম বিব্রত হইয়া ত্রস্তভাবে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন, এবং অত্যন্ত নিম্নস্বরে শিশুকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "চুপ কর, দস্যি ছেলে ! চেঁচাস্ নে, তোর কথা শুনে কে আবার চিনে ফেল্‌বে !"

গ্রামের এক প্রান্তে গ্রাম্যদেবতা কালীর পীঠস্থান। কালীবাড়ীতে আজ বড় ধুম। প্রাচীন দালানখানি আজ আলোকমালায় সজ্জিত, সম্মুখের দ্বার উন্মুক্ত ; উচ্চ বেদীর উপর স্বর্ণরজতাভরণভূষিতা প্রস্তরময়ী দেবীমূর্ত্তি ! বেদীর নিম্নে ঘটের উপর একটি নারিকেল, তাহা হইতে অঙ্কুর উদ্গত হইয়াছে, তাহার তিন চারিটি সতেজ নবীন পত্র দেবীর পাদমূল পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়াছে ! গৃহমধ্যে ধূপাধারে ধূপ জ্বলিতেছে, ধূপের সুগন্ধে গৃহকক্ষ পূর্ণ। রমণীগণ দলে দলে আসিয়া সতৃষ্ণনয়নে ভক্তিবিহ্বলচিত্তে দেবীর মুখের দিকে চাহিতেছেন ; তাহার পর চৌকাঠে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া, হৃদয়ের অকৃত্রিম সুগভীর ভক্তিতে দেবীর মহিমাকে যেন আরও উজ্জ্বল করিয়া ধীরে ধীরে অন্যত্র পূজা দেখিতে যাইতেছেন। এক জন ভক্ত দেবীর সম্মুখে

বেদীর একটু দূরে গললগ্নীকৃতবস্ত্রে দাঁড়াইয়া আছে, এবং মধ্যে মধ্যে 'মা! মা!' রবে হুঙ্কার দিয়া উঠিতেছে। এই গভীর অন্ধকারপূর্ণ রাত্রে তাহার সেই গম্ভীর কণ্ঠস্বর যেন চতুর্ভুজা দেবীর পাষাণ-হৃদয়ের অন্তস্থলে প্রবেশ করিয়া তাহা বিচলিত করিয়া তুলিতেছে!—সে স্বরে কোমলতা নাই, ভক্তির স্নিগ্ধতা নাই, বিশ্বাসের নির্ভরতাও নাই; তাহা কর্কশ, নিরাশাব্যঞ্জক, কাতরতাপূর্ণ হইলেও অত্যন্ত নীরস; পুত্র মাতাকে যে স্বরে আহ্বান করে—এই ভক্তটির আহ্বানে সেই স্বরের মাধুর্য্য বা আবেগের উচ্ছ্বাস নাই।

কালীর দালানের নীচেই একটি সুবৃহৎ তমাল তরু; বৃক্ষটি অধিক উচ্চ নহে, কিন্তু তাহার শাখাপল্লবের আতপত্রে অনেকখানি ভূমি সমাচ্ছন্ন। বৃক্ষের মূলদেশ ইষ্টকবদ্ধ; সেই 'সানে'র উপর এক জন 'সাধু' একখানি ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপর যুক্তাসনে উপবিষ্ট; চেলার দল সাধুকে বেষ্টন করিয়া বসিয়াছে। সাধুর সর্ব্বাঙ্গ ভস্মাবৃত, মস্তকে ধূসর জটাভার, পরিধানে মলিন কৌপীন, বোধ হয় কোনও কালে তাহা গৈরিক বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছিল! সাধুর সিন্দুরচর্চ্চিত ত্রিশূলটি অদূরে মৃত্তিকায় প্রোথিত; তাঁহার গেরুয়া রঙ্গের ঝুলিটা মাথার উপর তমালশাখায় ঝুলিতেছে। সাধুর সম্মুখে বড় একটি কাঠের গুঁড়ি জ্বলিতেছে; মধ্যে মধ্যে গাঁজার কলিকায় গাঁজা সাজা হইতেছে; সন্ন্যাসীঠাকুর তাঁহার সুদীর্ঘ চিমটার সাহায্যে আগুন তুলিয়া তদ্দ্বারা কলিকা পূর্ণ করিতেছেন, এবং দুই হস্তে কলিকাটি চাপিয়া ধরিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, মাথাটি একটু বাঁকাইয়া, সজোরে গাঁজার দম্ কশিতেছেন; তাহার পর এক মুখ ধূমের সহিত অস্পষ্টস্বরে "বোম্ ভোলা!"—"কালী

কুলকুণ্ডলিনী!" বলিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিতেছেন। প্রভুর প্রসাদলাভের চেষ্টায় চেলার দলে বিষম হুড়াহুড়ি বাধিয়া যাইতেছে! গাঁজার উৎকট গন্ধে চারি দিক পরিপূর্ণ।

অনেক রাত্রে কালীপূজা আরম্ভ হইল। একটা ঢাক, একজোড়া ঢোল, আর খান দুই কাঁশি মাথার কাছে রাখিয়া, ময়লা চাদরে আপাদ-মস্তক আবৃত করিয়া বাজ্‌নদারেরা একটা পুরাতন বড় মাদুরের উপর পড়িয়া নাসিকাধ্বনি করিতেছিল; হঠাৎ পুরোহিত ঠাকুরের ঘণ্টার ঠং ঠং শব্দ শুনিয়া তাহারা জাগিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। তাহার পর স্ব স্ব বাদ্যযন্ত্র লইয়া দালানের ঠিক সম্মুখে আসিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল। বাদ্যধ্বনি শুনিয়া পূজা আরম্ভ হইয়াছে ভাবিয়া গ্রামবাসীদিগের যাহার যে 'মানসা' ছিল, তাহা লইয়া সকলেই একে একে পূজা দিতে আসিল। কেহ রোগমুক্ত হইয়াছে বলিয়া, কাহারও ভাগ্যে পুত্রলাভ হইয়াছে বলিয়া, কেহ বা মামলায় জয়লাভ করিয়া, খুব ধুমধামের সহিত পূজা দিতে আসিল; সঙ্গে বাদ্যভাণ্ড, জোড়া পাঁঠা, পট্ট-বস্ত্র, সুরঞ্জিত শাঁখা, স্বর্ণনির্ম্মিত নথ; পাত্রে নানাবিধ ফল, ফুল, চন্দন; ধূপাধারে ধূপ। পুরোহিত পূজা শেষ করিলেন। ঘণ্টার বাদ্য বাজিল। সদ্যঃস্নাত, মন্ত্রপূত কৃষ্ণবর্ণ ছাগশিশু দুটিকে হাড়ি-কাঠে ফেলিয়া কামার খড়্গের এক আঘাতেই তাহাদের মস্তক দেহচ্যুত করিয়া ফেলিল। হাড়িকাঠ ও তাহার চারি পাশের অনেক-খানি মাটী রক্তে সিক্ত হইয়া গেল; আরও জোরে জোরে ঢাক বাজিয়া উঠিল। কয়েকটা ছেলে পাঁটার রক্ত লইয়া পরস্পরের গায়ে ছড়াইয়া দিয়া আনন্দ বোধ করিতে লাগিল! রুধিরপ্লাবিত

ছাগমুণ্ড একখানি থালের উপর রাখিয়া দেবীর পদতলে অর্পিত হইল। দেবী তাঁহার করাল জিহ্বা প্রসারিত করিয়া নির্নিমেষ শূন্যদৃষ্টিতে এই নিরপরাধ নিরাশ্রয় জীবশিশুর মৃত্যু,—এই শোণিতস্রাব চাহিয়া দেখিতেছেন! তাঁহার চরণমূলে কতদিন হইতে এইভাবে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে; যুগান্তের পূর্ব্ব হইতে দুর্ব্বলের এমনই রক্তপাত দেখিয়া দেখিয়া বুঝি তাঁহার দেব-হৃদয় পাষাণের ন্যায় কঠিন হইয়া গিয়াছে!

যাহারা পূজা করিতে আসিয়াছিল, পূজা শেষ হইলে পূজারী ঠাকুর তাহাদিগের গলদেশে এক একগাছি ফুলের মালা পরাইয়া, থালের উপর দেবীর কিঞ্চিৎ প্রসাদ রাখিয়া থালগুলি প্রত্যর্পণ করিলেন। তাহারা প্রণাম করিয়া প্রণামীর টাকা পুরোহিতের হস্তে প্রদান করিয়া সদলে গৃহে প্রস্থান করিল। প্রসাদের অল্পতা দেখিয়া পুরোহিতের লোভাতিশয্যে কেহ কেহ বড়ই বিরাগ প্রকাশ করিল; বিশেষতঃ, পুরোহিত ঠাকুর দুইটি পাঁঠার মুণ্ডই নিজের ভোগের জন্য রাখিলেন দেখিয়া, রামজয় সরকার তাহার জেঠ্‌তুতো ভাই পরমানন্দকে বলিল, "দেখ্‌চ দাদাঠাকুরের আক্কেলটা! দুটো মুণ্ডুর একটা আমাদের দে, না দুটোই নিজের জন্যে রাখ্‌লে! মায়ের ভোগের জন্যে পাঁচ সের সন্দেশ আন্‌লাম, পাঁচটা বৈ ফেরত দিলে না! এনার চেয়ে আমাদের বিহারী ঠাকুরএর বিবেচনা ঢের ভাল; এখন থেকে তার পালিতেই পূজো আন্‌ব।" পরমানন্দের বয়স বেশী হইয়াছিল; সে প্রাচীন ও বিজ্ঞ, ছোট ভাইয়ের অসন্তোষ দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিচলিত হইল, দুঃখিত-ভাবে বলিল, "ছিঃ! ও কথা বলে না; মায়ের প্রেসাদ, যা পাওয়া যায়, তাই ঢের। প্রেসাদ কি বেশী মেলে রে বোকা!"

কাঁসারীপাড়ার বারোয়ারীতলায় আজ ভারি ঘটা! একটি তেমাথা রাস্তার ধারে অনেকখানি যায়গা পরিষ্কৃত করিয়া চাটাই দিয়া সেখানে টাপোর নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই টাপোরের নীচে সদ্যোনির্ম্মিত কাঁচা বেদীর উপর কালীর প্রকাণ্ড মৃণ্ময়ীমূর্ত্তি; সম্মুখে দুই একটা ক্ষীণ আলো জ্বলিতেছে, পাশে একডালি ফুল ও নৈবেদ্যের নানাবিধ উপকরণ পড়িয়া রহিয়াছে। ঘটের সম্মুখে একখানি কুশাসন পাতা; আসন শূন্য; পুরোহিত মহাশয়ের এখনও শুভাগমন হয় নাই। যজমান বাড়ীর পূজা না সারিয়া তিনি এ বারোয়ারী কাণ্ডে হাত দিতে সাহস করেন নাই; কারণ, তাঁহার বিবেচনায় বারোয়ারী পূজাটা উঠবন্দী মহাল, আজ আছে, কাল নাই; যজমানের বাড়ীর পূজা কায়েমী সত্ব, চিরদিনই বর্ত্তমান; সুতরাং আগে যজমানের মন রাখা চাই।

বারোয়ারী কাণ্ডে সকলেই কর্ত্তা, বিশেষতঃ যাহাদের কণ্ঠস্বর উচ্চ! বার জন কর্ত্তা বলিয়াই কোনও কার্য্যে শৃঙ্খলা নাই। সন্ধ্যার সময় পাণ্ডারা ও পল্লীযুবকেরা অনেকে মিলিয়া দুধ ও চিনিমিশ্রিত এক গামলা সিদ্ধি পান করিয়াছে; রাত্রি যতই গভীর হইতেছে, তাহাদের নেশাও তত জমিয়া আসিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার ও মাতামাতিও ততই বাড়িতেছে! রাত্রে কবির গান হইবে; গানের আসর ঠিক করিবার জন্য কয়েক জন পাণ্ডা ও 'আট পিঠে' যুবক আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

অন্য দিকে গ্রাম্যদেবতা কালীর বাড়ীতে নৈবেদ্য পাঠাইবার আয়োজন চলিতেছে। বড়বাজারের ভিতর দিয়া মহাসমারোহে নৈবেদ্য লইয়া যাইতে হইবে, সে নৈবেদ্য অসাধারণ হওয়াই আবশ্যক; কারণ, বড়বাজারের দল কাঁসারীপাড়ার দলের প্রতিদ্বন্দ্বী! একখানি

প্রকাণ্ড বারকোষে এই নৈবেদ্য সাজান হইয়াছে। বারকোষখানির পরিধি একখানি বড় গরুর গাড়ীর চাকার সমান; নৈবেদ্যের উপকরণের পরিমাণও তদনুরূপ! আধ মণ ভিজে আতপ চাউল চূড়াকারে সজ্জিত, তাহার উপর একটি পাঁচ সের ওজনের গোল্লা সন্দেশ—যেন হিমালয়ের স্কন্ধে তুষারমণ্ডিত গৌরীশঙ্কর!—চারি পাশে নানা রকম ভিজে, পাটনাই মটর, মুগের ডাল, বরবটী ইত্যাদি; প্রত্যেক প্রকার সামগ্রী আড়াই সেরের কম নহে। গোটা চারি পাঁচ নারিকেলের শাঁস খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা, পাঁচ ছয়টা শশার চাকা, আধ হাঁড়ি গুড়ে বাতাসা, তিন চারিখানি আখ, খোসা ছাড়ান—খণ্ড খণ্ড ভাবে স্তূপাকারে সজ্জিত। বারকোষখানি দুইটি সমান্তরাল বংশদণ্ডের উপর বসাইয়া দড়ি দিয়া ভাল করিয়া বাঁধিয়া চারি জন গোয়ালার ঘাড়ে চাপাইয়া কালীবাড়ী পাঠান হইল; সঙ্গে ঢাক ঢোল মশাল,—আর একপাল ছেলে!

অনেক রাত্রে বারোয়ারীতলায় পুরোহিত মহাশয়ের সমাগম হইল। অনেকগুলি যজমানবাড়ীতে পূজা করিয়া আজ তিনি পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, তাহার উপর রাত্রি কিছু বেশী হওয়ায় পাণ্ডারা তাঁহাকে দুই একটা কটু বাক্যও বলিয়াছে; তিনি আদৌ বাক্যব্যয় না করিয়া হাত পা ধুইয়া পূজায় বসিলেন। অনেক দিন পরে আজ বারোয়ারী-তলায় মহিষ-বলি হইবে; তাই সেখানে পূজার বাজনা বাজিবামাত্র গ্রামের সমস্ত লোক মহিষ-বলির আমোদ দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইল। বলির জন্য একটি শিশু মহিষ আনাইবার কথা ছিল; কিন্তু অনেক অনুসন্ধানেও মহিষশাবক না পাওয়ায় বারো টাকা দিয়া অগত্যা একটা অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক বৃহৎকায় মহিষ আনা হইয়াছে।

বারোয়ারীতলায় একটা বট গাছে দুইগাছি খাটো দড়ি দিয়া তাহাকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। মহিষের ঘাড় নরম করিবার জন্য দুই জন লোক সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই তাহার ঘাড়ে ঘি মাখাইতেছিল, এবং মধ্যে মধ্যে বেলুন দিয়া তাহার ঘৃতসিক্ত ঘাড় ডলিতেছিল!

মধ্যরাত্রে বাজনা শুনিয়া ছেলে বুড়ো সকলে মহিষ-বলি দেখিবার জন্য বারোয়ারীতলায় ছুটিয়া আসিল। নিকটে ধনঞ্জয় মিত্রের বাড়ীতে লোকজন সবে খাইতে বসিয়াছে, লুচির উপর পাঁঠা পড়িয়াছে মাত্র, এমন সময়ে বলিদানের বাজনা বাজিয়া উঠিল; মহিষ-বলি দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া সকলে তাড়াতাড়ি খানকত লুচি ও মাংস নাকে মুখে গুঁজিয়াই বাহির হইয়া পড়িল!

সান্যালবাড়ীতে আহারের এখনও বিলম্ব আছে। বৃদ্ধ বংশলোচন সান্যাল তান্ত্রিকমতাবলম্বী লোক; তাঁহার পুরোহিত যে তাড়াতাড়ি পূজা সারিয়া আর পাঁচ জন যজমানের পূজা করিতে যাইবেন, তাহা হইবার যো নাই। তিনি জানেন, যথাশাস্ত্র কালীপূজা শেষ করিতে প্রায় সমস্ত রাত্রি লাগে, তাই প্রতিবৎসর তাঁহার বাড়ীতে পূজার প্রকরণটা কিছু বিস্তারিতভাবেই সম্পন্ন হয়; কালীপূজার রাত্রে পূর্ব্ব দিক ফরসা হইবার অধিক পূর্ব্বে তাঁহার বাড়ীতে কেহ আহারে বসিতে পায় না! তাই আহারের অনুরোধেই যাঁহারা নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যান, তাঁহারা কালীপূজার রাত্রে সান্যাল বাড়ী প্রসাদ পাইবার জন্য কিছুমাত্র আগ্রহ দেখাইতেন না।

কিন্তু সান্যালবাড়ী গোবিন্দপুরের ছোকরা বাবুদের পক্ষে একটি প্রধান আকর্ষণের স্থান; সান্যালবাড়ী তাঁহাদের একটি প্রধান

আড্ডা। আমোদপ্রিয় পল্লীযুবকগণের যাহা আবশ্যক—পান তামাক, গান বাজনা, তাস পাশা প্রভৃতি সকল সামগ্রীরই এখানে যথারীতি আয়োজন আছে। আফিসের নব্য আমলা ও শিক্ষানবিশগণ, স্কুলকলেজের নাম-কাটা গ্রাম্যজমীদারগণের বংশধরবর্গ ও তাঁহাদের মোসাহেবের দল আজ সভাস্থল জুড়িয়া বসিয়া আছেন। দেওয়ালে একটি বিবসনা সুন্দরী পরী বাহু বিস্তার করিয়া, সুদৃশ্য পাখা মেলিয়া যেন কোন দূরতর রাজ্যে উড়িয়া যাইবার জন্য সচেষ্ট! তাহার এক হাতে একটি সুন্দর গোলাকার ঘড়ি, ঘড়িতে টক্‌টক্ করিয়া শব্দ হইতেছে। দুই তিন হস্ত ব্যবধানে উৎকৃষ্ট ফ্রেমে বাঁধান বড় বড় ছবি; দেবসভা, সমুদ্রমন্থন, নন্দনকাননে অপ্সরীগণের প্রমোদনৃত্য—ইত্যাদি নানা প্রকার সুরঞ্জিত দেশীয় চিত্র। প্রত্যেক চিত্রের পাশে এক একটি ছোট ব্র্যাকেট, তাহার উপর কৃষ্ণনগরের মাটীর পুতুল,—ভিস্তি জল লইয়া যাইতেছে, ভারে দেহ অবনত; ঘোড়ার সহিস মাথায় এক বোঝা ঘাস লইয়া দাঁড়াইয়া আছে; দরজী চশমা চোখে দিয়া কাপড় শেলাই করিতেছে; অন্ধ বামহস্তে লাঠি ধরিয়া দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া ভিক্ষা চাহিবার ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া আছে—ইত্যাদি। শুভ্র ফরাসের উপর একধারে তাস, অন্যধারে পাশা চলিতেছে। বংশলোচন সান্যালের মধ্যম পুত্র পদ্মলোচনবাবু বাঁয়া-তবলায় বিশেষ দক্ষ। তিনি মস্তক, গ্রীবা ও মুখের বিচিত্র ভঙ্গী করিয়া, কখনও দ্রুত তালে, কখন বা ধীরে তবলা বাজাইতেছেন; আর তাঁহার নিকটে বসিয়া একটি অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক যুবক একটা স্থূলোদর সেতারের তারে ঝঙ্কার দিয়া অতি গম্ভীর আওয়াজে গাহিতেছে,—

"কে এ রমণী নীরদবরণী
শবহৃদি' পরে সমরে নাচিছে!"

গান শুনিয়া কোন কোন যুবক তাস খেলিতে খেলিতেই ভাবাবেশে 'আহা হা!' বলিয়া তাল দিতেছে, এবং পরক্ষণেই গানের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে 'ইস্তকবিস্তি' 'কাবায়' করিতেছে! অন্য দিকে দ্যূতক্রীড়াসক্ত কোনও যুবক আরও অধিক উৎসাহের সহিত চীৎকার করিয়া জানাইতেছে যে, তাহার সহযোগী এইবার 'কচে বারো' মারিতে পারিলে স্বর্ণ দ্বারা তাহার করপল্লব বাঁধাইয়া দিবে!—ইতিমধ্যে ভগ্নপাইক আসিয়া সংবাদ দিল, "কাঁসারীপাড়ায় মোষবলি হচ্ছে; আর বেশী দেরী নেই।"

তৎক্ষণাৎ গান, বাজনা, খেলা সমস্তই বন্ধ হইয়া গেল। মজলিস ভাঙ্গিয়া সকলে বারোয়ারীতলায় ছুটিল; দেখিতে দেখিতে বারোয়ারীতলা জনপূর্ণ হইয়া উঠিল! বারোয়ারীতলায় একটি নূতন ও সুদৃঢ় হাড়িকাঠ প্রোথিত হইয়াছে; যে হাড়িকাঠে পাঁঠা বলি হয়, এই হাড়িকাঠ তাহা অপেক্ষা অনেক বড়। চারিজন লোক দুইগাছি নূতন দড়ি দিয়া উৎসৃষ্ট মহিষটাকে বাঁধিয়া হাড়িকাঠের সম্মুখে লইয়া আসিল।

তখন গভীর রাত্রি। উৎসবের শত শত দীপ বহুপূর্ব্বেই নিবিয়া গিয়াছে, সুতরাং তখন চতুর্দ্দিক অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন; কেবল পূজামণ্ডপে দুই চারিটা মশাল দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। গ্রামখানি প্রায় সুপ্তিমগ্ন হইলেও এই বারোয়ারীতলায় দর্শকগণের চক্ষুতে নিদ্রা নাই; নানা বর্ণের দোলাই, বালাপোষ, বনাত, আলোয়ান গায়ে দিয়া, প্রায় নরনারীগণ নিদ্রাহীননেত্রে কৌতূহলস্পন্দিত হৃদয়ে মহিষবলি দেখিতেছে।

চারি জন লোকেও মহিষটাকে আয়ত্তে রাখিতে পারিতেছে না; সে একবার মশালের দিকে, একবার বিপুল জনতার দিকে ভীতিবিহ্বলদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে, এবং শৃঙ্গ নত করিয়া এক একবার ছুটিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছে।

হাড়িকাঠের কাছে একটি অগভীর লম্বা গর্ত্ত করা হইয়াছে; মহিষটাকে সেই গর্ত্তে নামাইয়া, হাড়িকাঠের মধ্যে তাহার গলা পূরিয়া কাঠের খিল আঁটিয়া দেওয়া হইল। চারি জন লোক তাহার পদচতুষ্টয়ে চারিগাছি শক্ত দড়ি বাঁধিয়া তাহার লেজের দিকে দাঁড়াইয়া সজোরে টানিতে লাগিল। মহিষের সর্ব্বাঙ্গ জল সিক্ত, ললাট মেটে সিন্দূরে রঞ্জিত। নিকটে অসুরাকৃতি কামার সুবৃহৎ শাণিতখড়্গহস্তে দণ্ডায়মান; তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ,—বোধ করি, কিছু অধিক মাত্রায় মায়ের প্রসাদ পাইয়াছে,—মালকোঁচা করিয়া কাপড়পরা, কোমরে গামছাবাঁধা; লোকটাকে হঠাৎ দেখিলে যমদূত বলিয়াই ভ্রম হয়!

হাড়িকাঠের খিলে মহিষের গলাটি আটকাইয়া দেওয়া হইলে, এক জন কর্ত্তা স্খলিতস্বরে বলিল, "কৈ রে! লঙ্কা-বাটা কৈ? আঁচ না দিলে মজা হবে কেন?"—মজা দেখিবার জন্য এক জন লোক খানিক লঙ্কা-বাটা লইয়া আসিল। দুই তিনজন পাণ্ডা মহা উৎসাহে সেই লঙ্কা-বাটা আসন্ন মৃত্যু কবলিত মহিষের নাকে মুখে গুঁজিয়া দিল! লঙ্কার ঝাল নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলে অসহ্য যন্ত্রণায় মহিষ কিরূপ ছট্‌ফট্ করে, তাহা দেখিয়া মজা উপভোগ করিবার উদ্দেশ্যেই এই উপায় অবলম্বিত হইল; আর এই নিষ্ঠুর আমোদ দেখিবার আশায় সকলে সেই মধ্য রাত্রে বিস্ফারিতনেত্রে রুদ্ধ নিশ্বাসে দণ্ডায়মান!

খুব জোরে জোরে ঢাক বাজিয়া উঠিল; কামার খাঁড়াখানি সতর্ক ভাবে বাগাইয়া ধরিল। সারা বিকাল বেলাটা ধরিয়া ভাজা বালী দিয়া তাহাতে শাণ দেওয়া হইয়াছে; মশালের বিক্ষিপ্ত আলোক খড়্গে পড়িয়া ঝক্-মক্ করিতে লাগিল।

লঙ্কাবাটায় ঝাল নাকে মুখে প্রবেশ করিবামাত্র মহিষটা ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া উঠিল; নিকটে যে সকল লোক দাঁড়াইয়া ছিল, এই বিকট গর্জ্জন শুনিয়া তাহারা দশ হাত পিছাইয়া গেল। যে চারি জন লোক পশ্চাতে ঝুঁকিয়াপড়িয়া মহিষের পা-বাঁধা দড়ি চারিগাছি সজোরে টানিতেছিল, মহিষের পদের আস্ফালনে আর তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না, সটান মাটিতে পড়িয়া গেল! তৎক্ষণাৎ দু'জনের হাত হইতে দড়ি খসিয়া পড়িল। সেই মুহূর্ত্তেই কামার হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া খাঁড়াখানি মাথার উপর উত্তোলন করিল; কিন্তু সে আর মহিষের স্কন্ধে আঘাত করিবার সুযোগ পাইল না! পা একটু আল্‌গা পাইতেই মহিষ উপরের দিকে এমন একটি প্রচণ্ড ঝিঁকে মারিল যে, হাড়িকাঠ দুই হাত মাটী বিদীর্ণ করিয়া উঠিয়া আসিল; সঙ্গে সঙ্গে মহিষটাও চারি পায়ে ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং সিং নীচু করিয়া লেজ তুলিয়া হাড়িকাঠটা গলায় ঝুলাইয়া লইয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে একদিকে ছুটিয়া চলিল! আর কাহার সাধ্য তাহাকে ধরে? সকলে মহাবিস্ময়ে এই দৃশ্য দেখিতে লাগিল, এবং মহিষ যে দিকে ছুটিয়া চলিল, সেই দিকের লোকেরা ভয়ে পৃষ্ঠভঙ্গ দিল; এক জনের গায়ের উপর আর দশ জন পড়িতে লাগিল! দর্শকগণের মধ্যে সশঙ্ক কোলাহল উত্থিত হইল। দশ বারোজন লোক উৎসর্গীকৃত মহিষের পশ্চাতে ছুটিল; কিন্তু তিমিরাবৃত অরণ্যানীবেষ্টিত গ্রাম্যপথ

দিয়া মহিষ ঊর্দ্ধপুচ্ছে কোথায় যে অন্তর্দ্ধান করিল, কেহই তাহা নির্ণয় করিতে পারিল না!

অর্দ্ধেক আমোদ নষ্ট হইল বলিয়া দর্শকগণ আক্ষেপ করিতে করিতে বাড়ী চলিয়া গেল। উৎসৃষ্ট মহিষ হাড়িকাঠ উপ্‌ড়াইয়া লইয়া পলায়ন করায় বারোয়ারীর পাণ্ডারা হতবুদ্ধি হইয়া অনেকক্ষণ একস্থানে ছবির মত দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, এবং হয় ত কোন অজ্ঞাত কারণে তাহারা মা কালীর বিরাগভাজন হইয়াছে অনুমান করিয়া ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

পরদিন সকাল বেলা নদীর অপর পারে নিশ্চিন্তপুরে মহিষটাকে পাওয়া গেল। সেখান হইতে তাহাকে ধরিয়া আনিয়া, হাড়িকাঠ নূতন করিয়া পুতিয়া, বিনা আড়ম্বরে বলি দেওয়া হইল; সুতরাং আমোদটা আর তেমন জমিল না। বলিদানে বিঘ্ন ঘটায় একটা অনিশ্চিত অমঙ্গলের আশঙ্কা কাঁসারীপাড়ার পাণ্ডাদের মন হইতে কিছুতেই দূর হইল না।

অনেকে সেইদিন প্রভাতেই কালীপ্রতিমা নিঃশব্দে নদীজলে বিসর্জ্জন করিয়া আসিল। জবা, বিল্বদল ও পদ্মফুলের স্তূপে স্নানের ঘাট ভরিয়া গেল, এবং গ্রামের ছেলেরা স্নান করিতে আসিয়া উৎসৃষ্ট পুষ্পরাশি সংগ্রহ করিবার জন্য আস্ফালন, লম্ফন ও সন্তরণে নদীর অগভীর জল আবিল করিয়া তুলিল।

অপরাহ্ণ কালে ভিন্ন ভিন্ন পাড়া হইতে প্রতিমা বাহির হইয়া বাজারের দিকে চলিল। এক এক পাড়ার প্রতিমাগুলি একত্র সারি বাঁধিয়া বাহির হইল। সর্ব্বপ্রথমে খাস ও নিশান, তাহার পর বাদ্যভাণ্ড, তাহার পশ্চাতে পাঁচ, সাত বা দশখানি প্রতিমা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে চলিল।

সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রতিমাখানি সকলের পশ্চাতে। কোনও জমীদারের বাড়ী হইতে বাহির হইলে তাঁহার পাইক বরকন্দাজেরা প্রতিমার অগ্রবর্ত্তী হইল; পাছে তাহারা অন্য জমীদারের লোক-লস্করের সঙ্গে মারামারি করে এই আশঙ্কায়, লাল-পাগড়ী-শোভিত চাপরাসধারী পুলিস কন্‌ষ্টেবলেরা রুল 'বাঁধিয়া' তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। পুলিস ফৌজের অগ্রে থানার দারোগা বকাউল্লা মিঞা পরমগম্ভীরভাবে গোঁফে তা দিতে দিতে ঐরাবতের মত হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার পায়ে 'নাগোরা' জুতা; পরিধানে সাদা পায়জামার উপর কাল কোট; মাথায় বি, পি, অঙ্করাঙ্কিত কাল গোল টুপি। দারোগা সাহেবের গোঁফ দাড়ি পাটল বর্ণে রঞ্জিত; কিন্তু পক্ক কেশের স্বাভাবিক শুভ্রতা তাহাতে ঢাকা না পড়িলেও, তাঁহার বয়স যে তিন কুড়ি উত্তীর্ণ হইয়াছে, ইহা তাঁহার 'সার্ভিস বহি' দেখিয়া নির্ণয় করা সম্পূর্ণ অসম্ভব! বস্তুতঃ তিনি বৃদ্ধ বয়সে কেবল অহিফেনের সহায়তায় দেহখানি যে প্রকার অটুট রাখিয়াছেন, তাহাতে কেহই তাঁহার বৃদ্ধাপবাদ প্রদান করিতে পারিবে না;—বিশেষতঃ, কোরাণের সম্মানরক্ষার জন্যই তিনি, তিনটি বিবি বর্ত্তমানেও, প্রায় ছয়মাস পূর্ব্বে একটি 'খাপসুরত' ষোড়শী বিবিকে 'নিকা' করিয়া যৌবনের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন!

গ্রাম্যবাজার লোকে লোকারণ্য! স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা,—চাষার ছেলে মেয়েরাও পূজা দেখিবার কাপড় পরিয়া, কেহ গায়ে ফ্রেঞ্জাই আঁটিয়া কেহ বা কাঁধের উপর ভাঁজ করা 'ধোপদস্ত' চাদর ফেলিয়া, সারি বাঁধিয়া চলিয়াছে; ঢাকীদের ঢাকের কাছে গিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইতেছে। কালী মন্দিরের নিকট গ্রামের সমস্ত প্রতিমাগুলিকে দুই সারিতে বিভক্ত করিয়া রাস্তার ধারে রাখা হইল; সন্ধ্যার সময় কাঁসারীপাড়ার

বারোয়ারীর প্রতিমাখানি আলোকমালায় সজ্জিত করিয়া সেখানে লইয়া যাওয়া হইল। যাহারা তক্তারামায় প্রতিমা সাজাইয়া বাহির করিয়াছিল, তাহারা তক্তারামার লাল নীল 'বেলে'র মধ্যে বাতি জ্বালিয়া দিল। অনেকে মশাল, রজমশাল, 'মহাতাপ' জ্বালিয়া লইল; এবং অন্ধকার গাঢ় হইলে সকলে একত্র মিলিয়া নদীর দিকে চলিল।

সমবেত ঢাকের প্রবল বাদ্যে গ্রাম প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। দর্শকগণ নদীতীর পর্য্যন্ত তাহাদের সঙ্গে গেল। কেহ কেহ সাজ খুলিয়া, কেহ কেহ বা সাজ সমেত প্রতিমা নদীজলে বিসর্জ্জন করিয়া গৃহে ফিরিল। ঢাকের সাজ ও প্রতিমার 'ছটা' ঘাড়ে লইয়া বাহকগণ যখন গৃহাভিমুখে ফিরিল, তখন ঢাক আবার উচ্চ রবে বাজিতে আরম্ভ করিল, এবং শানাই তীব্রস্বরে হৃদয়বেদনা প্রকাশ করিতে লাগিল। বিসর্জ্জনের সেই করুণ উচ্ছ্বাস ভরা বাদ্যে বিগত-উৎসব আলোকহীন সঙ্কীর্ণ গ্রাম্য পথে গ্রামস্থ নরনারী-বর্গের ক্ষোভ, বিষাদ ও অবসাদ যেন মূর্ত্তিমান হইয়া তিমিরাবগুণ্ঠিতা নৈশ পল্লী-প্রকৃতিকে ব্যথিত করিয়া তুলিল।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া

গোবিন্দপুরের বাগ্‌চী-বাড়ী একেবারে গ্রামের প্রান্তভাগে অবস্থিত। বাড়ীর অদূরে একটি প্রকাণ্ড দীঘি, এই কার্ত্তিক মাসেও তাহাতে জল থৈ থৈ করিতেছে! দীঘির অপর পারে গোচারণের মাঠ। রাখালেরা সেখানে গরু চরায়, গান করে, অদূরবর্ত্তী ধানের জমীর আইলে গরু ছাড়িয়া দিয়া গাছের ছায়ায় সবুজ ঘাসের উপর 'কপাটী' খেলে; এবং হেমন্তের ঝিল্লীরবমুখরিত শীতল সন্ধ্যায় গোচারণক্ষেত্র হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় পথের ধারে খেজুর গাছের স্কন্ধবিলম্বিত 'ঠিলি' খুলিয়া রস চুরি করে। অনেকে সন্ধ্যার অন্ধকারে কোন কলসীর মধ্যে নিহিত রসচুরি টুকরার সন্ধান না পাইয়া নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে কটুরস পান করিয়া সমস্ত রাত্রি মুখ চুল্‌কাইয়া মরে!

দীঘির এক পাশে একটা 'আচট্‌' মাঠের উপর কতকগুলি বুনো আসিয়া ঘর বাঁধিয়াছে। এই নূতন পল্লীখানির নাম 'বুনোপাড়া'। বুনোরা চাষ-বাস করে, গৃহস্থের বাড়ী 'কৃষাণী' করে, বাড়ীতে শাকসব্জী লাগাইয়া তাহাও বাজারে লইয়া গিয়া বিক্রয় করে। বুনোদের মেয়েরাও খুব পরিশ্রমী; 'রেজাগিরি' করিয়া ইহারা জীবিকা অর্জ্জন করে। গোবিন্দপুর অঞ্চলে কাহারও অট্টালিকার জন্য সুরকীর আবশ্যক হইলে, তাহা এই বুনো স্ত্রীলোকেরাই প্রস্তুত করে; এই কার্য্যের নাম রেজাগিরি: এই কর্ম্মটিতে বুনো রমণীদিগেরই একচেটিয়া অধিকার।

অনেক বুনো ঘরে বসিয়া খায়, তাহাদের মেয়েরা অর্থোপার্জ্জন দ্বারা তাহাদের প্রতিপালন করে। ইহা তাহাদের একটি অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। বুনোদের বিবাহে একটি অদ্ভুত 'আচার' প্রচলিত আছে,—বিবাহ শেষ হইলে বরটি ধীরে ধীরে একখানি কুটীরের চালের 'মট্‌কা'য় উঠিয়া বসে, আর নববধূ নীচে দাঁড়াইয়া তাহাকে আহ্বানপূর্ব্বক অনুনয়ের সুরে বলিতে থাকে,—

"চালে থেকে নামো তুমি,
ঘুঁটে কুড়িয়ে পুষবো আমি।"

কোন কোন বুনো স্ত্রীর এই অভয়বাণীকেই চিরজীবনের সম্বল মনে করিয়া এক পয়সাও উপার্জ্জন করে না! তাহাদের কাজের মধ্যে উৎসব-উপলক্ষে ধেনো মদ খাওয়া, এবং মাদল বাজাইয়া গান করা। মাদল বাজাইয়া যখন-তখন ইহারা বিচিত্র সুরে অন্যের দুর্ব্বোধ্য গান গায়িয়া স্তব্ধ শান্তিপূর্ণ গ্রামে একটা বিকট কলরবের স্রোত প্রবাহিত করে।

কালীপূজা শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বুনোপাড়া হইতে উৎসবের শেষ চিহ্ন এখনও অন্তর্হিত হয় নাই;—এক মুহূর্ত্ত সঙ্গীতধ্বনি ও মাদল-বাদ্যের বিরাম নাই!

বাগ্‌চীদের মেয়ে চারুশীলা এবার অনেক দিন পরে পিতৃগৃহে আসিয়াছে। আশ্বিনমাসের শেষেই তাহার শ্বশুরালয়ে যাইবার কথা ছিল; কিন্তু সে আজ দুই বৎসর ভাইফোঁটা দেয় নাই; শাশুড়ীকে পত্র লিখিয়া জানাইল, ভাইফোঁটার পর কার্ত্তিক মাসের শেষে বা অগ্রহায়ণের প্রথমে তাহাকে লইয়া গেলেই ভাল হয়। চারু শাশুড়ীর একমাত্র পুত্রবধূ,

তিনি বধূকে বড় ভালবাসিতেন; বধূও তাঁহাকে কখন পুলিসের মত ভীতিদায়ক জীব বলিয়া মনে করিত না।—শাশুড়ী বধূর প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না; অগ্রহায়ণের প্রথমেই দাসী ও পাল্কী পাঠাইবেন, এ কথা লিখিয়া চারুকে নিশ্চিন্ত করিলেন।

চারুশীলার বয়স এই সবে তের বৎসর। মুখখানি যেমন সুন্দর, স্বভাবটি তেমনই মিষ্ট; মুখে সর্ব্বদাই হাসি লাগিয়া আছে; চক্ষু দুটি কোমলতায় পূর্ণ। চারু জমীদারের বধূ হইলেও, মায়ের শিক্ষাগুণে, এই বয়সেই অনেক গৃহকর্ম্ম শিখিয়া ফেলিয়াছে; কিন্তু বাপের বাড়ী আসিয়া তাহার তিন বৎসরের ছোট ভাইটিকে কোলে পিঠে করিয়া, তাহার মুখে পুনঃপুনঃ চুমা খাইয়া, এক শত বার তাহাকে ভিন্ন রকমে সাজাইয়া, তাহার দিন কাটিয়া যাইত। বাপের বাড়ী আসিয়া দুই এক দিন অন্তরই সে তাহার ছোট বোন লক্ষ্মীর ঝাঁকড়া চুলের গোছা ও কতকগুলি গুছি লইয়া চুল বাঁধিতে বসিত, কিন্তু দুই তিন ঘণ্টা চেষ্টা করিয়াও সে মনের মত করিয়া চুল বাঁধিতে পারিত না; তখন সে রাগ করিয়া ঝন্‌ঝন্ শব্দে চারিগাছা মলের ঝঙ্কার তুলিয়া দীঘিতে জল আনিতে যাইত। জল বহিবার লোকের অভাব ছিল না, কিন্তু সন্ধ্যার পূর্ব্বে গর্ত্তের পাশ দিয়া বনের ধার দিয়া ছোট পিতলের কলসীটি কক্ষে লইয়া একবার দীঘিতে না গেলেই তাহার চলিত না!

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পূর্ব্বদিন রাত্রি হইতে চারুর চক্ষে ঘুম নাই! কখন রাত্রি পোহাইবে, কতক্ষণে সে ভাইফোঁটার আয়োজন করিবে, এই চিন্তাতেই বিভোর! অনেক রাত্রে বালিকা ঘুমাইয়া পড়িল।

পূর্ব্বদিক ফরসা হইবামাত্র চারুর ছোট বোন লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি উঠিয়া সাজি লইয়া ফুলবাগানে ফুল তুলিতে গেল। কার্ত্তিক মাসের প্রথম হইতেই 'যমপুকুর' পূজা করিবার নিয়ম। সে এবার পুকুরপূজা করিতেছে; তুলসীতলায় সে একটা ছোট—এক হাত লম্বা পুকুর কাটিয়াছে; পুকুরে জল ঢালিয়া তাহার মধ্যে হেলাঞ্চা কল্মির লতা পুতিয়া দিয়াছে; পুকুরের পাড়ে মান ও হলুদের চারা লাগাইয়াছে; পাশে মুগ কলাই ছিটাইয়া দিয়াছে; মুগের অঙ্কুর বাহির হইয়াছে—এখনও তাহা পল্লবিত হয় নাই। পাছে ছাগল কি গরুতে লক্ষ্মীর সাধের পুকুরের লতাপাতাগুলি খাইয়া যায়, কি কাহারও ছেলে মেয়ে ভাত খাওয়ার পর তাহা স্পর্শ করিয়া 'পচাইয়া' দেয়, এই ভয়ে চারু পুকুরটি কঞ্চির বেড়া দিয়া ঘিরিয়া লইয়াছে;—সম্মুখে একটি ছোট কঞ্চির দরজা, দড়ি দিয়া বাঁধা।

লক্ষ্মী শিউলীতলায় আসিয়া সাজি ভরিয়া শিউলী ফুল কুড়াইল। প্রস্ফুটিত সুন্দর শিশিরসিক্ত ফুলগুলি লোহিত বৃন্তে শুভ্র কোমল সৌন্দর্য্য বিকাশ করিয়া বৃক্ষমূল আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, আর বালিকা রক্তিম উষায়, জীবজগৎ জাগ্রত না হইতেই, ফিঙ্গে তাহার তরু-কোটর হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই, দহিয়াল তাহার পক্ষ মেলিয়া মুক্ত আকাশে একবার খানিকটা উড়িয়া আসিয়া, বাঁশের উচ্চতম শাখায় বসিয়া উষার আগমনীগান ধরিবার পূর্ব্বেই, বনদেবীর মত ফুল কুড়াইয়া সাজি পূর্ণ করিয়া ফেলিল। তাহার পর, গোটাকত জবা, করবী, স্থলপদ্ম, উঁচু উঁচু ডাল নোয়াইয়া পাড়িয়া লইয়া গিয়া, ফুলগুলি তাহার ক্ষুদ্র পুকুরের ধারে মানের পাতার ঢালিয়া রাখিল। পুকুরটির চারি দিক

সযত্নে নিকানো হইলে, তাহার চারি দিকে ফুলগুলি সাজাইতে সাজাইতে তাহার মনে পড়িল যে, পূর্ব্বদিন রাত্রে শুইবার সময় তাহার দিদি তাহাকে খুব ভোরে জাগাইয়া দিতে বলিয়াছিল!

লক্ষ্মী পুকুর সাজাইতে সাজাইতে উঠিয়া গিয়া দিদিকে ডাকিল। চারু উঠিয়া দেখিল, সকলেই জাগিয়াছে;— চারিদিক পরিষ্কার; উঠান রৌদ্রে ভরিয়া গিয়াছে! চারু লক্ষ্মীর উপর রাগ করিয়া বলিল, "এতখানি বেলা হয়েছে, এতক্ষণ আমাকে জাগিয়ে দিস্‌নি কেন রাক্ষুসী?" লক্ষ্মী হাসিয়া বলিল, "সত্যি দিদি! আমি সে কথা ভুলেই গিয়েছিলাম, পুকুর সাজাতে সাজাতে মনে পড়ে গেল; তা এখনও ত বেশী বেলা হয় নি।"

চারু কাপড় ছাড়িয়া দূর্ব্বা তুলিতে গেল। ফুলবাগানে চামেলী গাছের জাফরীর কাছে বেশ বড় বড় সুন্দর দূর্ব্বা জন্মিয়াছিল; চারু কতকগুলি দূর্ব্বা লইয়া সেগুলি ধুইয়া একখানি রেকাবীতে রাখিল, তাহার পর চন্দনপাটা পাড়িয়া খানিক চন্দন ঘসিল। ধান দূর্ব্বা ও চন্দনে রেকাবখানি সাজান হইলে, চারুশীলা বামা পিসীকে ডাকিয়া আনিবার জন্য লক্ষ্মীকে বামার বাড়ী পাঠাইয়া দিল।

চারুশীলাদের বাড়ীর কাছেই বামার ঘর। বামা জাতিতে কৈবর্ত্ত, শুদ্ধ শান্ত ধর্ম্মশীলা ও অতি পবিত্রচরিত্রা বিধবা; নির্ম্মল চরিত্রের জন্যই সে পুরলক্ষ্মীগণের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি লাভ করিয়াছিল। সংসারে সে নিতান্ত একাকিনী; কিন্তু গোবিন্দপুর গ্রামের সকল গৃহস্থেরই ঝি, বৌ যেন তাহার আপনার জন! গ্রামের পুরুষবর্গের সহিত তাহার একটা-না-একটা সম্বন্ধ আছেই,—কেহ তাহার দাদা, কেহ কাকা, কেহ জেঠা, কেহ মামা, ইত্যাদি। গ্রামের ছোট ছোট ছেলে

মেয়েরা তাহার একটা সাধারণ পদবী দিয়াছিল,—সে সকলেরই পিসী! যে বালক বাল্যকালে বামাকে পিসী বলিয়া ডাকিয়াছে, এখন সে যুবক, পুত্রের পিতা; কিন্তু এখন তাহার শিশু পুত্রটিও বামাকে দেখিবামাত্র দুটি হাত বাড়াইয়া অস্ফুটস্বরে আদর করিয়া বলে, "পিতি! তোলে নে!"—কেহ যদি কখন বামাকে জিজ্ঞাসা করে, "বামা! সংসারে ত তোমার কেউ নেই, তোমার দিন চলে কি ক'রে?" তাহা হইলে বামা কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া উত্তর দেয়, "কেন? আমার এমন সব সোনারচাঁদ ভাইপো ভাইঝি থাকৃতে আমার নাই কে, অভাব কিসের?"

সত্যই সংসারে বামার কোনও অভাব নাই; সকলেই তাহাকে ভালবাসে। সে যে গরীব, সংসারে সে যে দুঃখিনী বিধবামাত্র, তাহাকে দেখিলে, বা তাহার সঙ্গে আলাপ করিলে, এ কথা একবারও কাহারও মনে উদিত হয় না! পল্লীবধূগণ তাহাকে আপনাদের সুখদুঃখ-ভাগিনী ভগিনীর মত মনে করে; গৃহকর্ত্রীগণ সৎপরামর্শদাত্রী হিতৈষিণী সখী মনে করেন। কোন যুবতী শ্বাশুড়ীর নিকট তিরস্কৃত হইয়াছেন, তিনি বামার নিকট আপনার মর্ম্মব্যথা প্রকাশ করিয়া দুঃখভার লাঘব করিলেন। বামা হাসিতে হাসিতে সেই রূঢ়ভাষিণী শ্বাশুড়ীর কাছে আসিয়া বসিল, এবং ঘর কন্নার প্রসঙ্গ তুলিয়া অবশেষে বলিল, "হ্যাঁ দেখ মাসী মা! তুমি তোমার বৌর মনে ও রকম ক'রে কষ্ট দিও না; তোমার ত ঐ একটি বৈ বৌ নয়, তোমার কথা শুনে মুখ ভার ক'রে থাকে, তা কি তোমারই দেখ্‌তে ভাল লাগে? দোষ দেখ্‌লে দু' কথা বুঝিয়ে বলাই ভাল, ছেলেমানুষ বৈ ত নয়! মনে

ব্যথা দিয়ে কথা বল্লে কাউকে কখনও আপনার করা যায় না।"—বামা এমন ভাবে কথা পাড়ে, এবং এমন সাবধানে তাহার মন্তব্য প্রকাশ করে যে, গৃহিণী তাঁহার বধূর বিরুদ্ধে কোনও কথা বলিবারই সুযোগ পান না! শেষে বামা বধূকে ডাকিয়া আনিয়া শ্বাশুড়ী বধূর মনোমালিন্য দূর করিয়া দেয়।

ছোট ছেলে মেয়েদের ভুলাইতে, তাহাদের ঘুম পাড়াইতে, বামার মত ক্ষমতা গোবিন্দপুরে কোনও রমণীরই ছিল না। ছেলে মেয়েরা তাহার অত্যন্ত বশীভূত। দশ বৎসর বয়সে চারুশীলার বিবাহ হইয়াছে। বিবাহের পরদিন সকাল বেলা চারু কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ ফুলাইয়া ফেলিয়াছিল;—সে কিছুতেই শ্বশুরবাড়ী যাইবে না! প্রাণাধিকা শিশু কন্যাকে বিদেশে নিতান্ত অপরিচিত পরিবারে পাঠাইতে হইবে ভাবিয়া, চারুর মায়ের বুক ফাটিয়া যাইতেছিল; কিন্তু বিদায় না দিয়া ত উপায় নাই! কাহাকে তাহার সঙ্গে পাঠান যায়, এই কথা লইয়া আন্দোলন চলিতেছিল; বাড়ীর দাস দাসীদের অনেকের কথাই উঠিল, কিন্তু চারু বাঁকিয়া বসিয়াছে, সে কাহারও সঙ্গে যাইতে রাজী নহে। অবশেষে মা যখন বলিলেন, "তোমার বামা পিসী তোমার সঙ্গে যাবে, কেঁদ না, লক্ষ্মী মা আমার!" তখন চারু অনেকটা স্থির হইয়াছিল; সে বুঝিয়াছিল, বামা পিসী সঙ্গে থাকিলে আর তাহার কোন ভয় নাই! যেন সেই বর্ষীয়সী বিধবা সেই দূর দেশের অপরিচিত গৃহ হইতে অতি সাবধানে মায়ের অঞ্চলের নিধি মায়ের কাছে পুনর্ব্বার ফিরাইয়া লইয়া আসিবে। গৃহিণী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া বামা চারুর সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিল, এবং ছাঁদনা-

তলায় দাঁড়াইয়া অঞ্চল দিয়া চারুর অশ্রুপূর্ণ চক্ষু দুটি সস্নেহে মুছাইয়া দিয়া আদর করিয়া বলিল,

"চারু যাবে শ্বশুরবাড়ী সঙ্গে যাবে কে ?
বাড়ীতে আছে বামা পিসী, কোমর বেঁধেছে !

কুনো বিড়ালের বদলে বামা পিসী সঙ্গে গেলে কেমন হয়, চারু ?" তখন সেই বিষাদমাখা বিদায়দৃশ্যের মধ্যে, অশ্রুতে তাহার চোখের পাতা ভিজে থাকিলেও, বর্ষণোন্মুখ মেঘের অন্তরালপথে প্রাতঃসূর্য্যের স্নিগ্ধ কিরণের ন্যায় করুণহাস্যে চারুর ওষ্ঠপ্রান্ত রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল।

সেই সময় হইতেই বামার সঙ্গে চারুর বেশী আত্মীয়তা হইয়াছিল। নিজের কোন কাজ পড়িলেই সে বামাকে ডাকিত। আজ সকালে লক্ষ্মী তাহাকে ডাকিয়া আনিলে বামা স্মিতমুখে বলিল, "কি মা চারু ! আজ সকালে আবার পিসীকে কি দরকার ? শ্বশুরবাড়ী কিছু খবর-টবর নিয়ে যেতে হবে না কি ?" বিবাহের পরদিন ছাঁদলাতলায় দাঁড়াইয়া চারুর জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে বামা পিসী তাহাকে যে কথা কয়টি বলিয়াছিল, চারু আজও তাহা ভোলে নাই ! তাই সে হাসিয়া বলিল, "না পিসী, একবার তুমি কুনো বিড়ালের কাজ করেছ, আর তোমাকে কুকুর বিড়ালের কাজ কর্ত্তে হবে না ! তুমি এই টাকাটা নিয়ে বাজারে যাও, ভাল ঝাড়াপান আর ভাল সন্দেশ-টন্দেশ যা পাও নিয়ে এস গে ; আজ যে ভাইফোঁটা তা বুঝি মনে নেই ?"

ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতে ক্রয় বিক্রয়ের কিছু ধুমধাম আছে বলিয়া আজ খুব সকালেই বাজার বসিয়াছে। বামা পানের দোকানে গিয়া বাছিয়া বাছিয়া এক পণ ঝাড়াপান কিনিল ; কিন্তু এক পণ পান কিনিতে

তাহাকে দেড় পণ কথা খরচ করিতে হইল। পানওয়ালী ভারি 'বেচাল', পানের গোছার উপরে ও নীচে দুই দশটা বড় পান দিয়া ভিতরে 'কুলের পাতার মত' ছোট ছোট পান পুরিয়া দিয়াছে। বামাকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা! বামা পানের গোছা খুলিয়া ফেলিল, এবং বাছিয়া বাছিয়া ছোট পানগুলি বাহির করিয়া ফেরত দিল। সে নিজের হাতে বড় বড় পান তুলিয়া লইয়া, হাসিয়া বলিল, "কেবল বোঁটা গুণে' পয়সা দেব, পয়সা ত দিদি, এত সস্তা নয়!" বারুইপত্নী বলিল, "এমন বাছা-বাছা পান আমি কাউকে দিইনে।" বামা তাহার মুখের কাছে হাত ঘুরাইয়া বলিল, "এক পণ পানের জন্যে এতগুলি পয়সাও আমি কাউকে দিইনে!"—বারুইবৌ চুপ করিয়া গেল। বামা কেমন চিজ্, তাহা গোবিন্দপুরে কাহারও অজ্ঞাত ছিল না।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে গ্রামের ময়রারা 'ছাপার সন্দেশ' প্রস্তুত করিয়াছে। বামা এই ছাপা, গোল্লা ও রসগোল্লা প্রভৃতি কয়েক রকম মিষ্টান্ন লইয়া আসিল। চারু এতক্ষণ বসিয়া বসিয়া সুপারী কাটিতে-ছিল। সুপারী কাটা শেষ হইলে সে পান, সুপারী, ধনের চাল, এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি প্রভৃতি নানাবিধ মশলা দুই এক মুষ্ঠি দিয়া তিন-খানি রেকাবী ও বিবিধ মিষ্টান্ন দিয়া আর তিনখানি রেকাবী সাজাইল; তাহার পর ভাইফোঁটা দিবার জন্য মাঝের ঘরে তিনখানি আসন পাতিল; পরিষ্কার গেলাসে তিন-গেলাস জল রাখিল; রেকাব কয়েক-খানি বিবিধ মিষ্টান্নে পূর্ণ করিয়া চারু লক্ষ্মীকে বলিল, "লক্ষ্মী, দুই দাদাকে আর যোগীনকে ডেকে আন; আর তুইও কাপড় ছেড়ে আয়; কিছু খাস্-টাস্ নি তো? তুইও ফোঁটা দিবি যে!"

লক্ষ্মী তাহার আঁচল লুটাইতে লুটাইতে, কালো কুঞ্চিত কেশের নিবিড় স্তবক দোলাইতে দোলাইতে, উপেন ও যোগীনকে ডাকিতে গেল। সুরেন সকলের ছোট, তাহার বয়স তিন বৎসর মাত্র; চারু তাহাকে একখানি নীলাম্বরী কাপড় পরাইয়া, গায়ে জামা, পায়ে মোজা পরাইয়া দিল, এবং কেরেপের চাদরখানি তাহার গলদেশে বেষ্টন করিয়া, মাথায় নরম পাতলা চুলগুলির মধ্যে একটী সিঁথি কাটিয়া, তাহাকে একখানি আসনের উপর বসাইয়া দিল।

উপেন ও যোগীন কাপড়-চোপড় পরিয়া ভদ্রলোকের মত হইয়া আসনের উপর বসিল। তাহাদের দেখাদেখি সুরেনও কোন প্রকার অস্থিরতা প্রকাশ করিল না, অত্যন্ত গম্ভীরভাবে রেকাবীর উপর স্তূপাকারে সজ্জিত সন্দেশের দিকে লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল!

চারু প্রথমে বামহস্তে অন্য রেকাবী হইতে ধান দূর্ব্বা তুলিয়া তিনবার তাহার দাদার মাথায় রাখিল, এবং বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি দিয়া চন্দন লইয়া দাদার কপালে তিনবার তাহা স্পর্শ করিল; তাহার পর মসলা, পান ও সন্দেশে পূর্ণ দু'খানি রেকাবী দাদার উভয় হস্তে স্থাপন করিয়া নত মস্তকে ভূমিস্পর্শ করিয়া তাহাকে প্রণাম করিল। অনন্তর চারু ছোট ভাই দু'টির কপালে ফোঁটা দিল। যোগীন চারুকে প্রণাম করিল দেখিয়া, সুরেনও দিদির পায়ের কাছে মাথা লুটাইল।

এইবার লক্ষ্মীর ফোঁটা দিবার পালা। দিদির দেখাদেখি লক্ষ্মীও ভাইফোঁটা দিল। চারু হাসিয়া বলিল, "লক্ষ্মী, তুই দাদাকে ফোঁটা দিলি, ভাইফোঁটার মন্তর বলেছিস্?" লক্ষ্মী দিদির দিকে মুখ তুলিয়া তাহার চক্ষুর উপর কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি সংস্থাপিত করিয়া বলিল, "কোন

মন্তর দিদি? তুই ত মন্তর বলিস্‌নি!" চারু হাসিয়া বলিল, "দূর ছুঁড়ী! মন্তর কি চেঁচিয়ে বলে? মন্তর মনে মনে বল্‌তে হয়। সেই যে তোকে বলেছিলাম, 'ভায়ের কপালে'—" লক্ষ্মী হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ মনে হয়েচে,—

'ভায়ের কপালে দিলাম ফোঁটা,
যমের দুয়োরে পড়্‌লো কাঁটা'।"

এমন সময় ঠাকুরদাদা মহাশয়,—গৌরবর্ণ, উন্নতদেহ, দাঁড়ি গোঁফ কামানো, চুলগুলির অধিকাংশই শুভ্র, মুখে শিশুর ন্যায় সরল প্রসন্ন হাস্য,—সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, তাঁহার পৌত্র ও পৌত্রীগণ তাহাদের উৎসব লইয়া মহাব্যস্ত! এই দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার সুকোমল স্নেহার্দ্র হৃদয় আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিল, এবং এই জীবনসন্ধ্যায় বাল্যকালের এমনই দৃশ্যের মধুর স্মৃতিতে উদ্ভাসিত হৈমন্তিক প্রভাত, শৈশবের নিত্যসহচর সদাপ্রফুল্ল ভাইভগিনীগণের সঙ্গসুখ, কথায় কথায় তাহাদের সঙ্গে আড়ি ও ভাব, পিতামাতার স্নেহোচ্ছ্বসিত শান্ত সুন্দর মুখচ্ছবি ও স্নিগ্ধ দৃষ্টি, একে একে সমস্তই তাঁহার মনে পড়িয়া গেল! আজ জীবনের এই প্রান্তসীমায় দাঁড়াইয়াও তাঁহার মনে হইল,—সে যেন সেদিনের কথা! কিন্তু শৈশবের সেই আনন্দময় খেলাঘর এখন ভগ্ন, বিবাদের নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন; সেখানে আর কেহ নাই; সেই সকল চিরপরিচিত মুখ একে একে পৃথিবী হইতে সরিয়া গিয়াছে! কেবল তিনিই একা সকলের স্মৃতি বক্ষে ধরিয়া, সকল চিন্তার ভার মাথায় লইয়া, অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে একটি জীর্ণ সেতু নির্ম্মাণ করিয়া, দাঁড়াইয়া আছেন; এক অভিনব জগতে

বাল্যের সেই সুমধুর খেলার পুনরভিনয় দেখিতেছেন! তাই তিনি চারু ও লক্ষ্মীকে ডাকিয়া বলিলেন, "আজ তোরা দুই বোনে লুকিয়ে লুকিয়ে ভাইফোঁটা দিচ্ছিস্! আমি বুড়োটা কি তোদের কেউ-ই নই? হায় হায়! বুড়ো ব'লে কি একবার জিজ্ঞাসা করতেও নেই? আজ আমি তোদের কি ক'রে বোঝাব যে, আমিও একদিন ঐ উপেন যোগীনের মতই ছেলেমানুষ ছিলাম, আমারও কপালে ফোঁটা দিবার লোক ছিল?"

চারু তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাদামহাশয়ের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "দাদা ম'শায়! তোমার জন্যে অনেক সন্দেশ আলাদা ক'রে তুলে রেখেছি; তুমি সে দিন যে ভাইফোঁটার একটা 'শোলোক' বলেছিলে, সেইটে আবার বল না?"

দাদামহাশয় চারুকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া, তাহার কোমল পুষ্পস্তবকতুল্য প্রফুল্ল গাল দুটি টিপিয়া বলিলেন, "তুই ত পর হ'য়ে গিয়েছিস্ রে চারু! তোকে ত আর বেঁধে রাখবার যো নেই। লক্ষ্মী এখনও পর হয় নি; ও এখনও আমার মাথার পাকা চুল দুই একগাছা তুলে দেয়! লক্ষ্মী দিদিকে এখন একটি রাঙ্গা বরের কোলে তুলে দিয়ে যেতে পাল্লেই বাঁচি! তখন বুড়ো মাথাটা এক মাথা পাকা চুল নিয়ে জ্বালাতন হয়ে মরবে,—কি বলিস্ লক্ষ্মী?"

লক্ষ্মী সুরেনের হাতে একটা রসগোল্লা দিয়া উঠিয়া আসিয়া ঠাকুর-দাদাকে একেবারে জড়াইয়া ধরিল; বলিল, "দাদাম'শায়, আজ আমি তোমার মাথা থেকে একশ'টা পাকা চুল তুলে দেব, শোলোকটা বলে দাও!" দাদামহাশয় বলিলেন, "সে শ্লোক কি তোদের মুখ দিয়ে বেরোবে? শোন তবে, দাদাকে ভাত দিবার সময় বল্‌তে হয়,—

'ভ্রাতস্তবানুজাতাহং ভুঙ্ক্ষ ভক্তমিদং শুভম্।
প্রীতয়ে যমরাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ॥'

তা তোরা ত ভাইফোঁটা দিলি, এখন নিজের হাতে রেঁধে খাওয়ানোর কি হবে?" চারু বলিল, "আমরা কি রাঁধ্‌তে একেবারেই জানিনে দাদাম'শায়? দাও না তুমি বাজার থেকে তরী-তরকারী আনিয়ে, রাঁধ্‌তে পারি কি না দেখ!"

"আচ্ছা দেখি আজ, কেমন রাঁধ্‌তে শিখেছিস্—যদি জিনিসপত্র-গুলো নষ্ট করিস্ ত সেই শালার কাছ থেকে সব জিনিসের দাম আদায় কর্‌বো!"

চারু কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিল না, বলিল, "কার কাছ থেকে আদায় কর্‌বে বল্লে, দাদাম'শায়?"

দাদামহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "আরে তোর বর! আর কোন শালার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ আছে?"

চারু এবার অপ্রতিভভাবে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "যাও দাদাম'শায়, তুমি ভারি দুষ্টু!"—সে হঠাৎ পৃষ্ঠভঙ্গ দিল।

দাদামহাশয় নাতিনী-সম্ভাষণ পরিত্যাগ করিয়া বাজারে চলিলেন।

আজ বাজারে নানাপ্রকার জিনিসের আমদানী হইয়াছে। দাদা-মহাশয় বাজারের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভাল মাছ, পটোল, বেগুন, লাল আলু প্রভৃতি তরকারী কিনিলেন। বাজারে সকল তরকারী কিনিতেও হইল না, বুনো-বাড়ী হইতে লাউ ও সুয্যিকুমড়ো আনাইয়া লওয়া হইল। পালঙ্ শাক, শিম ঘরের বাগানেই যথেষ্ট ছিল। নানারকম তরকারী, ডাল, মাছ, মুড়িঘণ্ট, তিলপিটুলি-বেগুনভাজা, লালআলুর

গুড়-অম্বল, নলেন গুড়ের পায়েস,—দেখিতে দেখিতে একটা ভোজের আয়োজন হইল! মুড়িঘণ্ট ও পায়েস চারুর মা রাঁধিলেন; মাছ, কলায়ের ডাল ও দুই তিনখানি তরকারী চারু নিজে রাঁধিল; বিধবা পিসীমা নিরামিষ তরকারী, সুক্তনি, গুড়-অম্বলে সিদ্ধহস্ত—সেগুলি তিনিই রাঁধিয়া দিলেন।

দাদামহাশয় নাতী নাতিনীদের সঙ্গে লইয়া আহারে বসিলেন। তিনি কলায়ের ডাল খাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "চারু, ডালটা কে রেঁধেছে রে? অনেক দিন এমন চমৎকার ডাল খাইনি!"—চারু আড়াল হইতে মুখ বাহির করিয়া দাদামহাশয়ের পাতের উপর হাস্যোজ্জ্বল কৌতুক-পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "রান্না ভাল হয়নি ব'লে বুঝি ঠাট্টা হচ্ছে! ঠাকুমার মত রান্না শিখ্‌তে পারিনি ব'লে এত ঠাট্টা কেন দাদামশায়? ঠাকুমার যদি একবার দেখা পাই ত রান্নাটা তাঁর কাছ থেকে ভাল করে শিখে নিই।"

দাদামহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "তোর ঠাকুমা ভালই রাঁধ্‌তো বটে, তা তুইও খাসা রাঁধ্‌তে শিখেছিস্;—তোর রান্না খেয়ে তোর শ্বশুর ভারি খুসী হবে।"

এই প্রশংসায় চারুর মুখ অরুণাভ হইয়া উঠিল। সে আর এক বাটী ডাল আনিয়া দাদামহাশয়ের পাতে ঢালিয়া দিল। বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন, "আঃ সর্ব্বনাশ! কল্লি কি চারু? বুড়ো বয়সে খাওয়া-দাওয়ার উপর একটু লোভ হয় বটে, তা এতখানি কলায়ের ডাল খাইয়ে কি বুড়ো দাদাকে মেরে ফেল্‌বি?"

সকলে তৃপ্তিসহকারে ভোজন করিলেন। চারু পান ছেঁচিয়া একখানি রেকাবীতে করিয়া তাহা দাদামহাশয়ের কাছে আনিয়া দিল। তিনি

আহারান্তে শয়ন করিয়া গড়গড়ার নলে ওষ্ঠসংযোগ করিলেন; লক্ষ্মী তাঁহার মাথার কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া পাকাচুল তুলিতে লাগিল। এক দুই করিয়া সে চুলগুলি গণিতে লাগিল। ক্রমে দাদামহাশয়ের নয়নপল্লবে নিদ্রার আবির্ভাব হইল; তিনি বলিলেন, "কত চুল তুল্‌বি ভাই? ও যে ও ফুরোবে না! যা, তুই খেলা কর্‌গে।"

ছুটী পাইয়া লক্ষ্মী সুরেনের সঙ্গে খেলা আরম্ভ করিয়া দিল।

সন্ধ্যাকালে দাদামহাশয় কাপড়ের দোকান হইতে বাছিয়া বাছিয়া দুইখানি ঢাকাই শাড়ী আনিয়া দুই ভগিনীকে দান করিলেন; বলিলেন, "তোদের ভাই বোনের মধ্যে চিরদিন যেন এমনই ভাব থাকে; তোদের হাসিমুখ্ দেখ্‌তে দেখ্‌তে যেন এ বুড়োর বাকি দিন ক'টা সুখে কেটে যায়।"

অগ্রহায়ণ মাস পড়িতে পড়িতে চারু শ্বশুরবাড়ী গেল; কিন্তু পিতৃগৃহের এই বৈচিত্র্যময় আনন্দস্মৃতি তাহার কোমল হৃদয়ে অনেকদিন জাগরিত ছিল।

কার্ত্তিকের লড়াই

কার্ত্তিকের লড়াই

কার্ত্তিক পূজার পরদিন অপরাহ্নে গ্রামের কার্ত্তিকগুলিকে পথে বাহির করিয়া যে উৎসব হয়, তাহারই নাম আমাদের পল্লী অঞ্চলে 'কার্ত্তিকের লড়াই!' দেবসেনাপতির যুদ্ধোদ্যমের কোনও লক্ষণ ইহাতে প্রকাশিত না হইলেও, ইহা যে 'কার্ত্তিকের লড়াই' নামে কি জন্য খ্যাত, তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন; তবে নামটি বহু পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্থানে স্থানে ইহাকে 'কার্ত্তিকের আড়ং' বলে। গোবিন্দপুর গ্রামে কার্ত্তিকের লড়াই একটি বিশেষ উদ্দীপনাপূর্ণ উৎসব।

কার্ত্তিকপূজার পাঁচ সাত দিন পূর্ব্ব হইতে গোবিন্দপুরের কুমারেরা মাটীর কার্ত্তিক গড়িতে আরম্ভ করে। গ্রামে সত্তর পঁচাত্তরখানি কার্ত্তিকের পূজা হইয়া থাকে; কোন কোন বাড়ীতে জোড়া-কার্ত্তিকেরও পূজা হয়; রমণীগণের অনেকে 'মানসা' করিয়া কার্ত্তিকপূজা করেন। এই সকল কার্ত্তিকের অধিকাংশই কুমারবাড়ীতে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। সাধারণ কার্ত্তিক একখানা দুই তিনটাকা মূল্যেই পাওয়া যায়। যাঁহাদের বাড়ীতে 'অসাধারণ' কার্ত্তিকের পূজা হয়, তাঁহারা বাড়ীতে কুমার আনাইয়া কার্ত্তিক নির্ম্মাণ করান। সাধারণ কার্ত্তিকগুলি একই ছাঁচে গঠিত,—হয় ত কোন একখানি একটু বৃহদায়তন; কিন্তু পরাণ চৌধুরী ও পীতাম্বর হালদারের বাড়ীর কার্ত্তিক যেমন অসাধারণ, তাঁহাদের কার্ত্তিকের লড়াইয়ের আড়ম্বরও তদনুরূপ অতিরিক্ত; এই দুই ব্যক্তির কার্ত্তিকপূজাতেই গ্রাম উৎসব-মুখর হইয়া উঠে।

কার্ত্তিক মাস চিরকাল প্রায়ই ত্রিশদিনে শেষ হয়; এ মাসের হ্রাসবৃদ্ধি কদাচিৎ হইয়া থাকে। সংক্রান্তির দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রায় সকল উৎসবগৃহেই ঢাক বাজিয়া উঠিল।

কুমারের বাড়ী হইতে সকলেরই চণ্ডীমণ্ডপে কার্ত্তিকের শুভাগমন হইয়াছে। অনুচ্চ বেদীর সম্মুখে ঘটস্থাপন করিয়া, বেদীতে কতকগুলি ধান ছড়াইয়া, তাহার উপর কার্ত্তিকের অধিষ্ঠানের স্থান হইয়াছে। কার্ত্তিক ঠাকুর ময়ূরের উপর গম্ভীরভাবে বসিয়া আছেন; মাথায় কাল কোঁকড়ান চুল,—কালি দিয়া পাট রঙ্গ করিয়া এই চুল প্রস্তুত হইয়াছে; কোনও কার্ত্তিকের গোঁফ কালি দিয়া অঙ্কিত; কোনও কার্ত্তিকের ওষ্ঠে গোঁফের রেখামাত্র দেখা দেয় নাই,—অত্যন্ত কিশোর! সকল কার্ত্তিকেরই এক হাতে ধনুক, অন্য হাতে তীর। কেহ তীরের গায়ে পাখীর পালক ও ডগায় ইস্পাতের ফলা লাগাইয়া কার্ত্তিকের বীরত্বের কিঞ্চিৎ মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে। সকলেই কঞ্চি দিয়া তীর ধনুক প্রস্তুত করিয়া কার্ত্তিকের হাতে দিয়াছে;—অস্ত্র-আইন-শাসিত দেশে দেবসেনাপতির উপযুক্ত হাতীয়ার! কার্ত্তিকের পায়ে মাটির জুতা, কাল রঙ্গের উপর তার্পিণ মাখাইয়া দেওয়াতে তাহা ঠিক বার্ণিশ জুতার মত চিক্-চিক্ করিতেছে। কার্ত্তিকের পরিধানে পট্টবস্ত্র; কেহ বা লাল কল্কাপেড়ে শান্তিপুরে ধুতি পরাইয়া দিয়াছে; কেহ বা তাহার কার্ত্তিকটি নিতান্ত ছেলেমানুষ দেখিয়া, ঢাকাই বা নীলাম্বরী কাপড়েই তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছে! কার্ত্তিকের করতল হিঙ্গুলরঞ্জিত, ঘন হরিতালের প্রলেপে সর্ব্বশরীর পীত; দেহের পীতাভা পাতলা কাপড়ের ভিতর দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে। পরিধেয় বস্ত্রের কোঁচা সম্মুখভাগে আবদ্ধ; কোন

কার্ত্তিকের কোঁচা ময়ূরের পিঠের উপর দিয়া পদপ্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে; কোঁচান চাদর স্কন্ধে ঝুলিতেছে; বাহুতে ডাকের গহনা, মাথায় তাজ; কোন কোন কার্ত্তিকের সজ্জা দেখিয়া নববিবাহিত গ্রাম্য যুবকের শ্বশুরবাড়ী-যাত্রার কথা মনে পড়ে! এমন বীর দেবতার বাহনেরও বীরত্ব প্রদর্শনে কুণ্ঠা নাই! কার্ত্তিককে পিঠে লইয়া বাহন ময়ূর বেচারা কিছুমাত্র কাতরতা প্রকাশ করিতেছে না! সে তাহার সুদীর্ঘ চিত্রিত কণ্ঠ বক্র করিয়া সুতীক্ষ্ণ ওষ্ঠে একটা সর্পের গলদেশ, ও দক্ষিণপদে তাহার লেজ ধরিয়া আকর্ষণের ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া আছে; আহত সর্পের মুখ হইতে দ্বিধা-ভিন্ন সূক্ষ্ম জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। প্রসারিত ময়ূরপুচ্ছে কুমারেরা কৃত্রিম 'চাঁদ' আঁকিয়া দিয়াছে; কোন কোন কার্ত্তিকের ময়ূর গোটাকতক আসল ময়ূরপুচ্ছ পশ্চাতে বাঁধিয়া ধন্য হইয়াছে।

চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে একটা ছোট সামিয়ানা টাঙ্গান হইয়াছে। মধ্যে কোনও অবলম্বন না থাকায় তাহা ঝুলিয়া পড়িয়াছিল বলিয়া একটা বাঁশের 'ঠেকো' দিয়া তাহাকে উচু করিয়া তোলা হইয়াছে। সামিয়ানার সঙ্গে দড়িতে গোটা দুই তিন কাচের লণ্ঠন ঝুলিতেছে; লণ্ঠনের ভিতর এক পয়সা দামের ছোট ছোট কেরোসিনের টিমি, তাহা হইতে আলো অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ধূম নির্গত হইতেছে! ধূমে লণ্ঠনের কাচগুলি কালিমাখা হইয়াছে। কার্ত্তিকের দুই পাশে লম্বা লম্বা দুটি কাঠের দীপগাছায় মাটীর প্রদীপ জ্বলিতেছে; সম্মুখে পূজার উপকরণ সজ্জিত;—এক পাশে গোটাকতক 'বরে'হাঁড়ি—তাহার মধ্যে আতপ চাউল; বারকোষে ডাল, ডালের উপর কাঁচকলা আলু; কলার পাতায় খানিক সৈন্ধব লবণ।

পল্লীরমণীগণ কার্ত্তিকের ব্রত পালনের জন্য আজ উপবাস করিয়া আছেন। অপরাহ্নকালে পুরোহিত ঠাকুর যজমানবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার বহুপুরাতন, বিবর্ণ, তালপত্রনির্ম্মিত লম্বা পুঁথিখানি খুলিয়া উপবাসখিন্না সংযতহৃদয়া রমণীগণকে কার্ত্তিকের জন্মকথা শুনাইতেছেন। দক্ষিণা অতি সামান্য,—একটি পয়সা, বা দুই একটি সুপারী; পুরোহিত ঠাকুর তাহাতেই সন্তুষ্ট!

পরিবার বৃহৎ ও সংসার অসচ্ছল হইলেও গ্রাম্য-পুরোহিত জনার্দ্দন সার্ব্বভৌম মহাশয় নিয়ত যজমানদিগের হিতকামনা করেন। যজমানের অবস্থা উন্নত হইলে তিনি নিজের 'প্রাপ্য গণ্ডা' তাহার কাছে আদায় করিয়া লন বটে, কিন্তু যজমানের দুঃসময়ে পারিশ্রমিকের কোন আশা না রাখিয়া তাহার গৃহের ক্রিয়া কর্ম্ম পরম সহিষ্ণুচিত্তে সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

সার্ব্বভৌম মহাশয় লোকটি খর্ব্বকায়। মাথায় খাট চুলের মধ্যে একটি হ্রস্ব টিকি, দিবসের অধিকাংশ সময়েই তাহাতে একটি না একটি ছোট ফুল ঝুলিতে দেখা যায়! তাঁহার দাড়ি গোঁফ কামানো; ললাটে একটি রক্তচন্দনের ফোঁটা। গ্রীষ্মকালে তিনি 'রাধাকৃষ্ণ' নামাঙ্কিত নামাবলীতে দেহ আবৃত করিয়া রাখেন; কিন্তু শীত পড়িলেই তাঁহার পৈতৃক লাল বনাতখানি বাহির করেন। দীর্ঘকালের ব্যবহারেও তাহা বিবর্ণ হয় নাই; পাছে তাহাতে তেল কি কোন প্রকার ময়লা লাগে, এই ভয়ে সার্ব্বভৌম মহাশয় প্রথমে তাঁহার মস্তক ও দেহ সাদা উড়ানীতে ঢাকিয়া তাহার উপর বনাতখানি ব্যবহার করেন। তাঁহার বামহস্তে একটি শম্বুক থাকে; সেই শম্বুকের গর্ত্তে

তিনি তাঁহার স্বনির্ম্মিত নস্য রাখেন। ছেলেরা 'হাডু ডুডু' বা 'দাণ্ডাগুলি' খেলিতে খেলিতে যেমন দেখিতে পায়—সার্ব্বভৌম মহাশয় পথ দিয়া যাইতেছেন, অমনই তাহারা খেলা ছাড়িয়া দৌড়াইয়া গিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়, এবং হাত পাতিয়া বলে, "দাদাঠাকুর, একটু নস্যি!"—দাদাঠাকুর শামুকটির ঢাকনী খুলিয়া প্রসন্নহাস্যে সকলের হাতে এক এক বিন্দু নস্য ঢালিয়া দেন;—ছেলেরা মহানন্দে তাহা নাসারন্ধ্রে পুরিয়া সজোরে টানিতে থাকে, এবং হাঁচিয়া কাশিয়া নাচিয়া তাহাদের খেলার আসর মাতাইয়া তোলে!

আজ পবিত্র ব্রতকথা শুনাইতে হইবে বলিয়া সার্ব্বভৌম মহাশয় পট্টবস্ত্রখানি পরিধান করিয়া যজমানবাড়ী আসিয়াছেন। পায়ে একজোড়া তালতলার চটি,—তিন বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার এক সমৃদ্ধ যজমান কলিকাতা হইতে তাহা আনিয়া দিয়াছিলেন;—পথের ধূলায় বহু তালিখচিত অতি প্রাচীন চটি জোড়াটার জীর্ণ দেহ ধূসরিত। ধূলায় পুরোহিত ঠাকুরের জানু পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন। যজমানবাড়ীতে পদার্পণ করিয়া প্রথমে তিনি এক ঘটি জলে পদপ্রক্ষালন করিলেন; অনন্তর সিক্তপদে একখানি কুশাসনে বসিয়া পুঁথির পাতা খুলিয়া সুর করিয়া সুর সেনাপতির বৈচিত্র্যপূর্ণ জন্মকথা পাঠ করিতে লাগিলেন।

রমণীগণ সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া, পুরোহিত ঠাকুরের সম্মুখে নতমুখে বসিয়া একাগ্রচিত্তে সেই মধুর শ্লোক শুনিতেছেন; সকলেই পুত্তলিকাবৎ নিশ্চল। কেবল দুই একজন বর্ষীয়সী বিধবা হরিনামের ঝোলার মধ্যে চারিটি অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া কাঠের মোটা মালাছড়াটি ঘুরাইতেছেন, এবং মালা একবার ফিরান হইলেই ঝোলাটি ধীরে ধীরে

ললাটে স্পর্শ করিয়া পুনর্ব্বার নূতন করিয়া জপ আরম্ভ করিতেছেন —পুরোহিত অনর্গল পুঁথি পড়িয়া যাইতেছেন।

পাঠ সাঙ্গ করিয়া পুরুতঠাকুর অন্য এক যজমানের গৃহে চলিলেন। আজ তাঁহার বিস্তর কায; সকল যজমানের বাড়ীতে ব্রতকথা শুনান শেষ হইলে তিনি পূজা করিতে বাহির হইবেন। তাঁহার অনেক যজমানের বাড়ীতেই কার্ত্তিকপূজা হয়।

পূজাবাড়ীতে কার্ত্তিকের বেদীর অদূরে প্রতিবেশিনী ব্রতধারিণী রমণী-গণ নূতন হাঁড়ি আনিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এই হাঁড়ির নামই "বরের হাঁড়ি"। ব্রতধারিণীরা পরদিন এই হাঁড়িতে আতপান্ন পাক করিয়া উপবাসের পারণ করিবেন।

পরাণ চৌধুরীর বাড়ীতে কার্ত্তিক পূজার ধূম কিছু অতিরিক্ত। পরাণ চৌধুরী গ্রামের জমিদার। তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন; কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পত্নীবিয়োগ হইয়াছে। কন্যাদায়গ্রস্ত স্বশ্রেণীস্থ [illegible]লের ও তাঁহার হিতৈষিবর্গের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধেও তিনি পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহে সম্মত হন নাই! যুবতী কন্যাই তাঁহার একমাত্র অভিভাবিকা। কন্যার পুত্রাদি না হওয়াতে চৌধুরী মহাশয় মহাসমারোহে কার্ত্তিকপূজা করিয়া আসিতেছেন। যদিও এ পর্য্যন্ত ইহাতে কোনও ফললাভ হয় নাই, তথাপি প্রতি-বৎসরই চৌধুরী-ভবনে ষড়ানন নির্ব্বিঘ্নে পূজা পাইতেছেন; সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দপুরের ভদ্র অধিবাসীগণ, ইস্কুলের মাষ্টার, পণ্ডিত, ডাকঘরের বৃদ্ধ ডাকমুন্সী ও তাঁহার ছোকরা কেরাণী, সেরেস্তাদার, পেস্কার, নাজীর, মুহুরী প্রভৃতি আমলাবর্গ, এমন কি, পোয়াদারা পর্য্যন্ত কার্ত্তিক পূজায়

রাত্রে তাঁহার বাড়ীতে ষোড়শোপচারে পূজা পাইয়া থাকেন। গ্রাম্য থানার দারোগা গমেজউদ্দীন মিঞা হিন্দুর বাড়ীতে আহার করেন না বলিয়া তাঁহার 'দৌলত খানায়' প্রতি বৎসর কার্ত্তিক পূজার পরদিন একটা খাসী, পাঁচ সের ময়দা, তিন সের ঘৃত, আধ সের লবণ ও আরও নানাবিধ সামগ্রীপূর্ণ সিধা প্রেরিত হয়। সরকার বাহাদুরের চাকর হইলেও গমেজউদ্দীন মিঞা নিমকের সম্মান রক্ষা করিতে কুণ্ঠিত নহেন; সুতরাং অপরাহ্নে যখন প্রতিমা বাহির হয়, তখন তিনি তাঁহার জমকালো পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া শ্রেণীবদ্ধ কনষ্টেবলদলকে পশ্চাতে লইয়া পরাণবাবুর কার্ত্তিকের অগ্রগামী হইয়া থাকেন, এবং যদি অন্য লোকের কার্ত্তিক দৈবাৎ তাঁহার সম্মুখে পড়ে, তাহা হইলে তিনি মহাগর্জ্জনে পরাণ বাবুর কার্ত্তিকের পথ পরিষ্কার করিয়া সরকারী কর্ত্তব্য পালন করেন!

রাত্রি নয়টার সময় গ্রামস্থ নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা চৌধুরী মহাশয়ের বাহির্বাটীতে সমাগত হইলেন। অধিকাংশ পল্লীযুবকের মস্তক 'ফল্টার'-বেষ্টিত, যেন বর্ণপরিচয়ের এক একটি 'ঙ' মাথায় পাগড়ী দিয়া চৌধুরী মহাশয়ের বৈঠকখানায় উপবিষ্ট! কাহারও গায়ে সার্জ্জের চাদর, বা বালাপোশ; পায়ে মোজা; কাহারও হাতে বাঁশের, কাহারও হাতে কাঠের লাঠী। এ সময়ে পল্লীঅঞ্চলে প্রায়ই ক্ষ্যাপা কুকুর দেখা যায় তাই লাঠী ভিন্ন কেহই পথে চলিতে সাহস করে না। অধিকাংশ ভদ্রলোকই পুরাতন চটি বা তালি-দেওয়া, গোড়ালি-বর্জ্জিত পাদুকায় পদ-গৌরব রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন; নিমন্ত্রণের লোভে নূতন জুতা হারাইতে ইঁহাদের কাহারও আগ্রহ নাই।

চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে সামিয়ানার নীচে গোটাকত 'ঝাড়' ও 'হাঁড়ি' ঝুলিতেছে; তাহা হইতে বাতির স্নিগ্ধ আলোক বিকীর্ণ হইতেছে। আঙিনায় একটা বড় সতরঞ্চি প্রসারিত, চারি পাশে কয়েকখানি মাদুর বিস্তীর্ণ। আজ এখানে কার্ত্তিকপূজা উপলক্ষে 'ঢপ' হইবে; একজন বয়স্কা ও একটি কিশোরী গায়িকা 'ঢপ' গায়িবে।—আহারাদি শেষ হইলেই পালা আরম্ভ হইবে।

কিন্তু আহারাদির কিছু বিলম্ব আছে, তাই নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা বাহিরের আটচালায় বসিয়া গল্পগুজব করিতে লাগিলেন। দেওয়ালে কতকগুলি 'দেওয়ালগিরিতে' বাতি জ্বলিতেছে। উপরে চাঁদোয়া; চাঁদোয়া ভেদ করিয়া যে তিনগাছি দড়ি ঝুলিতেছে, তাহাতে তিনটি 'বেল' দোদুল্যমান,—দুইদিকে দুইটি সবুজ, মধ্যে একটি লাল বেল। নীচে সতরঞ্চির উপর চাদর বিছানো; শুভ্র ফরাসের উপর পিতলের বৈঠকে দুই তিনটি রূপা-বাঁধানো হুঁকা, চারিধারে অনেকগুলি স্থূলোদর 'গেদ্দা' বালিশ,—শুভ্র বালিশগুলি অতি বৃহৎ চালকুমড়ার মত পড়িয়া আছে! পরাণ চৌধুরী একটি তাকিয়ায় ঠেস দিয়া অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে রৌপ্যনির্ম্মিত কারুকার্য্যখচিত ফরসীর দীর্ঘ নল মুখে পুরিয়া তাম্রকূটসুধা পান করিতেছেন; অদূরী তামাকের সুবাসিত কুণ্ডলীকৃত ধূম ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। চৌধুরী মহাশয়ের পাশেই একখানি বৃহৎ রৌপ্যময় রেকাবীতে একরাশি পান, একটা পানের উপর খানিক চূণ। চৌধুরী মহাশয়কে বেষ্টন করিয়া অনেকগুলি গ্রাম্য ভদ্রলোক উপবিষ্ট। ইহাদের অনেকেই বেকার, কেহ কেহ উমেদার। চৌধুরী মহাশয়ের মনস্তুষ্টি সাধনই এখন ইহাদের প্রধান লক্ষ্য। কেহ পান চিবাইতেছে, কেহ বাঁধাহুঁকায় তামাক

টানিতে টানিতে একটা ফৌজদারী মকদ্দমায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী জমীদার ললিত চাটুয্যের লাঞ্ছনার গল্প বলিতেছে; সেই গল্প চৌধুরী মহাশয়ের কর্ণে যেন সুধাসিঞ্চন করিতেছে! গল্প করিতে করিতে তাম্রকূটপায়ী ভদ্রলোকটী বলিল, "কল্‌কেটাতে কিচ্ছু নেই বোধ হচ্ছে।" অমনই পরাণ বাবু তাকিয়া হইতে মস্তকটি ঈষৎ উর্দ্ধে তুলিয়া হুঙ্কার করিলেন, "নীলে, তামাক দিয়ে যা! পাজী বেটারা সব থাকিস্ কোথা?"

নীলে ওরফে নীলমণি খানসামা তখন প্রাঙ্গনের পাশে, যেখানে একটা কাঠের গুঁড়ি জ্বলিতেছিল, সেইখানে বাড়ীর অন্যান্য ভৃত্যবর্গের সঙ্গে হাস্যামোদে আড্ডা জম্‌কাইয়া তুলিয়াছিল। তাহারও তখন ভরা মজলিস; পরদিন কে কিরূপ বাহার দিয়া কার্ত্তিকের লড়াই দেখিতে বাহির হইবে, সেই সময় তাহারই আলোচনা চলিতেছিল; কিন্তু নীলুর শ্রবণেন্দ্রিয় বিলক্ষণ সজাগ ছিল। কর্ত্তা মহাশয়ের হুঙ্কার তাহার শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিবামাত্র সে সভা ত্যাগ করিল, এবং "দণ্ডে দণ্ডে তামাক! একটু যে নিশ্চিন্তি হয়ে বস্‌বো, তার যো নেই"—এই মন্তব্য উচ্চারণ করিতে করিতে তামাক সাজিতে গেল; সে গুঁড়ির আগুনে কলিকা পূর্ণ করিয়া, থামের অন্তরালে দাঁড়াইয়া কলিকাতে দুই একটা দম দিয়া তাহা মোসাহেব বাবুর হুঁকার উপর বসাইয়া দিল। চৌধুরী মহাশয়ের ফর্‌সীশীর্ষস্থ, জিরিঙ্গি-শোভিত রূপার সরপোশঢাকা প্রকাণ্ড কলিকাতে তাওয়া-চড়ান ছিল; আড়চক্ষে সে চাহিয়া দেখিল—তখনও তাওয়াতে গুলের আগুন গন্‌-গন্‌ করিতেছে, সুতরাং আপাততঃ কর্ত্তার কলিকা-পরিবর্ত্তন করিবার

আবশ্যক নাই বুঝিয়া, সে আবার নিজের সভায় আসিয়া চ্যাটাইয়ের উপর বসিল।

যথাকালে চণ্ডীমণ্ডপে আহারের স্থান হইল। সারি সারি কুশাসন, কলাপাতা ও মাটীর গেলাস পড়িয়া গেল। আহার করিতে যাইবার পূর্ব্বে সকলে একবার ঠাকুর দালানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রতিমা দেখিয়া লইল। চৌধুরী বাবুদের বাড়ীতে কার্ত্তিক চিরদিনই রাজবেশে পূজা গ্রহণ করেন! গোবিন্দপুরে আর কোনও বাড়ীতেই 'রাজকার্ত্তিক' দেখা যায় না; সুতরাং এই কার্ত্তিকের সম্মান অন্য সকল কার্ত্তিকের অপেক্ষা অধিক। রাজকার্ত্তিকের মস্তকে সুবর্ণপ্রভ কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, এক হস্তে সুচিত্রিত শরাসন, অন্য হস্তে শর; পরিধানে রক্তবর্ণ সাটীনের ইজার চাপকান, তাহার উপর সোণালী রঙ্গের চুম্‌কি বসান; পায়ে জরীর জুতা; একটি সুরঞ্জিত চিত্রভূষিত মৃৎসিংহাসনে রাজকার্ত্তিক উপবিষ্ট। ময়ূরযুগলের পৃষ্ঠদেশে এই সুগোল সিংহাসন সংস্থাপিত; ময়ূরদ্বয় মৃত্তিকা-নির্ম্মিত, কিন্তু তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে ময়ূরপক্ষ সুকৌশলে সন্নিবিষ্ট, তাহাদের কণ্ঠদেশে জীবিত ময়ূরের ন্যায় ময়ূরকণ্ঠী পালক,—পশ্চাতে দীর্ঘ পুচ্ছ; কতকগুলি ময়ূরপুচ্ছ সরু তার দ্বারা একত্রবদ্ধ, পুচ্ছগুলি ময়ূরযুগলের পশ্চাতে স্বাভাবিক ভাবে বিন্যস্ত; শতচন্দ্রখচিত উজ্জ্বল প্রভাময় সেই প্রসারিত পুচ্ছ কার্ত্তিকের পৃষ্ঠদেশে সুদৃশ্য 'চালি'র মত শোভা পাইতেছে;—যেন ময়ূর দুটি আনন্দে ও গর্ব্বে স্ফীত হইয়া পেখম ধরিয়াছে! কার্ত্তিকের ময়ূরাসনের সম্মুখে চারিটি সোপান; নিম্নতম সোপানের উভয় প্রান্তে দুই জন মৃণ্ময় বরকন্দাজ,—স্কন্ধে সঙ্গীন-কণ্টকিত বন্দুক, বামপার্শ্বে কোষবদ্ধ তরবারি, মস্তকে শুভ্র-পালক-খচিত জরির

টুপি, গণ্ডদ্বয়ে গালপাট্টা, ললাটে লোহিত ত্রিবীর-তিলক; তাহারা উভয়ে অধর দংশনপূর্ব্বক যেন কোনও অনাগত অনধিকার প্রবেশাকাঙ্ক্ষীর উদ্দেশ্যে ভ্রূকুটিকুটিল তীব্র দৃষ্টি বর্ষণ করিতেছে! ইহার উপরের সোপানের উভয় প্রান্তে দুইটি অশ্বারোহী সৈনিক; অশ্বারোহিদ্বয় নীলবর্ণ অশ্বে আরূঢ়, অশ্বদ্বয় সম্মুখের পদদ্বয় শূন্যে তুলিয়া সগর্ব্বে ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। অশ্বারোহিদ্বয়ের পরিচ্ছদ ঘোর লোহিতবর্ণ, কটিদেশ কোমরবন্দ; 'রেকাবদলে' ভর দিয়া বীরদ্বয় জিনের উপর বসিয়া আছে,—বাম হস্তে বল্লা, দক্ষিণ হস্তে সুদীর্ঘ বর্শা, তাহার অগ্রভাগে সোণালি জগ্‌জগা ঝক্‌মক্ করিতেছে; বর্শা উদ্যত করিয়া বীরদ্বয় যেন কোন শত্রুর আগমনপ্রতীক্ষা করিতেছে! ইহার ঊর্দ্ধস্থ সোপানের উভয় পার্শ্বে দুইটি রমণীমূর্ত্তি,—পরিধানে নীলাম্বরী শাড়ী, হাতে কালি দিয়া আঁকা চুড়ী, টানা টানা ভ্রূ,—ভ্রূযুগলের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি কালো টিপ। রমণীদ্বয়ের বর্ণ হরিদ্রাভ, কেবল করতল ও ওষ্ঠাধর হিঙ্গুলের রঙ্গে ডগ্‌ডগ্ করিতেছে; উভয়ের হস্তে এক একগাছি বিবিধবর্ণরঞ্জিত মোমের ফুলের মালা; তাহাদের লজ্জানম্র আরক্ত নেত্রের দৃষ্টি নাসা-বিলম্বিত ঝুটামতির উজ্জ্বল নোলকে সন্নিবদ্ধ। সর্ব্বোচ্চ সোপানে দুইটি অপ্সরী,—দেবশিশুর ওষ্ঠের মত সুন্দর দুইখানি প্রফুল্ল ওষ্ঠ; অতি মৃদুস্পর্শে বীণার তার যেমন কাঁপিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠে, দেখিয়া বোধ হয়, তেমনই ভাবের মৃদুস্পর্শে এই দেবলোক-বাসিনীদের ওষ্ঠও হাস্যবিকশিত হইয়া উঠিবে! সুগোল সুগঠিত গোলাপী গণ্ডস্থলে যেন সরলতা ও প্রফুল্লতা ক্রীড়া করিতেছে; বেগুনে রঙ্গের বস্ত্রের ভিতর দিয়া অঙ্গের উজ্জ্বল আভা ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

মস্তকে কৃত্রিম লতাপুষ্পনির্ম্মিত সুদৃশ্য মুকুট; দক্ষিণ হস্তে বেণু ও বামহস্তে লোহিত পতাকা!

ঠাকুর দেখিয়া খুসী হইয়া সকলে আহারে বসিল। আহার শেষে ঢপ আরম্ভ হইতে রাত্রি প্রায় বারোটা বাজিয়া গেল।

কার্ত্তিকের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনে ঢপ আরম্ভ হইল। বৃদ্ধেরা মস্তকে চাদর জড়াইয়া আসরে আসিয়া বসিল। যুবকেরা একটু দূরে বসিয়া সেকালের ও একালের ঢপের সমালোচনা করিতে লাগিল। ক্রমে ঢপ, কবি, কীর্ত্তন, পাঁচালী—সকল রকম গানের আলোচনা আরম্ভ হইল; শেষে তর্ককোলাহল সমুচ্চ হইয়া উঠিল। মেয়েরা চিকের আড়ালে বসিয়া কেহ ঢুলিতে লাগিল, কাহারও বা হাঁই উঠিতে লাগিল, কেহ বা ক্রুদ্ধ হইয়া ঢপওয়ালীর উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করিতে লাগিল! ছোট ছোট ছেলেদের এ সকল বিষয়ে কিছুমাত্র লক্ষ্য নাই। তাহারা সতরঞ্চির প্রান্তভাগে বসিয়া বিষম জটলা বাধাইয়া দিয়াছে; হাসি গল্পও চলিতেছে; আবার কেহ কাহাকেও কিল মারিতেছে, কেহ বা কিল খাইয়া প্রতিফল-দানের জন্য চিমটি কাটিয়া তিনহাত দূরে সরিয়া বসিতেছে!

এমন সময় গান-আরম্ভের সূচনাস্বরূপ বাদ্যযন্ত্রে দুই একটি মৃদু আঘাত হইল; ক্ষণকালের মধ্যেই আসরে কোলাহল মন্দীভূত হইল। যাহারা চিকের অন্তরালে বসিয়া ঢুলিতেছিল, তাহারা 'আলস্য ছাড়িয়া' নড়িয়া-চড়িয়া সোজা হইয়া বসিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া গৌরচন্দ্রিকা করিয়া প্রৌঢ়া ঢপওয়ালী ষড়াননের জন্মগাথা গায়িতে আরম্ভ করিল।

বৃদ্ধেরা তামাক টানিতে টানিতে ভক্তিগদগদচিত্তে সেই গান শুনিতে লাগিল। যুবকগণের তর্কস্রোতে অকস্মাৎ ভাঁটা পড়িল; বালক-

দিগের দ্বন্দ্বযুদ্ধ থামিয়া গেল! ভক্তিমতী গায়িকা কখন কথায়, কখন দ্রুত ছড়ায়, কখন তাল-লয়-বদ্ধ অনুপ্রাস-ঝঙ্কারিত দীর্ঘ সুরে সেই অলৌকিক গাথা গায়িতে লাগিল।—বলদৃপ্ত দুর্দ্দান্ত দৈত্যপতির নিদারুণ অত্যাচারে ত্রিদিবধাম শ্রীভ্রষ্ট; বন্দনাগীতিমুখরিত নন্দনকানন নিরানন্দ শ্মশানতুল্য; মন্দাকিনীতীরে মন্দারের সে শোভা নাই; পারিজাতে তেমন গন্ধ নাই; অপ্সরাগণ প্রমোদনৃত্যে বিরত হইয়াছে; দেবগণ দুঃখে ম্রিয়মাণ, অপমানে নতশির; দেবেন্দ্রাণী শচী, কন্দর্পকান্তা রতি—সকলেই দানবহস্তে অশেষরূপে নিগৃহীতা। ক্রোধে ক্ষোভে লজ্জায় দেবরাজের সহস্র লোচন হইতে সহস্র ধারে অজস্র অশ্রু বিগলিত হইতেছে।—গায়িকার কোমলকণ্ঠনিঃসৃত, দেবগণের দুঃখদৈন্যপ্লাবিত সকরুণ সঙ্গীতধারা শ্রোতৃবর্গের শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিয়া সমবেদনায় তাহাদের হৃদয় আপ্লুত করিয়া তুলিল; সকলে স্থান কাল ভুলিয়া বহুপ্রাচীন যুগের একটি সঙ্কটসঙ্কুল পৌরাণিক দৃশ্যের মধ্যে আত্মহারা হইয়া পড়িল; সেই বিষাদসঙ্গীত শুনিতে শুনিতে ও নানা শোচনীয় দৃশ্য অতিক্রম করিতে করিতে, দর্শকের নয়নসমক্ষে শুভ্রতুষারকিরীট কৈলাসের পদপ্রান্তবাহিনী সুরতরঙ্গিণী মন্দাকিনীর ফেনোর্ম্মিমালা, বিজন শরবন, হরমনোমোহিনী নগেন্দ্রনন্দিনী পার্ব্বতীর মাতৃরূপ, ও দেবাদিদেব মহাদেবের রজতগিরিনিভ মহিমময় মূর্ত্তি মায়াচিত্রের ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; অবশেষে সকল চিত্র নিষ্প্রভ করিয়া এক অনিন্দ্যসুন্দর, পঙ্কজলোচন, গৌরকান্তি, অমরবৃন্দবন্দনীয় কমনীয় শিশু-দেবমূর্ত্তি তাহাদের চিত্তপটে প্রতিফলিত হইল। তখনও সেজের উজ্জ্বল আলোক চণ্ডীমণ্ডপমধ্যবর্ত্তী ময়ূরাসন কার্ত্তিকের সুন্দর মুখের উপর বিম্বিত হইতেছিল,—

সকলে ভক্তিপরিপ্লুতহৃদয়ে সেই দেবমূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। বৃদ্ধেরা প্রাণ খুলিয়া গায়িকার প্রশংসা করিলেন; রমণীগণের বিষাদ ও ব্যাকুলতা যেন আনন্দাশ্রু-প্রবাহে ভাসিয়া গেল!

ঢপ চলিতেছে, এমন সময় সংবাদ আসিল, হালদার-বাড়ী ছায়া-বাজীর পুতুল নাচ হইতেছে! শুনিয়া ছেলেরা আর মুহূর্ত্তকালও সেখানে বসিল না; পাঠশালায় ছুটী হইলে ছাত্রেরা যেমন এক সঙ্গে গোল করিতে করিতে ছুটিয়া বাহির হয়, ঢপের আসর হইতেও তাহারা সেই ভাবে একত্র বাহির হইয়া হালদার-বাড়ীর দিকে ছুটিল।

দুই পাশে বন, মধ্যে সঙ্কীর্ণ গ্রাম্যপথ; সেই পথে হালদার-বাড়ী যাইতে হয়। পথের দুই ধারে আস্তাওড়া ও কালকাসিন্দের গাছ, লাল-ভেরান্দার জঙ্গল, চিতে ও জামালকোটার বেড়াদেওয়া গৃহস্থদের ছোট বাগান। কোথাও একপাশে এক ঝাড় বাঁশ,—আর এক দিকে একটা প্রকাণ্ড তেঁতুলগাছ। বাঁশ ও তেঁতুলের ঘনপল্লবের মধ্যে গাঢ় অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া আছে; লতায় পাতায় খদ্যোতপুঞ্জ মিট্‌মিট্‌ করিয়া অন্ধকারের মধ্যে আলোকের স্ফুরণ করিতেছে; দূর মাঠে শৃগাল ডাকিতেছে; গৃহস্থদের গৃহপ্রান্ত হইতে গ্রাম্যকুকুরগুলি চিরশত্রু শৃগালের কোলাহলে উত্তেজিত হইয়া চীৎকার করিতেছে। ছেলেরা ত্রস্তপদে এই গ্রাম্যপথে ছুটিয়া চলিয়াছে। বাতাসে এক একবার পথপ্রান্তবর্ত্তী গাছের পাতাগুলি নড়িয়া উঠিতেছে।—একটা শুষ্ক বটপত্র নৈশসমীরণপ্রবাহে শাখাচ্যুত হইয়া একটি ছেলের গায়ে উড়িয়া পড়িল, ভয়ে তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল।

হালদার-বাড়ী উপস্থিত হইয়া দর্শকগণ দেখিল, পূজার দালানের সম্মুখে একটা যায়গা চাটাই দিয়া ঘিরিয়া সেখানে পুতুল-নাচ আরম্ভ

হইয়াছে। অনেক লোক চারি দিকে কাতার দিয়া ঠিক পুতুলেরই মত দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছে।

হালদার-বাড়ীতে তখন পূজা শেষ হইয়া গিয়াছে। আহারাদির বিশেষ কোন আয়োজন নাই। ঠাকুরঘরেও আলোকের তেমন আড়ম্বর নাই; একটা উচ্চ দীপগাছার উপর একটা মাটীর ডেল্‌কো মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছে। কয়েকখানি নৈবেদ্য রেকাবী দিয়া ঢাকা রহিয়াছে। ঘরের মধ্যে একটিও লোক নাই; শুধু একটা ক্ষুধার্ত্ত কালো বিড়াল সেখানে আহারান্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সকল লোক ছায়াবাজীর পুতুল-নাচ দেখিতেই ব্যস্ত!

বাজনা বাজিতেছে। ছায়াবাজীর পুতুলেরা অদৃশ্য-হস্ত-চালিত হইয়া নাচিতেছে, ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গি করিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে ছায়াবাজীর দলের লোক তালে তালে পা ফেলিয়া নূপুর বাজাইতেছে; দর্শকগণ ভাবিতেছে,—বুঝি পুতুলের পায়েই নূপুর বাজিতেছে! কিন্তু পটান্তরালবর্ত্তী লোকগুলি চাপা গলায় অনুনাসিক স্বরে পুতুলের বক্তৃতাস্বরূপ যে কথাগুলি বলিয়া যাইতেছে, তাহা একঘেয়ে এবং সেগুলি কিছুমাত্র সুশ্রাব্য নহে।

ছায়া-বাজীতে নানাপ্রকার দৃশ্য প্রদর্শিত হইতেছিল। একটা জেলে নদীর ধারে বসিয়া ছিপে মাছ ধরিতেছিল, দৈবক্রমে একটা কুমীর আসিয়া তাহার বঁড়শী গিলিল; প্রকাণ্ড মাছ বাধিয়াছে ভাবিয়া জেলে ছিপ ধরিয়া টানাটানি করিতে করিতে জলে নামিয়া পড়িল, জলে পদস্পর্শ হইবামাত্র কুমীর জেলের পা চাপিয়া ধরিল! জেলে তখন ছিপখানি ফেলিয়া দিয়া হতভম্ব ভাবে দুই হাতে মাটী আঁকড়াইয়া

ধরিয়া তীরে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না। কুমীর তাহাকে গভীর জলে টানিয়া লইয়া গেল। নদীটি দেখিতে দেখিতে হঠাৎ সাগরে পরিণত হইল! সমুদ্রবক্ষে শ্রীমন্ত সদাগরের নৌকা আসিয়া উপস্থিত!—কমলে-কামিনী দূরে কমলবনে বসিয়া গণেশকে কোলে লইয়া পুত্রের মুখচুম্বন করিতেছেন,—রমণী পদ্মবনে বসিয়া হস্তী গিলিতেছেন ভাবিয়া শ্রীমন্তের বিস্ময়ের সীমা নাই!

বায়স্কোপের ছবির মত মুহূর্ত্তমধ্যে সমুদ্র ও কমলবন অন্তর্হিত হইল। তখন দেখা গেল, পঞ্চবটীবনে জটাবাকলধারী রামলক্ষ্মণের আবির্ভাব হইয়াছে! সূর্পনখা নাচিতে নাচিতে আসিয়া লক্ষ্মণের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিল। লক্ষ্মণ কোনও উত্তর না করিয়া অবলীলাক্রমে তাহার নাসাকর্ণ কাটিয়া দিলেন! সূর্পনখা কাঁদিতে কাঁদিতে দশমুণ্ড-রাবণের কাছে গিয়া নাকি সুরে বলিল, 'দাঁদাঁ গোঁ দাঁদাঁ, নথাঁ বেঁটা আমার নাক কাঁন কেঁটে নিয়েছেঁ'! দশানন এ কথা শুনিয়া দশটা মাথা নাড়িয়া রাগ প্রকাশ করিতে লাগিল। রামরাবণের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ঘোরতর যুদ্ধ! হনুমান দীর্ঘলেজ লইয়া লাফাইয়া রাবণের মাথায় উঠিয়া তাহার দাড়ি গোঁফ ছিঁড়িয়া পলাইতে না পলাইতে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইল, এবং দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-উপলক্ষে ভীমের সঙ্গে রাজগণের যুদ্ধ বাধিয়া গেল! ভীম এক জন রাজাকে জাপ্‌টাইয়া ধরিয়া অন্য এক জন রাজার গায়ে ছুড়িয়া ফেলিতেছেন, এবং দুই রাজাই মাটিতে গড়াগড়ি যাইতেছেন! অর্জ্জুন বাণবৃষ্টি করিয়া জন কত রাজাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছেন; দূরবর্ত্তী ব্রাহ্মণেরা ভীমার্জ্জুনের বিক্রম দেখিয়া হাত মুখ নাড়িয়া ও বিষম অঙ্গভঙ্গি করিয়া নানা প্রকার

ইঙ্গিত করিতেছেন,—দেখিয়া দর্শকগণ হাসিয়া পরস্পরের গায়ে ঢলিয়া পড়িতে লাগিল!

এই প্রকার বিবিধ দৃশ্য দেখাইতে দেখাইতে রাত্রি শেষ হইয়া আসিল। রাত্রি প্রায় তিনটার সময় পুতুল নাচ বন্ধ হইয়া গেল। সকলে কলরব করিতে করিতে বাড়ী ফিরিয়া চলিল। উৎসবভবন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, এবং ঢাকীরা দুই একবার ঢাক বাজাইয়া মাথার কাছে ঢাকগুলি ফেলিয়া রাখিয়া, জীর্ণ কাঁথায় সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া শুইয়া পড়িল। সমস্ত গ্রাম নিস্তব্ধ; চতুর্দ্দিকে ঘোর অন্ধকার; কেবল দূরবর্ত্তী পল্লীতে চৌকীদারেরা এক একবার "এ গেরস্ত, জাগ হো!" শব্দে চীৎকার করিয়া নৈশনিস্তব্ধতা ভঙ্গ ও গ্রামবাসিগণের নিদ্রিত চেতনাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিতে লাগিল।

রাত্রি প্রভাত হইল। রাত্রির উৎসববার্ত্তা নূতন করিয়া ঘোষণা করিবার জন্য পূজাবাড়ীতে ঢাক বাজিয়া উঠিল। অপরাহ্নে তিনটার পূর্ব্বেই কার্ত্তিকের বরণ হইয়া গেল। প্রত্যেক বাড়ীতেই ঠাকুর বাহির করিবার উদ্যোগ হইতে লাগিল। বাগচী-বাড়ীতে তক্তারামা সজ্জিত হইল; কার্ত্তিক বাহকের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া তক্তারামায় প্রবেশ করিলেন। লোহিতবস্ত্রমণ্ডিত তক্তারামার প্রত্যেক 'ফুকরে' দড়ি দিয়া কাচের 'হাঁড়ি' ও 'বেল' টাঙ্গানো,—'হাঁড়ি'গুলির মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাতি; কার্ত্তিকের সম্মুখে দুই দিকে দুইটি পরীর মূর্ত্তি, মুষ্টিবদ্ধ হস্তে বাতি বসাইবার জন্য এক একটি ছিদ্র, তাহার ভিতর বাতি গুঁজিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাঁশের আড় বাঁধিয়া তাহার উপর কার্ত্তিককে বসাইয়া পথে বাহির করা হইল। যাহারা জোড়া-কার্ত্তিক পূজা করিয়াছে,

তাহারা দুই কার্ত্তিককে বাঁশের মাচার উপর মুখোমুখী বসাইয়া বাজারের দিকে লইয়া চলিল।

দুই প্রহরের পর হইতেই বাজার লোকে লোকারণ্য। আজ দোকানপাট সমস্ত বন্ধ। পথের ধারে কেবল দুইখানি পানের দোকান বসিয়াছে; জলচৌকীর উপর ছোট ছোট বাটীতে নানা রকম পানের মশলা। পাশে ছোট ঝোড়াতে পানের বিড়ে। মেছোবাজারে দুই এক ঝুড়ি মাছও আসিয়াছে; কিন্তু ক্রেতা অপেক্ষা আজ দর্শকের সংখ্যাই অধিক। মেছোবাজারে জনসংখ্যা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে। আজ সকলের মুখেই কার্ত্তিকের লড়াইয়ের কথা। ছোট ছেলে মেয়ে হইতে বৃদ্ধ বৃদ্ধা পর্য্যন্ত সকলেই ধোয়া কাপড় পরিয়া রাস্তায়, বাজারের মধ্যে, ইঁদারার পাশে, ও বটগাছের নীচে দাঁড়াইয়া কার্ত্তিকের শুভাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে।

বেলা চারিটার পর গ্রামবাসিগণ একে একে বাদ্যভাণ্ডসহকারে নিজ নিজ কার্ত্তিক লইয়া বাজারে প্রবেশ করিল। কয়েক খণ্ড বাঁশ 'এড়ো' করিয়া বাঁধিয়া তাহার উপর কার্ত্তিকের কাঠের 'পাট' বসান হইয়াছে; 'পাট' বাঁশের সঙ্গে এমন শক্ত করিয়া বাঁধা হইয়াছে যে, কার্ত্তিকের নড়িবার-চড়িবার সামর্থ্য নাই! আট দশ জন লোক কার্ত্তিকের 'আড়' ঘাড়ে লইয়া চলিয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে 'নাচনের' বাজনা বাজিতেছে, আর লোকগুলি তালে তালে পা ফেলিয়া কার্ত্তিককে নাচাইতে নাচাইতে চলিয়াছে।

ক্রমে দুই এক করিয়া অনেকগুলি কার্ত্তিক বাহক-স্কন্ধে নাচিতে নাচিতে বাজারে প্রবেশ করিল। দত্তপাড়ার কার্ত্তিক, বক্সীপাড়ার

কার্ত্তিক, কাঁসারীপাড়ার, তাঁতিপাড়ার, কাশ্যপপাড়ার,—সকল পাড়ার কার্ত্তিক বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া ও বাদ্যভাণ্ড সঙ্গে লইয়া মহাসমারোহে বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

জোরে জোরে বাজনা বাজিতেছে, আর বাহকেরা কার্ত্তিক ঘাড়ে লইয়া নাচিতে নাচিতে বাজারের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! ধূলা উড়িতেছে, ঢাক বাজিতেছে, আর মধ্যে মধ্যে উচ্চ হরিধ্বনি উঠিতেছে;—হর্ষকলরবের বিরাম নাই!

বেলা শেষ হইয়া আসিলে চৌধুরী বাবুদের রাজকার্ত্তিক সদলবলে বাজারের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। ত্রিশ পঁয়ত্রিশজন বাহক বাঁশ বাঁধিয়া রাজকার্ত্তিকের সিংহাসন কাঁধে করিয়া চলিয়াছে;—একজন লোক কার্ত্তিকের সিংহাসনের পশ্চাতে বসিয়া ময়ূরপুচ্ছের দড়ি ধরিয়া টানিতেছে, আর পুচ্ছগুলি একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া যাইতেছে, আবার যেমন দড়ি ঢিল দিতেছে, অমনই ময়ূরপুচ্ছগুলি প্রসারিত হইতেছে! বহুসংখ্যক লোক খাস, নিশান, ছাতি, আড়ানি লইয়া সঙ্গে চলিয়াছে। অনেকের হাতে মশাল, রঙ্গমশাল ও মহাতাপ। বড়লোকের চাকরেরা তাহাদের মনিবের ছোট ছোট ছেলেদের লাল সবুজ পোষাকে সাজাইয়া, টুপী ও জুতা পরাইয়া, সজীব কার্ত্তিকের মতই তাহাদিগকে কাঁধে করিয়া কার্ত্তিকের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে! চৌধুরী বাড়ীর কার্ত্তিকের পশ্চাতে বাগচীবাড়ীর তক্তারামা। বাগচীদের মেজবাবু টেরি কাটিয়া ফ্ল্যানেলের শার্টের উপর কোঁচান চাদর ঝুলাইয়া, একহাতে কোঁচার অগ্রভাগ ও অন্য হাতে ছড়ি লইয়া তাঁহাদের কার্ত্তিকের আগে চলিয়াছেন। এও এক কার্ত্তিক! চলিতে চলিতে তিনি এক একবার পশ্চাতে হঠিয়া আসিয়া, দুলিদিগকে

সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া সমান তালে বাজাইবার হুকুম দিতেছেন, কাহারও বা পিঠে ছড়ির দুই একটা গুঁতা মারিয়া তাহাকে সরাইয়া দিতেছেন, যেন এরূপ না করিলে তাঁহাদের কার্ত্তিক লড়াইয়ে হারিয়া যাইবে! এক এক পাড়ার কার্ত্তিকের দল সমবেত বাদ্যভাণ্ড অগ্রবর্ত্তী করিয়া ঝাঁক বাঁধিয়া চলিয়াছে; সকলের পশ্চাতে দর্শকবৃন্দ।—পথের ধূলা তাহাদের নাকে মুখে প্রবেশ করিতেছে; তথাপি সকলে পরম পুলকিত-চিত্তে ভিড় ঠেলিয়া কার্ত্তিকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এবং কোনও পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই তাহাকেও হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে। কোনও সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়ীর কাছে আসিলে বেহারারা কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ-অনুসারে এক মিনিটকাল পথে দাঁড়াইয়া, বাতায়ন-অন্তরালবর্ত্তিনী অন্তঃপুরিকাদিগের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য কার্ত্তিকের মুখখানি সেইদিকে ফিরাইয়া ধরিতেছে; এবং ঢাকীরা বাদ্যকুশলতা দেখাইবার জন্য মাথা নাড়িয়া ঘাড় ঘুরাইয়া লম্ফঝম্ফ সহকারে বিকট ঢক্কাধ্বনি দ্বারা সন্ধ্যার ধূসর আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে, কার্ত্তিকের 'আড়ং' সমস্ত গ্রাম ঘুরিয়া গ্রাম্য কালীমন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তখন ঢং ঢং করিয়া আরতির কাঁশর বাজিতেছিল, এবং পুরোহিত ঠাকুর ঘণ্টা ও প্রদীপ নাড়িয়া দেবীর আরতি করিতেছিলেন। কালীমন্দিরের সম্মুখে পথের দুইধারে কার্ত্তিকগুলি নামাইয়া বাহকেরা কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া লইল। মন্দিরপ্রাঙ্গন, মন্দিরের সন্নিকটবর্ত্তী তমালতল দেখিতে দেখিতে জনাকীর্ণ হইয়া গেল; মশাল জ্বলিয়া উঠিল; বাতি রঙ্গমশাল প্রভৃতিও প্রজ্বলিত হইল; দুই চারিটা

হাউই হুস্-হুস্ শব্দে গগন মার্গে গিয়া সন্ধ্যার অন্ধকার আকাশে কার্ত্তিকের বীরদর্প ঘোষণা করিতে লাগিল! এক সঙ্গে তুমুলরবে সমস্ত ঢাক বাজিয়া উঠিল; এবং বাহকেরা হরিধ্বনি করিয়া কার্ত্তিক ঘাড়ে তুলিয়া নাচিতে নাচিতে পুনর্ব্বার আলোকমালাসমুজ্জ্বল জনকোলাহলপূর্ণ বাজারের ভিতর দিয়া নদীর দিকে চলিল।

নদীর কিয়দ্দূর হইতে দর্শকগণ গৃহমুখে ফিরিয়া আসিল। নদীতীরে কার্ত্তিকের পরিধেয় বস্ত্রাদি খুলিয়া লওয়া হইল। চৌধুরী বাবুদের রাজ-কার্ত্তিকের তাজ, ময়ূরের পুচ্ছ, বস্ত্রাদি, সমস্ত খুলিয়া লইয়া, ক্ষুদ্রকায়া নদীর একবুক জলে তাহাকে বিসর্জ্জন করা হইল। তখন ঢাকের 'বোল' পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্য প্রকার বাজনা বাজিতে লাগিল; এবং সানাইয়ের বিদায়কাতর হৃদয়ভেদী সকরুণ উচ্ছ্বাস শুনিয়া সকলেই বুঝিতে পারিল, 'কার্ত্তিকের লড়াই' শেষ হইয়াছে!

নবান্ন

নবান্ন

নবান্ন বঙ্গের অধিকাংশ পল্লীতেই অগ্রহায়ণের একটি আনন্দপূর্ণ মঙ্গলসূচক গার্হস্থ্য উৎসব! পল্লীবাসিগণের মধ্যে নিষ্ঠাবান হিন্দু পিতৃ-পুরুষ ও দেবগণের উদ্দেশে নূতন চাউল উৎসর্গ না করিয়া স্বয়ং তাহা গ্রহণ করেন না। প্রাচীনগণ মনে করেন, নবান্ন না করিলে যথেষ্ট প্রত্যবায় আছে। এমন কি, অনেক প্রবাসীও এই উপলক্ষে প্রবাস হইতে গৃহে সমাগত হইয়া আত্মীয় স্বজনগণের সহিত মিলিয়া নবান্ন করিতেছেন,—এ দৃশ্য পূর্ব্বে আমাদের পল্লী অঞ্চলে বিরল ছিল না; কিন্তু আজকাল ইংরাজী-শিক্ষার বিস্তারে আমাদের উৎসবানুরাগ অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়া আসিয়াছে। আবার অনেকে ইচ্ছাসত্ত্বেও ব্যয়-বাহুল্যের আশঙ্কায় বহুদূরবর্ত্তী প্রবাস হইতে মধুরস্মৃতিমণ্ডিত পল্লীগ্রামের উৎসব-ভবনে উপস্থিত হইয়া নবান্নে যোগদান করিতে পারেন না। নবান্ন না করিলে প্রত্যবায় থাক না থাক, দীর্ঘকাল পরে বালকবালিকাগণের কলকণ্ঠঝঙ্কারে মুখরিত স্নেহাচ্ছন্ন পল্লীগৃহে পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী ও আত্মীয়স্বজনগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নূতন আমনের চাউলের অন্নগ্রহণের মধ্যে এমন কোমল মাধুর্য্য ও প্রীতিকর ভাব আছে,—যাহা গৃহচ্যুত প্রবাসীর বিরহবিষাদব্যথিত একক জীবনের পক্ষে একান্ত আকাঙ্ক্ষণীয়; এই মধুর পুণ্যস্মৃতিটুকুকে বৈচিত্র্যহীন জীবন-পথের সম্বল করিয়া বিরহী পথিক দীর্ঘকালের জন্য প্রবাসযাত্রা করিতে পারে।

গোবিন্দপুর গ্রামে যে সকল গৃহস্থের বাস, তাহাদের অধিকাংশেরই উপজীবিকা চাষ। যাহারা জমীদারের সেরেস্তায় বা নীলকুঠিতে চাকরী করে, তাহাদেরও দুই দশ বিঘা জমী ও একখানি লাঙ্গল আছে; ইহাতে তাহাদের সংবৎসরের চিঁড়া মুড়ির উপযুক্ত ধান, ডাল ও তৈলের সংস্থান হয়, দু' পাঁচজন লোকও হাতে থাকে। কোন কোন বৎসর অজন্মা হইলেও তাহারা চাষ ছাড়িতে চাহে না, যেন ইহা তাহাদের দিনপাতের একটি প্রধান উপলক্ষ! জমীদারী সেরেস্তার বা নীলকুঠির কাজ শেষ করিয়া গ্রামবাসীগণ যে দু'দণ্ড অবসর পায়, সে সময়টুকু তাহারা রাখাল কৃষাণদের সঙ্গে জমীর কথা, লাঙ্গল ও বলদের কথা, ফসলের কথা লইয়াই কাটাইয়া দেয়। সুতরাং এ কালে কৃষিকার্য্যে সর্ব্বত্র লক্ষ্মীলাভ না হউক, পল্লীবাসীর কার্য্যহীন চিত্তকে সংযত রাখিবার ইহা একটি অব্যর্থ উপায়।

মজুমদারেরা গোবিন্দপুরের একঘর বনিয়াদী গৃহস্থ। গ্রামে প্রবাদ আছে, পূর্ব্বে তাঁহাদের জমীদারী ছিল। সিপাহী যুদ্ধের কিছু পরে তাঁহাদের জমীদারী বাকি খাজনার দায়ে নিলাম হইয়া যায়! প্রবাদে ইহাও প্রকাশ যে, পদ্মাপারে তাঁহাদের জমিদারী ছিল। বর্ত্তমান মজুমদার-গণের পিতামহ গুরুগোবিন্দ মজুমদারের মোক্তার জয়রাম গাঙ্গুলী প্রভুর জমীদারীর কালেক্টরীর খাজনা লইয়া জেলায় যাইতেছিল। যে দিন কালেক্টরীতে খাজনা দাখিল করিবার কথা, সেইদিন প্রভাতে জয়রাম মোক্তার একখানি ভিজে গামছা পরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া মজুমদারবৃদ্ধের পদপ্রান্তে আছড়াইয়া পড়িল; কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া গুরুগোবিন্দ জানিতে পারিলেন, তাঁহারই সর্ব্বনাশ হইয়াছে, খাজনার

টাকা সমেত মোক্তারের নৌকা গঙ্গায় ডুবিয়াছে; মা গঙ্গা সকলই গ্রহণ করিয়াছেন, কপর্দ্দকমাত্র উদ্ধার হয় নাই!

গুরুগোবিন্দ নিজের অবস্থা বুঝিলেন; বুঝিলেন, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহার জমীদারী লাটে উঠিবে; যিনি অন্নদানে শত শত ব্যক্তিকে নিত্য প্রতিপালন করিতেছিলেন, তাঁহাকেই সপরিবারে অন্নকষ্টে বিব্রত হইয়া পড়িতে হইবে; কিন্তু নিরুপায়! কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া সুদূর সদরে পাঠান—রেলওয়ে টেলিগ্রাফের সম্বন্ধবর্জ্জিত দেশের পক্ষে অসম্ভব। মোক্তার ব্রাহ্মণের ছেলে; 'ভরা' ডুবির কথা বিশ্বাস না হইলেও গুরুগোবিন্দ তাহাকে অধিক কিছু বলিলেন না, কেবল বিরক্তিভরে বলিলেন, "মা গঙ্গা আমার সর্ব্বনাশ করিলেন, কিন্তু তোমার লজ্জাটুকু ত বজায় রাখিয়াছেন দেখিতেছি; সব গিয়াছে, তোমার গামছাখানি ত যায় নাই! আচ্ছা যাও, এ টাকার জন্য তোমার আর কোন দায়িত্ব রহিল না।"

কিন্তু মজুমদারের প্রেরিত খাজনার টাকাতেই সেই সম্পত্তি ক্রীত ও হস্তান্তরিত হইয়া গেল!—জমীদার ফতুর ও মোক্তার জমীদার হইল; আর সেইদিন হইতেই মজুমদারেরা চাষী গৃহস্থ।

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি"

এ প্রবাদটা মজুমদার-পরিবারে বেশ ফলিয়া গিয়াছিল। দৈববিড়ম্বনায় ইঁহারা লক্ষ্মীকে বিদায় দিতে বাধ্য হইলেন বটে, কিন্তু কমলা চঞ্চলা হইয়াও সেই সরলহৃদয় উদারস্বভাব ধর্ম্মনিষ্ঠ বৃদ্ধ জমীদারকে পরিত্যাগ করিলেন না। সমস্ত জমীদারী নিলামে উঠিলেও, কৃষিকর্ম্ম হইতেই

গুরুগোবিন্দ মজুমদারের সোনার সংসার বজায় রহিল। গুরুগোবিন্দের পরলোকগমনের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার এই চাষের আয় হইতেই সাতগেছের জমীদারদের নিকট চক-শ্যামনগর মাহালখানি ক্রয় করিয়াছিলেন; এতদ্ভিন্ন গোবিন্দপুরের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে দুইটি প্রকাণ্ড পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; এ জন্য তাঁহাকে জেলা-বোর্ডের সাহায্যপ্রার্থী হইতে হয় নাই।

গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তে যে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার নাম গ্রাম্যবিগ্রহ গোবিন্দদেবের নামানুসারে 'গোবিন্দদিঘী' রাখা হইয়াছিল। অদূরে গোবিন্দদেবের মন্দির। গোবিন্দদিঘীর পূর্ব্ব পশ্চিম দুইদিকে দুইটি সান-বাঁধান ঘাট, উপরে সুবৃহৎ সুদৃশ্য চাঁদনী। পূর্ব্বদিকের ঘাটে পুরুষেরা ও পশ্চিমদিকের ঘাটে স্ত্রীলোকের স্নান করিয়া থাকেন। মন্দিরের অল্প দূরেই মজুমদারদের প্রকাণ্ড গোলাবাড়ী,—ধান, গোধূম, অড়হর, মসিনা, ছোলা প্রভৃতি শস্যে পোনের ষোলটি গোলা বোঝাই। মছিরুদ্দীন বিশ্বাস এই গোলাবাড়ীর গোমস্তা। মছিরুদ্দীন অনেক দিনের পুরাতন চাকর, প্রভুর অত্যন্ত বিশ্বাসী। ধান 'বাড়ি' দেওয়া, আসামীদিগের নিকট হইতে ধান ও অন্যান্য শস্য আদায় করা, গোলাবাড়ীর জিনিসপত্র ক্রয় বিক্রয় করা মছিরুদ্দীনের কাজ।

এই গোলাবাড়ী ও মজুমদার-বাড়ীর ব্যবধান অধিক নহে। মজুমদারদের চণ্ডীমণ্ডপখানি সুবৃহৎ। বাড়ীতে কেবল সেইখানিই খড়ের ঘর; আর সমস্তই পাকা ইমারত। বাড়ীর পাশেই গোয়ালবাড়ী, গোশালায় বড় বড় দুইখানি ঘর। চাষী-গৃহস্থ বলিয়া ইঁহাদের পঁচিশ ত্রিশটা বলদ আছে; গাই গরুর সংখ্যাও দশ বারটি। গোয়ালের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে

ইষ্টকবদ্ধ গামলার সারি। এক পাশে ঘরের মত উচ্চ বিচালির গাদা; অদূরে একটি অনতিদীর্ঘ ভূষির ঘরে বাঁশের মাচার উপর চালের সমান উচ্চ করিয়া ভূষি রাখা হইয়াছে। মধ্যাহ্নকালে যখন গরুগুলি গোয়াল ছাড়িয়া মাঠে চরিতে বা জমীতে চাষ দিতে যায়, তখন গোয়ালবাড়ীটা শূন্য পড়িয়া থাকে; শূন্যতাভরে যেন খাঁ খাঁ করে; কিন্তু অপরাহ্নকালে গোয়ালের অভিনব শ্রী দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষাণেরা ক্ষেত হইতে ফিরিয়া লাঙ্গলগুলি ঘরের 'ভিতে' 'আড়' করিয়া ফেলিয়া রাখে; দুই চারিজন রাখাল বাঁকের দুইদিকে টিনের ক্যানেস্তারা ঝুলাইয়া পুকুর হইতে জল আনিয়া সেই জলে 'জাবনা' ভিজাইবার জন্য গামলাগুলি পূর্ণ করিতে থাকে; কোন কোন রাখাল বড় বিচালিকাটা বাঁকা বঁটিতে বিচালী 'চুরাইতে' আরম্ভ করে; বিচালী 'চুরান' শেষ হইলে গামলায় 'জাব' মাখিয়া বলদগুলিকে গামলার কাছে বাঁধিয়া দেয়। বলদগুলি নাকমুখ ডুবাইয়া তাহা খাইতে আরম্ভ করে, এক একবার মুখ ঊর্দ্ধে তুলিয়া ব্যগ্রভাবে খাদ্যচর্ব্বণ করিতে থাকে, কখন বা পরস্পরের সিংএ সিং বাধাইয়া গুঁতাগুঁতি করে। কৃষকেরা গোয়াল-ঘরের চালে 'পানাই'গুলি গুঁজিয়া রাখিয়া, গৃহকর্ত্রীর কাছে বাঁশের চোঙ্গা ভরিয়া তৈল লইয়া, তাহা সর্ব্বাঙ্গে উত্তমরূপে মাখিয়া দীঘিতে স্নান করিতে যায়। রাখালেরা গাভীগুলিকে গোচারণক্ষেত্র হইতে চরাইয়া আনিয়া সন্ধ্যার সময় গোয়াল-ঘরে পুরিয়া রাখে; দুই একটি দুগ্ধবতী গাভীকে রান্না-বাড়ীতে লইয়া গিয়া, সমস্ত দিনে গামলায় যে ফেনজল সঞ্চিত হয় তাহা খাওয়াইয়া আনে, এবং গোবৎসগুলিকে গোয়ালের প্রান্তবর্ত্তী কঞ্চির বেড়া দিয়া ঘেরা একটি ক্ষুদ্র কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখে।

ক্রমে সন্ধ্যা গভীর হইয়া আসে; গোয়ালঘরে 'সাঁজাল' দেওয়া হয়; সাঁজালের ধূমে চতুর্দ্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠে। তখন রাখাল কৃষাণেরা সাঁজালের চারিদিকে বসিয়া আগুন 'পোয়াইতে পোয়াইতে' স্ব স্ব সুখদুঃখের কথার আলোচনা করিতে থাকে। কোন কোন মাতব্বর কৃষাণ চণ্ডীমণ্ডপে একখানি কম্বলের উপর বসিয়া মজুমদারদের 'ছোট কর্ত্তা'র আগমনের প্রতীক্ষা করে! ছোটকর্ত্তা ক্ষেত তদারক করিয়া সন্ধ্যার পর বহির্বাটীতে পদার্পণ করিবামাত্র সসম্ভ্রমে উঠিয়া তাঁহাকে সেলাম করে, তিনিও সকলকে প্রত্যভিবাদন করিয়া, তাহাদিগকে বসিতে বলিয়া বস্ত্রাদিপরিবর্ত্তনের জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন।

তখন বহির্বাটীতে একটি তৈলানুলিপ্ত অনুচ্চ কাঠের দীপগাছার উপর একটা ক্ষুদ্র মাটীর প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে। রামধনবাবু অগ্রহায়ণের শীতেও কোঁচার অগ্রভাগ দ্বারা দেহ আবৃত করিয়া হুঁকা টানিতে টানিতে খড়ম পায়ে দিয়া চণ্ডীমণ্ডপে সমাগত হন। তখন প্রভু ও ভৃত্যবর্গের মধ্যে নানা কথার আলোচনা চলিতে থাকে,—কোন্ জমীতে কেমন চাষ চলিতেছে, 'পচান' জমীর অবস্থা কেমন, এবারকার চাষে লোকসান হইবে, কি খরচটা মাত্র উঠিতে পারে, মরিচের আবাদে কিরূপ ফল পাইবার সম্ভাবনা আছে, তিলের অবস্থা আশাপ্রদ কি না, কারণ প্রায় সকল ক্ষেতেই 'আঁচা' লাগিয়াছে—ইত্যাদি এত বিষয়ের আলোচনা চলে যে, তদ্দ্বারা বাঙ্গলা গবর্মেণ্টের কৃষিবিভাগের অধ্যক্ষ মহাশয়ের একখানি প্রকাণ্ড 'রিপোর্ট' প্রস্তুত হইতে পারে! কৃষকেরা সকলেই স্ব স্ব বুদ্ধি বিবেচনা অনুসারে অসঙ্কোচে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া যায়; প্রভু ও ভৃত্যের সম্বন্ধের মধ্যে যে কিছু গোপনের, পদগত পার্থক্যের, বা সঙ্কোচের কারণ

আছে, তাহা ভুলিয়া গিয়া পরস্পরকে নিতান্ত আত্মীয় ও সুখ দুঃখের ভাগী বলিয়া মনে করে। কোন কোন কৃষাণ, অন্যান্য কৃষিজীবীর ফসল অপেক্ষা তাহার প্রভুর ফসলের অবস্থা যে অনেক ভাল, তাহার প্রমাণের জন্য নানাপ্রকার নজীর দেখাইতে থাকে; এবং প্রভুর মন কিছু প্রফুল্ল আছে, ইহা বুঝিতে পারিলেই, শীতবস্ত্র, নূতন পানাই, বা অরক্ষণীয়া কন্যার আসন্ন বিবাহের আবশ্যকতার উল্লেখ করিয়া কিছু 'আগাম মাহিয়ানা' পাইবার 'আরজ' করে। ছোটকর্ত্তা সকলকেই মিষ্টবাক্যে ভরসা দিয়া গভীর রাত্রে অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন।

তিন ভ্রাতার মধ্যে রামধন মজুমদার সর্ব্বকনিষ্ঠ হইলেও তিনিই বাড়ীর কর্ত্তা। তাঁহার অপর দুই সহোদর প্রবাসী। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণধন ষ্টুয়ার্ট কোম্পানীর জমীদারী হাটলক্ষ্মীপুরের নীলকুঠীর দেওয়ান। মধ্যম ভ্রাতা হারাধন স্বরূপপুরের জমীদার নীলকমল বাবুর সদর নায়েব। প্রবাসী ভ্রাতৃদ্বয়ের স্ত্রীপুত্রাদি বাড়ীতেই থাকেন; সুতরাং তাঁহারা বিদেশে চাকরী করিলেও তাঁহাদের মন সর্ব্বদা বাড়ীতেই পড়িয়া থাকে। পূজার সময় ও অন্যান্য প্রধান উৎসব উপলক্ষে বড়কর্ত্তা ও মেজকর্ত্তা যখন বাড়ী আসেন, তখন তাঁহাদের সঙ্গে নৌকা-বোঝাই হইয়া কত সামগ্রী আসে, তাহার সংখ্যা নাই! নৌকা গ্রামের ঘাটে লাগিবামাত্র গ্রামের মধ্যে মহা কলরব উপস্থিত হয়, নৌকার জিনিসপত্র দেখিবার জন্য ঘাটের ধারে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

মজুমদারদের তিন ভ্রাতার মধ্যে বেশ সম্প্রীতি আছে, কিন্তু বধূদের মধ্যে স্নেহবন্ধনের অভাব লক্ষিত হয়; বিশেষতঃ কৃষ্ণধনের অর্দ্ধাঙ্গিনী সৌদামিনী ঠাকুরাণী কিছু রুক্ষভাষিণী। তাঁহার স্বামী তিন ভ্রাতার মধ্যে

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অর্থ উপার্জ্জন করেন বলিয়া অনেক সময়েই তিনি উচ্চকণ্ঠে ঝঙ্কার করেন, এবং নিজের সুখসচ্ছন্দতার মধ্যে নানাপ্রকার কাল্পনিক ত্রুটির অবতারণা করিয়া কনিষ্ঠ দেবর রামধনের প্রতি কঠিন ভাষারও প্রয়োগ করিয়া থাকেন; ইহাতে রামধন মনে বড় কষ্ট পান। তাঁহার উপর সংসারের কর্ত্তৃত্বভার ন্যস্ত আছে বলিয়াই মুখরা ভ্রাতৃজায়া তাঁহাকে অপরাধী মনে করেন ভাবিয়া, কখন কখন তিনি সঙ্কল্প করেন, সংসারের কর্ত্তৃত্ব হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন; কিন্তু ইহাতে দাদারা পাছে মনে বেদনা পান, সংসারের শৃঙ্খলা নষ্ট হয়, এই ভয়ে তিনি মনের কষ্ট সর্ব্বদা মনেই চাপিয়া রাখেন। অবশেষে একবার পূজার সময় তিন ভাই একত্র হইলে রামধন একদিন কথাপ্রসঙ্গে কৃষ্ণধনকে বলিলেন, "দাদা, এ সংসারের সকলকে সন্তুষ্ট রাখা আমার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে; যতদিন সংসারের কর্ত্তৃত্ব করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল, ততদিন করিয়াছি। এখন আপনি এ ভার বড়বৌ ঠাকুরাণীর কি অন্য কাহারও হাতে দিয়া আমাকে অবসর দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।"

বুদ্ধিমান কৃষ্ণধন ভ্রাতার মনঃকষ্টের কারণ বুঝিতে পারিলেন; তাঁহার পিঠে হাত বুলাইয়া স্নেহমধুরস্বরে বলিলেন, "ভাই! নির্ব্বোধ স্ত্রীলোকেরা না বুঝিয়া কত সময় কত অন্যায় কথা বলে; আমরা যদি তাহা সহ্য না করি, তাহাতে যদি আমাদের মনের শান্তি নষ্ট হয়, তাহা হইলে সংসার টেঁকিবে কি করিয়া? আমাদের সেই ছেলেবেলাকার কথা মনে করিয়া দেখ, তিন ভাই আমরা এক মায়ের কোলে মানুষ হইয়াছি, মা বাবা দু'জনেই আমাদের রাখিয়া স্বর্গে গিয়াছেন; মা বাপের সেই স্নেহ ও আশীর্ব্বাদের অপমান করিব? আমাদের মনে পরস্পরের প্রতি অশ্রদ্ধা ও

বিতৃষ্ণা জন্মিবে ? ইহাতে কেবল যে আমাদেরই ক্ষতি, এমন নয়, পরিবারটা পর্য্যন্ত যে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে! ভাঙ্গা শক্ত নয়, কিন্তু একটা সংসার বজায় রাখা বড় কঠিন। বৌরা ত ঝগড়া বিবাদ করিবেই, তাহারা পরের মেয়ে, আমাদের মনের ব্যথা কিরূপে বুঝিবে ?"—দাদার এই স্নেহগর্ভ উপদেশে রামধনের মনের বেদনা দূর হইল।

ইঁহাদের ভগিনী কাত্যায়নী ঠাকুরাণী বিধবা। সর্ব্বকনিষ্ঠা হইলেও তিনিই সংসারের কর্ত্রী। তাঁহার বুদ্ধি ও বিবেচনার উপরেই সংসারের সুখ শান্তি অনেকটা নির্ভর করে। পরিবারে তাঁহার নিজের বলিতে কিছুই নাই, তথাপি সেই বৃহৎ পরিবারের তিনিই যেন মেরুদণ্ড! সংসারের সকল ভার তিনি মাতার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন ; শ্বশুর-কুলে কেহ নাই বলিয়া সেই সংযতহৃদয়া, পবিত্রচরিত্রা ধর্ম্মশীলা বিধবা ভ্রাতৃগণের সংসারের সুখসচ্ছন্দতা-বিধানের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। সাংসারিক কর্ত্তব্য বড় গুরুতর, নিরপেক্ষ ভাবে তাহা পালন করিতে গিয়া তাঁহাকে ভ্রাতৃজায়াগণের নিকট কখন কখন রুক্ষ বচন শুনিতে হয়, কিন্তু সংসারের মঙ্গলের দিকে চাহিয়া তিনি নির্ব্বিকার চিত্তে সকলই সহ্য করেন ; মনে যখন অত্যন্ত কষ্ট পান, তখন তিনি ভ্রাতৃগণের অমঙ্গল আশঙ্কায় উচ্ছ্বসিত অশ্রুরাশি সবলে রুদ্ধ করিয়া প্রার্থনা করেন, "হে হরি, হে জগন্নাথ, ইহাদের সকলকে সুখে রাখ, আমাকে তোমার পাদপদ্মে স্থান দাও ; সংসারে যাহার কোনও বন্ধন নাই, তাহাকে কেন মায়াডোরে বাঁধিয়া কষ্ট দিতেছ ? দিনান্তে দু'দণ্ড তোমার নাম করিব, তাহারও যে অবসর নাই!"—বাড়ীর দাসদাসীরা তাঁহাকে যেমন ভয় করে, তেমনই ভালবাসে! পাছে তিনি মুখ ভার করেন,

এই ভয়ে 'গোয়ালকাড়ুনী' খুব সকালে আসিয়া গোয়ালঘর পরিষ্কার করিয়া যায়; দাসীরা অতি প্রত্যূষে অন্ধকার থাকিতে থাকিতে ছড়া-ঝাঁট দিয়া আঙ্গিনাখানি আয়নার মত ঝক্‌ঝকে করিয়া রাখে! তাহার পর, বাড়ীতে যে কয়টি ধানের গোলা আছে—তাহাদের ও তুলসীমন্দিরের সম্মুখভাগ গোলাকার করিয়া নিকাইয়া দেয়। রৌদ্র উঠিলে কেহ আঁস্তাকুড়ে বসিয়া বাসন মাজিতে আরম্ভ করে, কেহ রান্নাঘরের এঁটোকাঁটা পরিষ্কার করিয়া, ঘর নিকাইতে বসে।

কাত্যায়নী দেবী অতি প্রত্যূষে অন্ধকার থাকিতে থাকিতে উঠিয়া বস্ত্রাদি ছাড়িয়া একখানি কুশাসনে বসিয়া মালা জপিতে আরম্ভ করেন; শেষে একটু ফরসা হইলে ফুলবাগান হইতে কতকগুলি পুষ্পচয়ন করিয়া, কলাপাতে মুড়িয়া কতক গ্রাম্য বিগ্রহকে উপহার পাঠাইয়া দেন, এবং নিজে পূজা করিবেন বলিয়া কতকগুলি ফুল একখানি পরিষ্কার পিতলের রেকাবীতে তুলিয়া তুলসীমূলে রাখিয়া দেন।

আজ অগ্রহায়ণ মাসের পাঁচুই তারিখ। গ্রামের পণ্ডিত সার্ব্বভৌম মহাশয় পঞ্জিকা দেখিয়া বলিয়াছেন, নবান্নের আজ অতি প্রশস্ত দিন। তাই আজ গোবিন্দপুরের ঘরে ঘরে নবান্নের ধূম পড়িয়া গিয়াছে। হিন্দু-পল্লীতে আজ আনন্দকলরবের বিরাম নাই। আজ পাঠশালা বন্ধ। গুরু-মহাশয় ভিন্ন গ্রামে যজমানবাড়ী নবান্ন করিতে যাইবেন। পাঠশালার 'পড়ো'রা আজ মনের আনন্দ চাপিতে না পারিয়া বন্ধুবান্ধবের বাড়ীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সকল বাড়ীতেই নবান্নের উদ্যোগ চলিতেছে, কিন্তু মজুমদার-বাড়ীর আয়োজনই কিছু অতিরিক্ত। নবান্ন করিবার জন্য বড়কর্ত্তা ও মেজকর্ত্তা চাকরীস্থান হইতে বাড়ী আসিয়াছেন।

রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র তিন ভ্রাতাই বালাপোষ গায়ে দিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিলেন। রাখাল কৃষাণেরা প্রভুগৃহে আসিয়া কাঠের গুঁড়ির উপর বসিয়া রোদ পোয়াইতে লাগিল। পাড়ার দুই পাঁচ জন আত্মীয় প্রতিবেশী হাসিমুখে কর্ত্তাদের কুশলসমাচার জিজ্ঞাসা করিতে আসিল।

প্রভাতের রৌদ্র বকুলগাছের নিবিড় পল্লবের ফাঁক দিয়া মজুমদারদের চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় আসিয়া পড়িয়াছে। নবমুকুলিত সজিনা গাছের একটা উচ্চ শাখায় বসিয়া একটা চাল রোদ পোয়াইতেছে। কয়েকটি নিষ্কর্ম্মা ভদ্রলোক মোটা মার্কিনের চাদর গায়ে জড়াইয়া সতরঞ্চির উপর বসিয়া সশব্দে তামাক টানিতেছে,—সেকালের উৎসবানন্দের গল্প চলিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মনে সুখস্মৃতি জাগিয়া উঠিতেছে। প্রথম শীতের এই মধুর প্রভাতে যেন কাহারও কোন কর্ম্ম নাই! কেবল কয়েকখানি খালি গরুর গাড়ী হট্ হট্ শব্দ করিতে করিতে সম্মুখের পাকা রাস্তা দিয়া কি কাযে যাইতেছে—আর পাঁচ সাত জন 'মেটে' মজুর কোদাল ও ঝুড়িসহ ঘাঁক ঘাড়ে লইয়া গল্প করিতে করিতে কাহারও বাড়ীতে মাটীর প্রাচীর গাঁথিতে চলিয়াছে।

আজ আর রাখাল কৃষাণদের মাঠে যাইতে হইল না। তাহারা মনিববাড়ীতে নবান্ন করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছে। বাড়ীর বাগানটা বড় জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, পূজার পর আর সে জঙ্গল পরিষ্কার করা হয় নাই বলিয়া, তিন ভাই কয়েক জন কৃষাণকে সঙ্গে লইয়া সেই বাগানের ভিতর প্রবেশ করিলেন। সুশাণিত কাটারীর আঘাতে বহুসংখ্যক আগাছার ধ্বংস হইল। গোবিন্দপুরে মজুমদারদের কলাবাগানের

বিশেষ খ্যাতি ছিল। বাগানের মধ্যে প্রকাণ্ড দুই কাঁদি বর্ত্তমান কলা বেশ পুষ্ট হইয়াছিল ;—কলার ভারে গাছ দুটি হেলিয়া পড়িয়াছিল বলিয়া তাহাদের গায়ে বাঁশের 'ঠেকো' লাগাইয়া গাছ দুটিকে সোজা করিয়া রাখা হইয়াছে। রাত্রে কলা-কাঁদির উপর বাদুড় পড়িয়া সর্ব্বোচ্চ ছড়ার কয়েকটি কলা অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছে ; সেই দিনই কাঁদি দুটি কাটিবার আদেশ প্রদত্ত হইল। কাঁদি দুটি বারান্দায় নীত হইলে তাহা অবিলম্বে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় বৈঠকখানার কড়িকাঠের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া স্বর্গযাত্রী ত্রিশঙ্কু রাজার ন্যায় শূন্যে ঝুলিতে লাগিল! পাকিলে তাহা নামাইয়া পরিবার ও আত্মীয় প্রতিবেশিগণের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। এক জন কৃষাণ কলাগাছ দুটির একটি কাটিয়া তাহার 'পেট্‌কো' ছাড়াইয়া, থোড়গুলি রান্নাঘরে দিয়া আসিল ; আর একটি গাছ অখণ্ড রাখা হইল, এই থোড় নিঃশেষিত হইলে সেই গাছটি কাটিয়া দেওয়া হইবে।

আজ নবান্নের দিন 'পাথরী' গাইয়ের নূতন 'দোয়া পাতা' আরম্ভ হইল। পাথরী বড় দুষ্ট গাই, তাহার মা 'ভাঁড়ভাঙ্গী' দুই বেলা ছয় সের দুধ দিত। পাথরীর এই প্রথম বিয়েন ; তাহার বাছুরটি একুশ দিন মাত্র হইয়াছে। সে কেমন দুধ দেয়, তাহা দেখিবার জন্য বাড়ীর সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। দোয়াল হরি ঘোষ গাই দুয়িতে আসিলে সকলে তাহার সঙ্গে গোয়ালবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। হরি ঘোষ বাড়ীর মধ্যে আসিয়া শুনিল, গরু দুয়িবার ভাঁড়টা পূর্ব্বরাত্রে উননের মুখে তাতাইতে দেওয়া হয় নাই। সেই ভাঁড়ে গরু দুয়িলে পাছে দুধ 'নটাইয়া' যায়, এই আশঙ্কায়, পিসীমার পরামর্শে হরি ঘোষ একটি পরিষ্কার পিতলের বড়

ঘট লইয়া গরু দুয়িতে গেল। পাথরীর সম্মুখের একখানি পায়ে বাছুর বাঁধিয়া সে দোহনে প্রবৃত্ত হইবে, এমন সময় পাথরী লম্ফঝম্ফ আরম্ভ করিল, কিছুতেই তাহার বাঁটে হাত দিতে দিল না! তখন হরি দোয়াল গরুর লেজের লোমে রচিত ছাঁদন-দড়ি দিয়া পাথরীর পশ্চাতের পা দুইখানি ছাঁদিয়া তাহাকে দুয়িতে লাগিল। পাথরী আর পূর্ব্ববৎ অস্থিরতা-প্রকাশের সুযোগ না পাইয়া নতমুখে ব্যাগ্র-ভাবে বৎসের গা চাটিতে লাগিল। পাথরীকে দোয়া হইতেছে শুনিয়া বাড়ীর মেয়েরা কেহ কেহ কৌতূহলভরে দরজার ফাঁক দিয়া গোয়াল-বাড়ীতে উঁকি দিতে লাগিলেন। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ছুটিয়া আসিয়া গোয়ালের অদূরে সারি দিয়া দাঁড়াইল। রামধন বাবুর ছোট ছেলে অজয়কুমার তাহার জেঠামহাশয়দের কাছে ভদ্রলোক সাজিয়া উপস্থিত হইবার অভিপ্রায়ে, নীলাম্বরী কাপড়খানি পরিয়া লইবার চেষ্টায় তাহার দিদি হরিপ্রিয়ার কাছে অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘুরিতেছিল; কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া সে কাপড়খানি কক্ষে লইয়াই সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। নবজাত শুভ্র সুন্দর বাছুরটিকে গরুর সম্মুখের পদে আবদ্ধ দেখিয়া তাহার বড় কৌতুকবোধ হইল; সে আনন্দে অধীর হইয়া তাহার চঞ্চল দৃষ্টি পিতার মুখের উপর স্থাপন করিয়া, ক্ষুদ্র হাত দু'খানি ঊর্দ্ধে তুলিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল; কাপড়খানি কক্ষ হইতে খসিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল! কিন্তু সেদিকে লক্ষ্যমাত্র না করিয়া আধ-আধস্বরে বলিল, "বাবা, হলে পাকৃলিকে দুচ্চে, চ্যা-চুঁ গবল্-গুঁ—আমি বাচুল নোব।"—বাবা বলিলেন, "এখন বাছুর নিতে নেই? এখন বাছুর নিলে পাথরী মারবে।" এই কথা শুনিয়া

বালক কাল্পনিক ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িল; দুই ক্ষুদ্র হস্তে বাপকে আঁকড়িয়া ধরিয়া চক্ষু মুদিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "গয়ু মাল্‌বে, বাবা কোলে কল।" পিতা তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন, সস্নেহে বলিলেন, "না মারবে না, দুধ দেবে; দুধ খাবে না?" দুধ খাইবার জন্য তাহার কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না; "দুদ্ কুকী কাবে" বলিয়া সে বাপের গলা জড়াইয়া ধরিয়া অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্তে গোদোহন দেখিতে লাগিল। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়িল, তাহার কাছে কাপড় নাই! সে নতদৃষ্টিতে কাপড়ের সন্ধান করিতেই দেখিতে পাইল, তাহার ভগিনী সুভদ্রা কাপড়খানি কুড়াইয়া লইয়া দাঁড়াইয়া আছে; অমনি সুর ধরিল, "বাবা! আমি কাপল্ পল্‌বো।" পিতা তাহাকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া কাপড় পরাইয়া দিলেন। ইতিমধ্যে হরি ঘোষ গোদোহন শেষ করিয়া উঠিল, ঘটিটা কাত করিয়া অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণ দুগ্ধ বসুমতীকে দান করিল; তাহার পর এক ঘটি জল ঢালিয়া হাত পা ধুইয়া ফেলিল। গরু দুয়িয়া হাত পা না ধুইলে কাত্যায়নী দেবী তাহাকে যাইতে দিতেন না। তিনি জানিতেন, দোয়ালের অঙ্গে যদি দুধ শুকাইয়া যায়, তাহা হইলে গরুর বাঁটেও দুধের অভাব হয়! পাথরী 'এক টানেই' প্রায় পাঁচ সের দুধ দিয়াছে—এ আনন্দে সকলেই চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

গোয়ালবাড়ী পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই অজয়ের জ্যেঠতুতো বোন লীলা আসিয়া ডাকিল, "অজা রে! ক্ষেতা নারকেল পাড়তে ডাব গাছে উঠেছে। নারকেল নিবি ত আয়!"—এ কথা শুনিয়া অজয়কুমারের আর কোঁচা গুঁজিবার অবসর হইল না! কোঁচা লুটাইতে লুটাইতে

সে অন্যান্য ভাইভগিনীগণের সঙ্গে গৃহপ্রান্তস্থ নারিকেলবাগানের দিকে ছুটিল। ক্ষেতা বৃক্ষারোহণে শাখামৃগের ন্যায় সুনিপুণ; দশ মিনিটের মধ্যে সে একরাশি নারিকেল পাড়িয়া ফেলিল। ছেলে মেয়েরা এক একটা নারিকেল হাতে লইয়া দৌড়াইয়া মায়ের কাছে গেল।

বেলা নয়টা বাজিতে না বাজিতে ভাঙ্গা ছাতি মাথায় দিয়া একজোড়া শততালিবিশিষ্ট জীর্ণ চটিতে ধূলিধূসরিত বিবর্ণ চরণযুগলের সম্মান কথঞ্চিৎপরিমাণে রক্ষা করিয়া পেয়ারী আচার্য্য মজুমদার-বাড়ীতে প্রবেশ করিল। পেয়ারী ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘ পুরুষ, মস্তকের সম্মুখভাগ সযত্নে কামানো; হাতে ছাতা, ছাতার দামাটে একখানি গামছা বাঁধা,—স্নানের সময় সেখানি গামছা, বাজার করিবার সময় সেখানি মাছ তরকারী বহনের আধার ও নিদারুণ গ্রীষ্মে সেখানি তালবৃন্তের প্রতিনিধি! পেয়ারী আচার্য্যকে গোবিন্দপুরে কে না চেনে? হরিনাম কীর্ত্তন না করিলেও পেয়ারী সর্ব্বদাই 'তৃণাদপি সুনীচ' ও 'তরোরপি সহিষ্ণু'; তাহার কপালে দীর্ঘ তিলক, গলায় কাঠের তিনকণ্ঠী মোটা মালা, দাড়ী গোঁফ কামানো; উদ্‌ঘাটিত শুভ্র দন্তশ্রেণীসমাকীর্ণ সদা-হাস্যচ্ছটালাঞ্ছিত মুখখানিতে কোন প্রকার রাগ বা অভিমানের চিহ্ন নাই। গোবিন্দপুরের সমস্ত লোকের ঠিকুজী কোষ্ঠী পেয়ারী স্বহস্তে প্রস্তুত করে; ঠিকুজী কোষ্ঠীতে ছবি আঁকিতে, তুলোট কাগজের পীতবর্ণটি ঘোরাল করিতে, মোটা মোটা করিয়া মুক্তার মত লিখিতে পেয়ারীর নিপুণতা গ্রামের সর্ব্বজনবিদিত।

ঠিকুজী ও কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া পেয়ারী আচার্য্যের আয় নিতান্ত অল্প হয় না। এতদ্ভিন্ন কোন বাড়ীতে অন্নপ্রাশন, বিবাহ, অথবা শ্রাদ্ধ

উপস্থিত হইলে, পেয়ারী সকলের আগেই সেখানে আসিয়া জোটে, এবং কলার পেটুকো কাটিয়া ষোড়শমাতৃকা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে বসে। আজ নবান্ন উপলক্ষে এক আধটা ভাল রকম সিধা পাইবার সম্ভাবনা আছে; বিশেষতঃ, মজুমদার-বাড়ীর বড়কর্ত্তা ও মেজকর্ত্তা নবান্ন উপলক্ষে বাড়ী আসিয়াছেন, টাকাটা সিকেটা প্রাপ্তির সম্ভাবনা যথেষ্ট প্রবল; তাই পেয়ারী যথাসময়ে মজুমদার-বাড়ীতে আসিয়া দর্শন দিল। মজুমদার-দের উভয় কর্ত্তাকে চণ্ডীমণ্ডপে উপবিষ্ট দেখিয়া সে স্মিতমুখে বলিল, "প্রণাম হই দাদামশাইরা! তবে, কবে বাড়ীতে শুভাগমন হলো? প্রাণ-গতিক সব মঙ্গল ত? বৈষয়িক সংবাদও অবশ্যই শুভো! আর দাদা! আপনারাই হচ্ছেন এ দেশের প্রধান বেক্তি, আপনারা যদিস্যাৎ মধ্যে মধ্যে বাড়ী না আস্‌বেন ত কি ক'রে দেশের গুমোর রক্ষে হয়?" এইরূপ সম্ভাষণাদি শেষ হইলে আচার্য্যঠাকুর একখানি লম্বা মোটা 'কামারে' ছুরী লইয়া একটি কলাগাছ কাটিতে বসিল। এ কাজে তাহার হাত খুব চলে; ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সে কদলী বৃক্ষটিকে একরাশি 'খোলা'য় রূপান্তরিত করিয়া ফেলিল! তাহার পর উঠিয়া বলিল, "দাদা, আজ নবান্নের দিন বাজারটা একপাক ঘুরে আসি, আর বাড়ী ফেরবার সময় সিধেটা যেন পাই; আপনাদের আশ্রয়েই বাস কচ্ছি, হেঁ, হেঁ!" পেয়ারী হাসি উপলক্ষে দুই পাটি দাঁত বাহির করিল।

আজ কিছু সকালে বাজার বসিয়াছে। নবান্ন উপলক্ষে আজ বাজারে শশা, আখ, শাঁকআলু, লাল 'সাঁকারকন্দ' আলু প্রভৃতি নানাবিধ ফল মূল বিক্রয় হইতে আসিয়াছে। মজুমদারদের পুরাতন ভৃত্য 'ক্ষেতু দাদা' আজ ঝুড়ি বোঝাই করিয়া ফলফুলারি ও তরকারী লইয়া আসিল।

কাত্যায়নী ঠাকুরাণী সকাল সকাল স্নান করিয়া আসিয়া প্রথমে নূতন গরুর দুধ প্রায় এক পোয়া গঙ্গাকে দিবার জন্য ঘটীতে ঢালিয়া নদীতে পাঠাইয়া দিলেন। তাহার পর আধ সের দুধ কতকগুলি ফুল, ফল, নূতন আতপ চাউল, চিনি, কাঁচাগোল্লা প্রভৃতি জিনিস গ্রামবিগ্রহ গোবিন্দদেবের মন্দিরে পাঠাইয়া দিলেন। অবশেষে নবান্নের আয়োজন আরম্ভ হইল। আচার্য্য-কর্ত্তিত কলার পেট্‌কোগুলিতে তিনি নবান্নের জন্য গৃহে প্রস্তুত আতপ চাউল এক এক মুষ্টি রাখিয়া, একটা বড় পাত্রে কতকগুলি ফলমূল—আখ, শাঁকালু, কলা, মূলো, নারিকেল চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া রাখিলেন, এবং একটা বড় পাথরের খোরায় এক খোরা কাঁচা দুধ, একটা 'খেত্তুরে' বাটীতে এক বাটী নূতন খেজুরে গুড় ও বড় পিতলের রেকাবীতে বাতাসা, কাঁচাগোল্লা, গুড়ে মোণ্ডা প্রভৃতি মিষ্টান্ন রাখিয়া দিলেন; ছেলে মেয়েরা অদূরে বসিয়া সদ্যঃস্নাতা সিক্তকেশা শুভ্রবসনা পিসীমার কাণ্ড দেখিতে লাগিল।

নবান্নের যোগাড় করিয়া কাত্যায়নী কৃষ্ণধনকে বলিলেন, "দাদা! সকাল সকাল স্নান ক'রে এস, উদ্যোগ ত সবই হয়েছে, এখন পুরুত কাকা এলেই হয়; এতখানি বেলা হয়েছে,—ছেলেমেয়েরা মুখে জলটুকু দিতে পায় নি, বাছাদের নাড়ী 'পিতিয়ে' গেল!" কৃষ্ণধন ভ্রাতৃদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া তৈলসিক্ত বালকবালিকাবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া নদীতে চলিলেন; ক্ষেতা দাদা কতকগুলি শুষ্ক কাপড় লইয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিল।

স্নান করিয়া আসিয়া তাঁহারা দেখিলেন, পুরোহিত বাচস্পতি ঠাকুর হাত পা ধুইয়া ভিজে গামছা কাঁধে ফেলিয়া কুশাসনের উপর বসিয়া আছেন। তাড়াতাড়ি একখানি পট্টবস্ত্রখানি পরিয়া 'দোবজা'তে সর্ব্বশরীর

ঢাকিয়া কৃষ্ণধন নবান্ন করিতে বসিলেন। প্রথমে দেবগণ ও স্বর্গগত পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে সেই নূতন আতপান্ন ভক্তিভরে উৎসর্গ করিয়া দিয়া, অবশেষে তিনি চাউল, দুধ, গুড়, ফলমূল, সমস্ত সেই প্রকাণ্ড পাথরের 'খোরাটা'তে ঢালিয়া মাখিয়া লইলেন।

তখন ছেলেরা কলাপাতে অল্পপরিমাণ নবান্ন লইয়া চারিদিকে ছুটিয়া চলিল। কেহ ছাদের উপর কাক শালিক প্রভৃতি পাখীর জন্য তাহা রাখিয়া আসিল; কেহ ঢেঁকির ঘরে গিয়া ইঁদুরের গর্ত্তে খানিক ঢালিয়া দিল; মাছকে নবান্ন খাওয়াইতে একটি ছেলে নদীতে চলিল; একটি ছেলে খানিকটে নবান্ন গরু বাছুরের জন্য গোয়ালঘরে লইয়া গেল; কেহ শৃগালের জন্য চাট্টি চাউল, খানদুই শাঁকালু ও একটুক্‌রা পাকা কলা লইয়া বাঁশবনে কিংবা আশ্শাওড়ার জঙ্গলে ফেলিয়া আসিল। সকল প্রাণীর জন্য নবান্ন বিতরিত হইলে, গৃহস্থ পরিবারবর্গ একত্র সমবেত হইয়া, দুধ গুড় ও নানাবিধ ফল-মূলমিশ্রিত নবান্ন খাইতে আরম্ভ করিল। বাড়ীর বৌ-ঝিরাও এক এক বাটী চাউল লইয়া রান্নাঘরের বারান্দায়, উননের ধোঁয়ায়, ভিজে চুলে পা মেলিয়া বসিয়া, নতমুখে সিক্ত তণ্ডুলরাশি চর্ব্বণ করিতে লাগিল। রাখাল, কৃষাণ ও পরিবারস্থ অনুগত ব্যক্তিগণ সকলেরই—নবান্ন হইয়া গেল, এমন কি, গ্রাম্য ভিখারিণীগণ ছোট ছোট ছেলে মেয়ে কোলে লইয়া ভিক্ষা করিতে আসিয়াও এই আনন্দরসের আস্বাদনে বঞ্চিত হইল না। যে সকল ছেলে মেয়ে জ্বর-প্লীহায় ভুগিতেছে—দুধ-বার্লি ভিন্ন ডাক্তার যাহাদিগের জন্য অন্য পথ্যের ব্যবস্থা করেন নাই, তাহারা পর্য্যন্ত দুটি চাউল মুখে দিয়া আজ নিয়মরক্ষা করিতেছে।

গ্রাম্যদেবতা গোবিন্দদেবের বাড়ীতে আজ নবান্নের প্রচুর আয়োজন। যে সকল গরীব দুঃখী অর্থাভাবে নবান্নের আয়োজন করিতে পারে নাই, কিংবা অশৌচাদিবশতঃ যাহাদের নবান্ন হয় নাই, তাহারা গোবিন্দদেবের প্রসাদ আনাইয়া সপরিবারে তাহাই মুখে দিতেছে।

আজ সকল বাড়ীতেই আহারাদির বিশেষ আয়োজন; পাঁচ তরকারী ঘি ভাত, ভাজা, বড়া, দুই তিন রকম ডাল, ভাল মাছ, গুড়-অম্বল, দৈ, পায়েস, কোন উপকরণই আজ বাদ পড়িবার যো নাই। গ্রামস্থ বৃদ্ধেরা হুঁকা টানিতে টানিতে দাবা ও পাশা খেলিতে বসিয়া গিয়াছেন, গড় গড় করিয়া হুঁকা ডাকিতেছে, বিসুবিয়সের ধূম-উদ্গিরণের ন্যায় কুণ্ডলীকৃত ধূম উটিতেছে; 'কিস্তী!' 'কচেবারো!' প্রভৃতি শব্দের বিরাম নাই। যুবক দল একটু আড়ালে বসিয়া সশব্দে তাস পিটিতেছে।

ছেলেরা সমস্ত দুপুরটা বাড়ীর বারান্দায়, চিলেকোটার ছাতে, অন্দরের বাগানে, গোয়ালঘরের অন্তরালে, লুকোচুরী খেলা শেষ করিয়া, বৈকালে দলে দলে দত্তবাগানে গিয়া জুটিল। একদল 'চামচু' খেলিতে আরম্ভ করিল। একজন 'বুড়ী' হইয়া বসিল, আর একজন তাহার মাথায় উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া মাথাটা দক্ষিণ হস্তে স্পর্শ করিয়া বুড়ীর পাহারায় নিযুক্ত হইল; ইতিমধ্যে বিপক্ষদলের একটি ছেলে এক দমে 'চু-উ-উ' শব্দে ছুটিয়া আসিয়া সকলকে তাড়া করিয়া বুড়ীকে মুক্তিদানের চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু পাছে ধরা পড়ে, এই ভয়ে বুড়ী উঠিতে সাহস করিল না। ধরা পড়িলেই তাহাদের দলের পরাজয়! কিন্তু বুড়ী যে দলে আসিয়া বসিয়াছিল, সেই দলের ছেলেরা 'মরিবার' ভয়ে বিপক্ষদলস্থ 'চু-উ' শব্দে ধাবমান বালকটীর স্পর্শ হইতে আত্মরক্ষার জন্য দূরে দূরে পলায়ন

করিতে লাগিল; 'বুড়ী' একবার ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিল, নিকটে কেহ নাই—তাহার পথ মুক্ত! সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে নিজের কোটে পলাইয়া গেল। বিপক্ষদলের কেহ কেহ তাহাকে স্পর্শ করিবার চেষ্টায় ছুটিয়াছিল; কিন্তু তাহারা পশ্চাতে যেমন শুনিল,—"চু-উ-উ-উ", অমনি চক্ষুর নিমিষে দূরে পলাইয়া বাঁচিলেও বুড়ী নিজের কোটে পা দিবামাত্র তাহাদের পরাজয় হইল।

মুক্ত প্রান্তরে আর একদল বালক দাণ্ডাগুলি লইয়া মত্ত হইয়াছে। 'গুবা'র 'গুলি'তে 'দাণ্ডা'র অগ্রভাগ সজোরে পতিত হইতেছে, গুলি লাফাইয়া উঠিতেছে, আর শূন্যেই তাহা দাণ্ডা দ্বারা পুনর্ব্বার প্রহত হইয়া বোঁ বোঁ শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে; দৈবাৎ গুলি ছুটিয়া গিয়া আম-গাছে পাতার মধ্যে বাধিতেছে, অমনি দাণ্ডাহস্ত ক্রীড়ামত্ত বালক সজোরে হাঁকিতেছে, "নেই ঝোড়োল!" অর্থাৎ, ঝোড়ে বাধিয়াছে, সুতরাং মাটী স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে সেই গুলি ধরিয়া ফেলিলে সেরূপ ধরা অগ্রাহ্য!

অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক একদল ছেলে 'হাডু-ডুডু' খেলার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। দুই দলের দলপতি 'মূল খেড়ু' অদূরে ঘাসের উপর বসিয়া গিয়াছে। আর দুই জন ছেলে একটু দূরে গিয়া পরামর্শ করিয়া এক একটি কল্পিত নাম পাতাইয়া আসিতেছে, এবং সহাস্যে 'মূল খেড়ু'-দের জিজ্ঞাসা করিতেছে, "কে নেবে রে হীরেমন, কে নেবে রে মরলা?" মূল খেড়ুদ্বয়ের মধ্যে যাহার সেইবার ডাকিয়া লইবার পালা, সে অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া, উভয়ের কৌতুকপ্রদীপ্ত চক্ষু ও হাস্য-তরঙ্গায়িত মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিয়া ফেলিতেছে, "আয় রে

আমার ময়না!" যাহাকে সে চায়, দৈবক্রমে সে-ই যদি 'ময়না' হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ উচ্চ হাসির রোল উঠে, তাহার সেই ক্ষুদ্রদলের মধ্যে আনন্দকোলাহলের তরঙ্গ বহিতে থাকে!

আজ এই মধুর হেমন্তের অবসানকালে নবান্নের দিন অপরাহ্ণে পল্লীপ্রান্তে হর্ষকলরব ও উৎসাহের অন্ত নাই! নদীতীরবর্ত্তী সুবৃহৎ ষষ্ঠীগাছের ছায়ায় আজ গ্রামস্থ রাখাল, কৃষাণ ও মজুরেরা সমবেত হইয়াছে, বর্ষব্যাপী কঠোর পরিশ্রমের পর আজ তাহাদের বিশ্রামের দিন; আজ কেহ কাজে যায় নাই। একদল সেখানে 'মালামো' করিতেছে, কেহ কেহ লাঠি খেলিতেছে, তিন চারিজন বাজি রাখিয়া সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্যস্থানে উপস্থিত হইবার আশায় প্রাণপণে ছুটিতেছে।—ক্ষুদ্র গোবিন্দপুরের প্রান্তভাগেও আজ আনন্দ উছলিয়া উঠিতেছে।

ক্রমে সন্ধ্যার লোহিত তপন নদীর পশ্চিমে দূরস্থ আমকাঁটালের বাগানের অন্তরালে অস্ত গেল; অন্ধকারের ছায়া-যবনিকা ধীরে ধীরে প্রকৃতির শ্যামল অঙ্কে প্রসারিত হইল।

মাটীর প্রদীপে গৃহস্থের গৃহ ও খদ্যোতের ক্ষীণ আলোকে তিমিরাচ্ছন্ন বন রমণীয় শোভা ধারণ করিল; পল্লীরমণীগণ নদীজলে গা ধুইয়া কলসী ভরিয়া জল লইয়া গল্প করিতে করিতে, এবং মধ্যে মধ্যে কৌতুকহাস্যে সান্ধ্য-অন্ধকারাবৃত ঝিল্লীরবমুখরিত সঙ্কীর্ণ বনপথ প্রতিধ্বনিত করিয়া গৃহে ফিরিল; ক্ষুধার্ত্ত বায়সের দল তীব্র চীৎকারে গগনভেদী অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া দ্রুতপক্ষে নীড়াভিমুখে ধাবিত হইল; বাদুড়েরা নিবিড়পত্র তেঁতুলশাখা ও বাঁশবন পরিত্যাগ করিয়া আহার-অন্বেষণে নিঃশব্দে মাথার উপর দিয়া উড়িয়া চলিল।

এমন সময় নেশাখোর বাউলের দল বাজারের সন্নিকটবর্ত্তী শিবমন্দিরের বারান্দায় বসিয়া ডুগি বাজাইয়া সমস্বরে—

"বাঁশের দোলাতে উঠে, কে হে বটে,
শ্মশানঘাটে যাচ্ছ চলে!"

মানবদেহের নশ্বরতাজ্ঞাপক এই "দেহতত্ত্ব"-বিষয়ক গান গায়িয়া শান্ত স্তব্ধ সুশীতল সন্ধ্যার মৌন-ব্রত ভঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

পোষলা

STATE LIBRARY.
18. NOV. 1924.
COOCH-BEHAR.

পোষলা

বনভোজনের প্রথা একালের সভ্য সমাজেও প্রচলিত আছে। এই বনভোজন ব্যাপারই আমাদের পল্লী সমাজে 'পোষলা' নামে প্রথিত। বঙ্গপল্লীসমূহে এই বনভোজন পৌষ মাসেই অনুষ্ঠিত হয়; পল্লী অঞ্চলে অন্য সময়ে বনভোজনের প্রথা প্রচলিত নাই।

প্রকৃতপক্ষে পৌষ মাসই পোষলার উপযুক্ত কাল। এই সময়ে পল্লীসমূহে গৃহস্থগৃহে খাদ্যদ্রব্যের অভাব থাকে না। আকাশ নির্ম্মল, সূর্য্যের সমুজ্জ্বল কিরণ প্রীতিকর, এবং তরুলতাবেষ্টিত কাননভূমি যেমন সুদৃশ্য, তেমনই সুপরিচ্ছন্ন। অন্তঃপুরের বৈচিত্র্যহীন চির-অভ্যস্ত পাকশালায় যথানিয়মে প্রতিদিন আহার করিতে করিতে অতৃপ্তি জন্মে। অন্তঃপুরের ক্ষুদ্র পাকগৃহ পরিত্যাগ করিয়া একবার প্রকৃতিজননীর মুক্ত প্রাসাদদ্বারে আতিথ্য-গ্রহণের জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠে! সেকালে বালক, যুবক ও বৃদ্ধ,—অতি অল্প লোকেই এ উচ্ছ্বাস দমন করিতে পারিত; একালে জীবন-সংগ্রামের তাড়নার আতিশয্য সত্ত্বেও এই ভাবটি এখনও পল্লীসমাজ হইতে অন্তর্হিত হয় নাই।

বৎসরের মধ্যে এই সময়েই পল্লীগ্রামে খাদ্যসামগ্রী স্বচ্ছল থাকে। তাহার যথেষ্ট কারণও আছে। ধান 'কাটাই' 'মাড়াই' হইয়া গোলায় উঠিতেছে; অনেকেরই বাড়ীতে খেজুরে গুড়ের 'ঝাইন',—নিত্য নূতন খেজুরে গুড়ে হাঁড়ি কলসী পূর্ণ হইতেছে; ক্ষেতে অড়হর, গম,

ছোলা, মটর প্রভৃতি রবিশস্য আশাপ্রদ। সকলের গৃহেই অপর্য্যাপ্ত তরকারী; সামান্য একখানি কুটীরে যাহার বাস—তাহারও কুটীরখানির পাশে কয়েকটি সতেজ বেগুনগাছে কালো কালো বেগুন ঝুলিতেছে; সম্মুখে দুই হাত জমিতে পালঙ্ শাক লক্‌লক্ করিতেছে; শিম ও লাউর শ্যামল লতা কুটীরের চালখানি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে; একটু খুঁজিলেই দুই একটা কচি লাউ ও আট দশ গণ্ডা 'আল্‌তাপাতি' শিম পাওয়া যায়; কানাচের সজিনা গাছে থোকা থোকা সজিনা ফুল! মেটে আলু, শাদা ও লাল আলু, মূলো, কচু, বেগুন, পেঁয়াজের কলি প্রভৃতি নানাবিধ তরকারীতে বাজার পূর্ণ,—যেমন টাট্‌কা, তেমনই সুলভ। বাজারে বিল খাল হইতে নানাজাতীয় মাছেরও আমদানী হয়;—বড় বড় কৈ, মাগুর, দীর্ঘপদ কৃষ্ণকায় 'গল্লাচিংড়ি' তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বাগ্দিনীরা সকালবেলা গৃহস্থবাড়ীতে ছোলা মটরের শাক ও তারামণির ফুল ঝোড়া বোঝাই করিয়া বিক্রয় করিতে আসে, এবং আধ পয়সার চাউলের বিনিময়ে যতগুলি শাক বা ফুল দিয়া যায়, তাহা একটি বৃহৎ পরিবারের পক্ষেও যথেষ্ট। তথাপি যে সকল পল্লীবাসী সহরাঞ্চলসুলভ শীতের শ্রেষ্ঠ তরকারী কপি কড়াইসুঁটীর জন্য দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করেন, তাঁহারা পল্লী-জননীর নিতান্ত অকৃতজ্ঞ সন্তান!

পৌষ মাস পড়িবামাত্র ছোট ছোট ছেলেরা পর্য্যন্ত পোষলার আয়োজন আরম্ভ করে। পাঠশালায় গুরুমহাশয় আসিবার পূর্ব্বে, স্কুলে টিফিনের অবকাশে, বৈকালে খেলা করিবার মাঠে, এমন কি, রাত্রে আহারাদির পর বিছানায় শুইয়াও, এই গুরুতর বিষয়ের পরামর্শ চলে! দিন স্থির করিতে তত বাদানুবাদ হয় না, কিন্তু স্থান স্থির করিতে তাহারা

যে আন্দোলন উপস্থিত করে, লাট-সভার বজেটের আলোচনাও তাহার তুলনায় নিতান্ত সঙ্ক্ষিপ্ত! প্রথমে কেহ হয় ত গ্রামের সন্নিকটবর্ত্তী কোন মাঠের নাম করিল; আর তিন জন তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "ও রকম 'জল-টানা' মাঠে কি পোষলা করা চলে?" তখন হয় ত আর একটা মাঠের নাম হইল। তাহার নিকটে জলাশয় আছে বটে, কিন্তু সেখানে নিবিড়বৃক্ষচ্ছায়াসমাচ্ছন্ন নেপথ্যের বড় অভাব। মধ্যাহ্নকালে রন্ধন ও আহারাদি ফাঁকা জমীতে চলিতে পারে না। অনেক তর্কবিতর্কের পর বসন্তপুরের মাঠই পোষলার প্রশস্ত স্থান বলিয়া স্থির হইল। কারণ, তাহার নিকটেই একটি জলপূর্ণ দীঘি আছে, এবং 'জোড়া-বটগাছতলা' হইতে তাহার দূরত্বও অধিক নহে। রবিবারে উৎসবের দিন নির্দ্ধারিত হইল।

যে সকল গরীবের ছেলে বেশী পয়সা সংগ্রহ করিয়া বাজার হইতে জিনিসপত্র কিনিয়া ধুমধামে পোষলা করিতে না পারে, তাহারা সকলেই স্ব স্ব আহারের উপযুক্ত পরিমাণ চাল, ডাল, লবণ, তেল, বেগুন, আলু প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া নির্দ্দিষ্ট মাঠে উপস্থিত হয়। এতদ্ভিন্ন তাহাদিগকে দুই একটি পয়সা চাঁদাও দিতে হয়। এই পয়সা দিয়া মাছ, পায়েসের জন্য দুধ ও গুড় ইত্যাদি সামগ্রী ক্রীত হইয়া থাকে। নানা জনের নানা বর্ণের চাল ও নানাজাতীয় ডাল একত্র মিশিয়া তাহাদের খাদ্যদ্রব্যে এক নূতন আস্বাদন প্রদান করে।

এইরূপে চাল ডাল বাঁধিয়া ও মায়ের নিকট হইতে দুইটি করিয়া চারিটি পয়সা চাহিয়া লইয়া, বিপিন ও বিনোদ দুই ভাই রবিবার সকালে বন্ধুবর্গের সহিত বসন্তপুরের মাঠে পোষলা করিতে গেল।

দামিনী ও বিধু, বিনোদ বিপিনের ছোট। দামিনীর বয়স আট বৎসর, বিধুর বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র। সকালে দাদাদের সঙ্গে পোষলায় যাইতে না পাইয়া দুই ভাই বোন ভারি হাঙ্গাম বাধাইল! মা পুত্র কন্যা দুটিকে ভুলাইবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিলেন। বাক্স হইতে ফরাসী ছিটের একখানি পুরাতন দোলাইয়ের এক অংশ ছিঁড়িয়া ব্যাকুলা কন্যার বিবাহসম্ভাবিতা মেয়ের জন্য প্রদান করিলেন। বিপিনের এক বন্ধু তাহাদের বাড়ীর জগদ্ধাত্রী ঠাকুরের বিসর্জ্জনের সময় খানিক রাঙ্গতা তুলিয়া বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ বিপিনকে দান করিয়াছিল।—বিপিন সেই তুচ্ছ পদার্থ অমূল্য রত্নের ন্যায় সযত্নে রাখিয়াছিল;—দামিনীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাহার 'মেয়ের' গহনা গড়াইবার উদ্দেশ্যে সেই রাঙ্গতার কিয়দংশও তাহাকে অর্পণ করা হইল! বিধুকে অন্য দিন অপেক্ষা অনেক বেশী 'সরাগুড়'সহ মুড়ি দেওয়া হইল; কিন্তু তাহারা পোষলার ঝোঁক ছাড়িল না।

বেলা অধিক হইয়া উঠিল। রাখাল গোয়ালঘর হইতে গরু বাহির করিয়া মাঠে চরাইতে লইয়া গেল। দুই একটি ভিখারিণী পিতলের চক্‌চকে টুক্‌ণী হাতে লইয়া "রাধাকৃষ্ণ! চাট্টি ভিক্ষা পাই গো মা জননী!" বলিয়া গোময়লিপ্ত অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইল। বাগ্দিনী ঝুড়ি-বোঝাই শাক আনিয়া "ছোলার শাক নেবে গো মা ঠাক্‌রুণ!" বলিয়া বাড়ীর ভিতর দিয়া অন্য বাড়ীতে প্রবেশ করিল। এমন সময় দত্তজের ন গিন্নি স্নানান্তে মুক্তকেশে শুভ্রবেশে একখানি হাতা হাতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "বৌমা! এখনও যে উনন জ্বালনি দেখ্‌ছি! আজ একবার সকাল সকাল খোলা জ্বাল্‌ব—মনে করচি।"—বিপিনের

মা বলিলেন, "না মা! আজ রবিবার, ইস্কুলের ভাতের ত তাড়াতাড়ি নেই, তাই এখনও উননে আগুন দিই নি; বিপিনেরা দু' ভাই আজ পোষলা কর্ত্তে গিয়েছে, এরা ভাই বোনে যেতে পায় নি বলে কেঁদে খুন! তা বল দেখি ঠাকরুণ, ওদের কি ক'রে তাদের সঙ্গে ছেড়ে দিই?" দত্তগৃহিণী বলিলেন, "তা এক কাজ কর না কেন? তোমাদের ঐ গোয়ালবাড়ীটাতে আজ ওদের পোষলা রেঁধে দাও, তা হ'লেই ওরা শান্ত হবে।"

বিপিনের মা ভাবিলেন, এ কথা মন্দ নয়! ছোট ছেলে মেয়ে দুটির জন্য তিনি গোয়ালবাড়ীতেই পোষলা রাঁধিবেন, স্থির করিলেন। গোয়াল-বাড়ীটি বেশ পরিষ্কার, ঝর্-ঝরে। এক দিকে গোয়ালঘর, অন্য দিকে ঢেঁকিঘর, তার পাশেই একখান লম্বা চালা। এই চালাতে না আছে, এমন জিনিস নাই!—কতকগুলি কাঠ, ঘুঁটে; গোটাকতক মাটীর কলসী, অধিকাংশই কাঁধা-ভাঙ্গা ও সচ্ছিদ্র; এক পাশে একটি ছোট বাঁশের মাচা, তাহার উপর দুই ছালা শিমুলের তুলো, কতকগুলো পাকাটি, চুকো শাকের বীজ আঁটি করিয়া বাঁধা, আধ কলসী পালঙ্ শাকের বীজ; আধখানা ভাঙ্গা জাঁতা, দু'খানি সুরকীমাখা বরগা ও খানদুই তিন ছেঁড়া চ্যাটাই; এবং এক কোণে একটা ইঁদুরের গর্ত্ত হইতে উৎক্ষিপ্ত এক রাশ ঝুরো মাটী!

গোয়ালবাড়ীর পাশেই বেগুন ও শাক সবজীর 'বেড়'। প্রাঙ্গণ-খানি ছায়াচ্ছন্ন; একটা ঝাঁকড়া কুলগাছ, একটা শিউলীগাছ, একটা বড় নিমগাছ ও গোটাকত পেয়ারা ও কাঁটালের অতিবৃহৎ চারা সমস্ত উঠানখানি ঢাকিয়া রাখিয়াছে; সকালে সূর্য্যদেব পূর্ব্বাকাশের কিছু

ঊর্দ্ধে উঠিলেই দূরস্থ দীঘির প্রান্তবর্ত্তী বাঁশঝাড়ের মাথার উপর দিয়া, নিম্বতরুর ব্যবধানপথে এই গোয়ালবাড়ীর মধ্যে তাঁহার সোণালী কিরণ বিক্ষিপ্ত হয়; কিন্তু মধ্যাহ্নে তাঁহার প্রখর করজাল বৃক্ষপত্র ভেদ করিয়া প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং এই গোয়াল-বাড়ীটিই শিশুদিগের জন্য পোষলা রাঁধিবার উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল।

কুলগাছের তলে একটি ছোট 'তিউড়ী' খুঁড়িয়া দামিনী ও বিধুর জন্য তাহাদের মা পোষলা রাঁধিতে বসিলেন। বেড়ের মধ্যে বেগুনগাছে কাল কাল বেগুন ও চালের উপর শিম ফলিয়াছিল; তাহাই তিনি তুলিয়া আনিয়া ভাজিয়া দিলেন। গাছ হইতে একটা পাতি লেবু তুলিয়া তদ্দ্বারা অম্বলের অভাব পূর্ণ করিলেন; কিন্তু ভাই বোনে পায়েসের জন্য বড়ই 'আব্দার' করিতে লাগিল, তাই বিপিনের মা বৃদ্ধা দাসী গোবরার মাকে শীতল ঘোষের বাড়ী হইতে আধ সের টাট্‌কা খেজুরে গুড় আনিতে বলিলেন। শীতল ঘোষ তাঁহাদের অনেকগুলি খেজুর গাছ 'কাটিয়াছিল'। প্রত্যেক গাছের জন্য গৃহস্থ দুই সের হিসাবে গুড় পাইয়া থাকে; যাহারা গুড় না লয়, তাহারা দুই সের গুড়ের মূল্যস্বরূপ দুই আনা পয়সা পায়। কিন্তু যাহারা ছেলে মেয়ে লইয়া সংসার করে, তাহারা পয়সার পরিবর্ত্তে গুড়ই লইয়া থাকে। বিপিনের মা-ও গুড় লইতেন।

গোবরার মা গুড় লইয়া আসিল। রাখাল বুধী গাইকে সকালে মাঠে চরাইতে লইয়া যাইবার আগে দুয়িয়া রাখিয়া গিয়াছিল। বিপিনের মা দুধের ভাঁড় হইতে আধ সের দুধ লইয়া, এক মুষ্টি আতপ চাউল ও টাট্‌কা খেজুরে গুড় দিয়া ছেলে মেয়েকে পায়েস রাঁধিয়া দিলেন।

দামিনী ও বিধু পোষলা করিয়া শান্ত হইলে, গৃহিণী সেই স্থানটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া স্নানের উদ্যোগে চলিলেন।

তখন খুব বেলা হইয়াছে। আর নদীতে স্নান করিতে যাইবার সময় নাই, তাই তিনি কূপ হইতে তাড়াতাড়ি দু' ঘড়া জল তুলিয়া মাথায় ঢালিয়া ভিজে চুলগুলি মাথার সম্মুখে চূড়াকারে বাঁধিয়া রান্নাঘরে চলিলেন। চুলঝাড়টা তাঁহার শুকাইবারও আর অবসর হইল না; কারণ, তিনি জানিতেন, বাড়ীর কর্ত্তাটির মনিব জমীদারের বাড়ী হইতে বুভুক্ষু অবস্থায় গৃহে ফিরিবার আর বিলম্ব নাই, মাঠ হইতে রাখাল কৃষাণদেরও ফিরিয়া আসিবার সময় হইয়াছে।

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের পোষলা এইরূপেই অনেক বাড়ীতে সম্পন্ন হইয়া গেল; কিন্তু বয়োবৃদ্ধদিগের পোষলার বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

মাসের অর্দ্ধেক অতীত হয় দেখিয়া বৃদ্ধ জমীদার রামকিঙ্কর চৌধুরীর পুত্র কৃষ্ণকিঙ্কর পোষলার আয়োজনার্থ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলেন! ইতিমধ্যে তাঁহার অন্যতম বয়স্য কার্য্যানুরোধে কলিকাতায় গেল; তাহাকে কপি, কড়াইশুঁটী ও কমলা লেবু প্রভৃতির বরাত দেওয়া হইল।

পাঁচ সাত দিনের মধ্যে এই সকল পল্লী-দুর্লভ তরকারী ও ফল আনীত হইলে কৃষ্ণকিঙ্কর পারিষদবর্গে পরিবৃত হইয়া পোষলা করিতে চলিলেন। তাঁহার দলে প্রায় পঞ্চাশ জন লোক। অনেক আমোদপ্রিয় পল্লীযুবকও সেই দলে জুটিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে রন্ধনের নানাবিধ সরঞ্জাম চলিল;— আধ মণ চাউল, প্রচুরপরিমাণ তৈল, ঘৃত, তরকারী, দুই তিন রকম ডাল, বাটা মশলা, বড় বড় কড়া, ভাত ডাল চালিবার পিতলের

ভেক্‌সী ইত্যাদি সঙ্গে চলিল। বেলা দশটার সময় নদীর পশ্চিম পারে মাধবপুরের ঘাটে নৌকা লাগিল। নৌকা তীরে লাগিবামাত্র আরোহিগণ ঝুপ্‌ঝাপ্‌ করিয়া নামিয়া পোষলার উপযুক্ত স্থানের আবিষ্কারে যাত্রা করিল। দুইজন পরিচারক জিনিসপত্র পাহারা দিতে লাগিল।

মাধবপুর গ্রামখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। নদীর পাড়ের ঠিক উপরেই দুই তিনখানি বড় বড় আটচালা ঘর, একটি মণ্ডলদের গোলাবাড়ী, সারি সারি গোলা, প্রাঙ্গণে তিন চারিটি উচ্চ নারিকেল গাছ, গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী নদীতীর হইতে এগুলি চিত্রের ন্যায় সুন্দর দেখায়। পাড়ের উপর শ্রেণীবদ্ধ ঝাউ ও দেবদারু; তাহাদের ঊর্দ্ধশাখায় বসিয়া নানাজাতীয় বিচিত্রবর্ণ পক্ষী কলরব করিতেছে;—দোয়েল গান ধরিয়াছে, শ্যামা শিষ দিতেছে, হল্‌দে পাখী 'বৌ-কথা কও'র অবিরাম ঝঙ্কারে কোনও অনির্দ্দিষ্টা, অভিমানিনী মৌনবতী পল্লীবধূর অভিমানভঙ্গের নিষ্ফল আশায়, আপনার কণ্ঠ ক্লান্ত করিয়া তুলিতেছে। নদীর ক্রমনিম্ন তীরদেশে সাদা কালো ছাগলের দল মাথা নীচু করিয়া চরিয়া বেড়াইতেছে; একটা অস্থিচর্ম্মসার কুকুর দীর্ঘ ঘাসের আড়ালে বসিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া নতমুখে একখানি হাড় চিবাইতেছে; নদীর কিনারায় সবুজ শৈবালরাশির মধ্যে সম্মুখের দুই-পা-বাঁধা একটা ঘোড়া লাফাইয়া বেড়াইতেছে, মধ্যে মধ্যে মুখ নামাইয়া কি খাইতেছে; দূরে দূরে দুই তিনটা ডাহুক ও জলপিপি সুদীর্ঘপদে দামের উপর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। নদীর অপর পারে একজন ধোপা এক হাঁটু জলে দাঁড়াইয়া পাটের উপর ময়লা কাপড় আছ্‌ড়াইতেছে, তাহার সঙ্গিনী দুইটি রঙ্গিনী সদ্যোধৌত কাপড়ের দুইপ্রান্ত ধরিয়া ঘাসের উপর মেলিয়া দিতেছে, এক

একবার হাঁড়ীতে করিয়া জল লইয়া সেই কাপড়গুলির উপর ছড়াইয়া দিতেছে। একটু দূরে কতকগুলি গরু চরিতেছে। নদীতীরস্থ একটা ইঁটের পাঁজার কাছে দাঁড়াইয়া দুইজন রাখাল পাল্লা দিয়া নদীজলে ঢিল ছুড়িতেছে;—কাহার নিক্ষিপ্ত ঢিল বেশী দূরে যায়, তাহারা ইহারই পরীক্ষায় ব্যস্ত,—এ দিকে তাহাদের দুই একটা গরু চরিতে চরিতে দল ছাড়িয়া ধোপার কাপড়ের উপরে গিয়া পড়িতেছে, আর ধোপার ছয় বৎসরের একটি চাদর-পরা ছেলে বামহস্তে একটা প্রকাণ্ড পেটমোটা ডাবা হুঁকা ও দক্ষিণ হস্তে চিতের ডাল লইয়া গরু তাড়াইতে যাইতেছে।

মাধবপুর পল্লীর অদূরে একটা প্রকাণ্ড বাগান। সেই বাগান পোষলার উপযুক্ত স্থান বলিয়া বিবেচিত হইল। বাগানটি ছায়াপূর্ণ, আবর্জ্জনাবর্জ্জিত, নদী হইতেও দূরবর্ত্তী নহে। এই বাগানে আম, তেঁতুল, কথবেল, চাল্‌তা ও লিচু গাছেরই সংখ্যা অধিক; অন্যান্য গাছও অনেক আছে। একটা প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছের নীচে তিন চারিটা বড় বড় 'তিউড়ী' খোঁড়া হইল। যুবকের দল বৃক্ষশাখায় সাদা, লাল ও হল্‌দে রঙ্গের শীতবস্ত্র ঝুলাইয়া, জুতা ছাড়িয়া, কেহ তরকারী কুটিতে, কেহ চাউল ধুইতে, কেহ কাঠ কাটিতে, কেহ বা উনান জ্বালিতে প্রবৃত্ত হইল। চারিদিকে সকলেই শশব্যস্ত। হাস্যকলরোলে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত—যেন কতকগুলি লোক এই শান্ত সুন্দর অরণ্যভূমিতে মৃগয়া করিতে আসিয়াছে! দূরে বাঁশঝাড়ের অন্তরালে ঘুঘুর দল এই কলরবের প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখাইয়া গলা ফুলাইয়া মাথা নোয়াইয়া 'ঘু-ঘু-ঘু' শব্দে উচ্ছ্বসিত প্রণয়াবেগ প্রশমিত করিতেছে। জামরুল গাছের ডালে

একটা কাঠঠোক্‌রা ঠক্‌-ঠক্‌ করিতেছে, আর অদূরে একটা কদম্বের আগ্‌ডালে একটা চিল বসিয়া রোদ পোয়াইতেছে, এবং মধ্যে মধ্যে অতি করুণ তীব্রস্বরে শীতকাতর জীবনের দুঃসহ বেদনা ও বৈচিত্র্য-হীনতার পরিচয় দিতেছে।

কৃষ্ণকিঙ্কর বাবুর অনুগত দুই চারিজন ব্রাহ্মণযুবক রন্ধনকার্য্যে বিশেষ দক্ষ। সকল বিষয়েই তাহারা ধনুর্দ্ধর! গাঁজা টানিতে, মদ খাইতে, মারামারি করিতে, অপরাধে বা নিরাপরাধে বাবুর জুতা খাইতে, এবং বাবুর প্রসন্নতালাভকালে প্রহারের সুদ ও আসল পোষাইয়া রসগোল্লা গিলিতে অত্যন্ত মজবুত! সকাল নাই, বিকাল নাই, দুপুর নাই, সন্ধ্যা নাই, সকল সময়েই তাহারা গোবিন্দপুরের রাস্তায়, নদীর ধারে, পুকুরের পাড়ে, গৃহস্থের বাগানের প্রান্তবর্ত্তী সরু গলিপথে ঘুরিয়া বেড়ায়; পরিধানে চওড়াপেড়ে কাপড়, পায়ে সদ্যোত্রস জুতা, গায়ে কামিজ বা কোট, কখনও তাহার উপর কোঁচান চাদর, কখনও র‍্যাপার; কাহারও হাতে ছাতা, কাহারও হাতে ছড়ি,—কি উদ্দেশ্যে কোথায় চলিয়াছে, সর্ব্বজ্ঞের প্রপিতামহও তাহা বলিতে পারেন না! কিন্তু কৃষ্ণকিঙ্কর বাবুর এই সকল কিঙ্করের গতি ত্রস্ত, মুখের ভাব ব্যস্ত, চক্ষু সর্ব্বত্রগামী! দেখিয়া মনে হয়, কোনও ধনবানের বংশধর বুঝি পিতার অগণিত অর্থে আপনাদিগের তীক্ষ্ণ বিষদন্ত ক্ষয় করিতেছে! কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাদের কাহারও চাল চুলা নাই। গ্রামের ছাত্রবৃত্তি স্কুলে পঞ্চম বা ষষ্ঠশ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়া সরস্বতীর সঙ্গে বিবাদ করিয়া ইহারা লক্ষ্মীর বরপুত্র কৃষ্ণকিঙ্করের তৈলাক্ত স্কন্ধে ভর করিয়াছে;—এ দিকে তাহাদিগের দুঃখিনী মাতা পৈতা কাটিয়া কিংবা কোনও অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকের

বাড়ীতে প্রাচিকার কাজ করিয়া অতিকষ্টে দিনপাত করিতেছেন! ইহাদিগকে পথে দেখিয়া ছোট ছোট ছেলেরা খেলাধুলা ছাড়িয়া রাস্তা হইতে দূরে পলাইয়া যায়; পল্লীর গৃহস্থযুবতীর দল সভয়ে ঘোমটা টানিয়া পথ হইতে দশ হাত তফাতে দাঁড়ায়। গাছীরা খর্জ্জুররসসঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে খেজুরগাছে 'ঠিলি' বাঁধিতে উঠিয়া দৈবাৎ ইহাদিগকে দেখিতে পাইলে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে, এবং রস চুরী যাইবার ভয়ে ঠিলির মধ্যে পর্য্যাপ্তপরিমাণে মানকচু রাখিয়া দেয়; কিন্তু 'নষ্টস্য কান্যা গতিঃ'? সন্ধ্যার পর ইহারা পাঁচ সাত জনে মিলিয়া রস চুরী করিতে গিয়া যখন দেখিতে পায়, সকল ঠিলির মধ্যেই মানকচু চাকা চাকা করিয়া কাটা রহিয়াছে, তখন নৈরাশ্যে ক্রোধে অধীর হইয়া ঠিলিগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া গৃহে প্রস্থান করে। প্রভাতে নির্ব্বোধ গাছী বুঝিতে পারে, ঠিলিতে মানকচু না দেওয়াই ছিল ভাল, রস চুরী যাইত বটে, কিন্তু ঠিলিগুলি ভাঙ্গিত না।

যাহা হউক, এই সকল 'আটপিঠে' 'দশকর্ম্মান্বিত' ব্রাহ্মণযুবক ও অন্য অনেকে বন হইতে কাঠ ভাঙ্গিয়া আনিল; খন্তা দিয়া মাটি খুঁড়িয়া উনন প্রস্তুত হইলে রন্ধনের যোগাড় করিতে লাগিল। বেলা অধিক হইয়াছে, এবং শীত কিছু কমিয়াছে দেখিয়া, তৈলচর্চ্চিতদেহে অনেকে স্নান করিতে গেল।

তখন বেলা বারোটা। গ্রামের গৃহস্থরমণীগণ সংসারের কাজ সারিয়া স্নান করিতে গিয়াছেন; নিশ্চিন্ত মনে স্নান করিতে করিতে তাঁহাদের মধ্যে কত গল্প, কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখদুঃখের কথা, কত হাসি, কত বেদনা-ভরা করুণকাহিনী আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই; ছোট

ছোট মেয়েরা সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া 'গামছা ছাকা' দিয়া মাছ ধরিতেছে ;— কোনও বার গামছা ভরিয়া গুগ্‌লি উঠিতেছে, কোনও বার শুধু বালি উঠিতেছে, আর তাহাদের কণ্ঠনিঃসৃত কৌতুকতরল সরল হাস্যে নদীতট প্রতিধ্বনিত হইতেছে! দুই তিন জন বৃদ্ধা জলের ধারে একখানা কাঠের গুঁড়ির উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া তেল মাখিতেছে, মাটী দিয়া মাথা ঘষিতেছে ; কেহ বা বালি দিয়া ঘড়া মাজিতেছে ; কয়েকটা বক নিম্নতটবর্ত্তী গুগুনী-সমাবৃত জলার উপর শনৈঃ শনৈঃ দীর্ঘ লঘুপদ নিক্ষেপ করিয়া আহারান্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

পোষলার দল নদীতে নামিয়া স্নান করিতে করিতে দেখিতে পাইল, নিতাই মাঝির মাছের নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিয়াছে ;—খালুয়ের ভিতর নানা রকম মাছ,—মোটা মোটা গল্লা চিংড়ি, মাঝারী রকমের কালবাউস, নৌচি, মিরগেল, বড় বড় খয়রা,—দেখিয়া বাবুদের মনে যৎপরোনাস্তি লোভের সঞ্চার হইল। তাহারা খালুই সমেত সমস্ত মাছ পোষলার কাছে লইয়া গেল। নিতাই মাঝি বাবুদের অনুসরণ করিল। তাহার পুত্র বাঁশী দাঁড়ের উপর জালখানি ঝুলাইয়া গৃহে চলিল। কৃষ্ণকিঙ্কর বাবু গ্রামের বাজারে মাছের সন্ধানে লোক পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন, কিন্তু উপস্থিত ত্যাগ করা যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান করিলেন না ; বিশেষতঃ, মাছগুলি খুব টাট্‌কা। বাবুদের মাছের দরকার অত্যন্ত বেশী, এ কথা বুঝিতে পারিয়া নিতাই খালুয়ের সমস্ত মাছের দাম দুই টাকা চাহিল ; কিন্তু অবশেষে বারো গণ্ডা পয়সাতেই সমস্ত মাছ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল। যদিও এইরূপে সমস্ত মাছ 'থাওক' বেচিয়া তাহার কিছুই লাভ হইল না, কিন্তু উপায় কি? কৃষ্ণকিঙ্কর বাবু জমীদার, তিনি ইচ্ছা

করিলে এক দিনে নিতাইকে 'ভিটে'ছাড়া করিতে পারেন। যাহা হউক, এত লোকসান দিয়াও সে ভরসা করিল যে, এবার বাবুকে ধরিয়া তাহার বাড়ীর কাছের আম-কাঁটালের বাগানখানি কিছু কম টাকায় জমা করিয়া লইবে।

রান্নাবান্না সমস্ত শেষ হইলে হঠাৎ দেখা গেল, একটা জিনিসের বড় অভাব রহিয়া গিয়াছে, তাড়াতাড়িতে পেঁয়াজ আনা হয় নাই! নৌকা করিয়া নদী পার হইয়া গ্রামের বাজার হইতে পেঁয়াজ আনিতে অনেক বিলম্ব হইতে পারে, হয় ত তত বেলায় সব্জীরা দোকান তুলিয়া বাড়ী চলিয়া গিয়াছে,—ভাবিয়া, এক জন মোসাহেব তখনই সব্জীপাড়ার দিকে ছুটিল; এবং আধ ঘণ্টার মধ্যে এক কোঁচড় পেঁয়াজ ও আদঝুড়ি পেঁয়াজের কলি লইয়া উপস্থিত হইল। "রামকান্ত বড় যোগাড়ে ছোকরা!" বলিয়া সকলে তাহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল! রামকান্তও আত্মপ্রসাদে স্ফীত হইয়া দংষ্ট্রাপংক্তি বিকাশ করিয়া বলিল, "আমাদের বাবু হুকুম হ'লে কি না কর্‌তে পারি? দুপুর রাতে বাঘের দুধ আন্‌তেও এ শর্ম্মা অক্ষম নয়!" কিন্তু তৎকালে 'ব্যাঘ্রদুগ্ধে'র আবশ্যক না হওয়ায় রামকান্তের এই বাহাদুরী পরীক্ষা করিবার কাহারও অবসর হইল না। বিশেষতঃ, তখন বেলা তৃতীয় প্রহর অতীতপ্রায়। একটি তিউড়ীর উপরে একখান প্রকাণ্ড কড়াইয়ে পায়েস চড়িয়াছে, টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছে, আর একটা টুলের উপর গামছা-কাঁধে এক জন লোক প্রকাণ্ড একখানা হাতা দিয়া নূতন খেজুরে গুড় ও আতপ-চাউল-মিশ্রিত সেই লোহিতাভ দুগ্ধরাশি আলোড়িত করিতেছে। অন্যান্য সকলের দৃষ্টি সেই দিকে সন্নিবদ্ধ; কেবল একটু দূরে একটা আমগাছের ছায়ায় বুড়ী

দল ছেলে 'দাণ্ডাগুলি' খেলিতেছিল, এবং আরও খানিক দূরে বৃক্ষাদি-বর্জ্জিত, রৌদ্রতপ্ত, 'উকুনে'-পূর্ণ মাঠের মধ্যে কতকগুলি অধিকবয়স্ক বালক মহা উৎসাহে ব্যাট্‌বল খেলায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

বেলা প্রায় চারিটার সময় মিষ্টান্ন ও দধি লইয়া ময়রা ও গোয়ালা পোষলা-ক্ষেত্রে আসিয়া হাজির হইল। ময়রা 'আধাছানা'র সন্দেশ যত দূর উৎকৃষ্ট হইতে পারে, তাহার চেষ্টার ত্রুটি করে নাই; গোপবৃদ্ধও 'শুক্কোদই' পাতিবার সমস্ত অব্যর্থ কৌশল বর্ত্তমান ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছিল; কিন্তু সন্দেশ ও দধি দেখিয়া গদাধরপ্রমুখ কৃষ্ণকিঙ্কর বাবুর বয়স্যবর্গ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, এ সন্দেশ গোয়ালপাড়ার দিক দিয়াই যায় নাই! আর যে দই, ইহাকে 'শুকো' বলিলে কাহাকে 'রাশি' উপাধি দেওয়া যাইতে পারে, তাহা তাঁহারা বিস্তর গবেষণা দ্বারাও নিরূপণ করিতে অক্ষম! গোয়ালা ও ময়রা উভয়েই তাহাদের এত যত্নের দই সন্দেশের এইরূপ নির্দ্দয় সমালোচনা শুনিয়া, স্বগতভাবে এই পরপ্রত্যাশী চাটুকার-পুঙ্গবগণের উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের জন্য যে খাদ্যের ব্যবস্থা করিল, তাহা শত্রুর উদ্দেশেই সচরাচর উৎসৃষ্ট হইয়া থাকে, এ পর্য্যন্ত কখনও খাদ্যদ্রব্যের তালিকাভুক্ত হয় নাই!

রন্ধন শেষ হইলে সারি সারি পাতা পড়িল। ছেলেরা দাণ্ডাগুলি ও ব্যাট্‌বল ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিয়া সারি বাঁধিয়া আহারে বসিয়া গেল। কয়েক জন পরিবেশক ভিন্ন সকলেই ভোজনে যোগ দিল। ধীরে ধীরে আহার শেষ করিতে বেলা শেষ হইয়া আসিল।

জবারক্ত তপনদেব বাগানের অন্তরালে পশ্চিম আকাশপ্রান্তে ঢলিয়া পড়িলেন। বাগানের অসমোচ্চ বৃক্ষশ্রেণীর দীর্ঘ ছায়া মাঠের উপর

পড়িয়া, ক্রমে দীর্ঘতর হইয়া, মিলাইয়া গেল। শেষে গোধূলির ছায়া জল স্থল আচ্ছন্ন করিল। পোষলার দলস্থ সকলে মোটা কাপড়ে সর্ব্বশরীর ঢাকিয়া নৌকায় উঠিল।

যখন গোবিন্দপুরের ঘাটে আসিয়া নৌকা লাগান হইল, তখন অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছে, আকাশে অনেক নক্ষত্র ফুটিয়াছে, বাগানে পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মধ্যে খদ্যোতের ক্ষীণ আলোক মিট্-মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে, এবং নদীর অপরপারস্থ বাগানের অভ্যন্তরবর্ত্তী বুনো-পাড়ার মৃৎপ্রদীপের মৃদু আলোক ম্লান নক্ষত্রালোকবৎ প্রতীয়মান হইতেছে।

পারঘাটের কাছে বটগাছের নীচে নৌকা লাগিল। তখন পার-ঘাটের খেয়া নৌকায় 'মসক'-পূর্ণ একগাড়ী গুড় নদী পার হইতেছিল। অদূরবর্ত্তী গৌরদাস বাবাজীর আখড়া হইতে খোল করতালের মিশ্রধ্বনি উঠিয়া আসন্ন কীর্ত্তনের আভাস জ্ঞাপন করিতেছিল; এবং পারঘাটের ধারে শিমুলগাছের নীচে মাঝিদের অন্ধকারময় শয়নকুটীর হইতে খেয়া-নৌকার মাঝি গায়িতেছিল,—

"বেলা গেল, সন্ধ্যে হ'ল, পার কর আমারে!"

অন্ধকারপূর্ণ স্তব্ধ সায়াহ্নে নদীপ্রান্তবর্ত্তী কুটীরশায়ী নিরক্ষর গায়কের এই তাললয়হীন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, এবং তাহার প্রত্যেক ঝঙ্কারে হতাশের শ্রান্ত হৃদয়ের অস্ফুট বেদনার করুণ ধ্বনি, বিষণ্ণ সৌম্য সন্ধ্যার বিদায়-বাণীর ন্যায়, শ্রোতার সমবেদনা ও দীর্ঘনিশ্বাস আকর্ষণ করিতে লাগিল।

এমন সময় মনোহরগঞ্জের ডাকহরকরা অনেক দূর হইতে চীৎকার করিয়া বলিল, "মাঝি, নৌকা বাঁধো।"

গান বন্ধ করিয়া নীলমণি মাঝি ব্যস্ত ভাবে ডাকের নৌকা ঘাটে লইয়া আসিল। ঝম্ ঝম্ করিয়া ঘুঙুর বাজাইয়া ডাকহরকরা নৌকায় উঠিয়া ডাকের বোঝাটা নৌকার ফরাসের উপর ফেলিল, তাহার পর বলিল, "ইঃ!—বড্ডা জাড়! নীলুদাদা! কল্‌কেটা কোথায় গো!"

তামাক সাজিয়া ডাকহরকরা টিকে ধরাইবার জন্য চক্‌মকি ঠুকিতে লাগিল; এ দিকে পোষলার দল জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন গলি-পথ দিয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল।

পৌষ-সংক্রান্তি

পৌষ-সংক্রান্তি

পৌষ মাসকে পল্লীরমণীরা 'লক্ষ্মী মাস' বলিয়া মনে করেন। কোন রমণীই পৌষ মাসে স্বামীগৃহ হইতে পিতৃগৃহে বা পিতৃগৃহ হইতে স্বামী-গৃহে গমন করেন না। এমন কি, কোনও দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়া যদি সে সময়ে গৃহে থাকেন, তবে তাঁহাকেও কোন গৃহস্থ পৌষ মাসে বিদায় দিতে সম্মত হয় না।

আমন ধান কাটা-মাড়া আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যেক গৃহস্থের খামারে, বাড়ীর প্রাঙ্গণে সুপক্ক ধান্য-শীর্ষ স্তূপাকারে পালা দেওয়া রহিয়াছে; কৃষাণগণ দশ বারোটা বলদ রজ্জুবদ্ধ করিয়া হুঁকা টানিতে টানিতে, বলদগুলির লেজ মলিতে মলিতে, তাহাদিগকে ধানের পালার উপর ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে, পিঠে পাঁচনের বাড়ি মারিতেছে; কেহ 'কাঁদাল' দিয়া ধানের আঁটি উল্টাইয়া দিতেছে, কেহ কুলায় করিয়া ধান ছড়াইয়া তাহার 'চিটা' ও ধূলামাটী উড়াইয়া দিতেছে; ফকীর বোষ্টমেরা 'গোপীযন্ত্র' ও মন্দিরা বাজাইয়া গান করিয়া কৃষাণদের নিকট দুই এক 'পাথি' ধান ভিক্ষা লইয়া যাইতেছে; মাথা-তামাক-বিক্রেতারা 'খোলা'র খোলায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এবং দুই ছিলিম তামাক দিয়া আধ সের ধান উপার্জ্জন করিতেছে! চারি দিকেই সজীবতার হিল্লোল বর্ত্তমান; যেন দেবী কমলা তাঁহার কমলাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক ধান্যের 'আড়ি' কক্ষে লইয়া বঙ্গের গৃহে গৃহে অন্ন বিতরণ করিতেছেন।

পৌষ মাসের শেষ দিবসে এই কঠোর পরিশ্রমের দৃশ্য সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়; সে দিন সাধারণ শ্রমজীবিগণ আমোদ আহ্লাদেই সময় অতিবাহিত করে।

৩০এ পৌষের প্রভাত হইতে না হইতেই পল্লীবাসী গোয়ালা, কৈবর্ত্ত, জেলে, বাগ্দী প্রভৃতি শ্রমজীবিগণের ছেলেরা তাহাদের 'আনকোরা' ধুতি চাদরে সজ্জিত হইয়া দলে দলে ভিক্ষায় বাহির হইল। এ তাহাদের সখের ভিক্ষা! প্রত্যেক দলে এক জন একটা ধামা লইয়া চলিয়াছে, আর দলস্থ অবশিষ্ট সকলের হাতে এক একগাছি কঞ্চি। এই কঞ্চি বহুসংখ্যক সুপক্ক টাট্‌কা লাল লঙ্কামরিচে পরিবেষ্টিত, সূতা দিয়া সেগুলি কঞ্চির সঙ্গে বাঁধিয়া দিয়াছে। ইহারা এক এক গৃহস্থের বাড়ীতে প্রবেশপূর্ব্বক সুর করিয়া বলিতেছে,—

"হরিবোল হরিবোল,
সোনা রায়ের ভার এল বাড়ীর ভিতর।
বল ভাই শিবো,
এক কাঠা চাল ন'টা বড়ি নিবো॥"

সকলে সমস্বরে এই ছড়া বলিয়া ভিক্ষা আদায় করিতেছে। শুধু তাহাই নহে, ছড়ার ভাষায় তাহারা সরলা গৃহস্থমহিলাদিগকে ভয়-প্রদর্শন করিতেও বিরত হইতেছে না! তাহারা কোমল শিশু-কণ্ঠে অসঙ্কোচে দৈববাণী করিয়া যাইতেছে,—

"যে দেবে ছালা ছালা,
তার হ'বে সাত গোলা।
যে দেবে কাঠা কাঠা,

তার হ'বে সাত বেটা।
যে দেবে বাটী বাটী,
তার হ'বে সাত বেটী।
যে দেবে মুটো মুটো,
তার হ'বে হাত ঠুঁটো!"

শুনিয়া রমণীগণ হাসিয়া তাহাদিগকে মুটো মুটো চাউল দিয়াই বিদায় করিতেছেন। কেহ বলিতেছেন, "সাত বেটী হওয়ার চেয়ে হাত ঠুঁটো হওয়া ঢের ভাল! বেয়ান মাগীর মন ত কিছুতেই পাওয়া যায় না, তা ছাড়া জামাইগুলির কেহ মদ, কেহ গাঁজা, কেহ বা গুলিতে মত্ত হ'য়ে সমস্ত জীবনটা ভাজা ভাজা করে মারে। হাত ঠুঁটো হ'লে এত যন্ত্রণা সইতে হয় না।"

সকালে ছেলেরা এইরূপে ভিক্ষা লইয়া চলিয়া গেল। বেলা অধিক হইলে মুসলমান শ্রমজীবিগণ টুপি মাথায় দিয়া, গলায় রুমাল বাঁধিয়া, মাণিকপীরের গান গায়িতে গায়িতে ধামা-হাতে দলে দলে গৃহস্থগৃহে উপস্থিত হইল, এবং গৃহস্থের সদর দরজায় আসিয়া ঢোল ও কাঁশী বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া সুর করিয়া গায়িতে লাগিল,—

"ওরে ও কুবির ঘোষ! চিন্তে না পারিলে মাণিকপীর?
খড়ম পায়ে নড়ি হাতে ন্যাঙড়া ফকীর,
গোয়ালার 'বাথানে' এসে প্রথম জাহির!
'দই দুগ্ধ ক্ষীর ছানা যত আছে ঘরে,
আনিয়া হাজির কর পীরের দরবারে।'

কুবির ঘোষ দই দুগ্ধ নাহি আনি দিল,
নওয়া লক্ষি ধেনু তার বাথানে মরিল।"

গান শেষ হইবার পূর্ব্বেই পল্লীরমণীরা তাহাদের ধামায় এক এক রেকাবী চাউল ঢালিয়া দিয়া গেল। কিন্তু তাহারা শুধু চাউল লইয়াই ক্ষান্ত হইল না; চাউল, ডাল, বড়ি, বেগুন প্রভৃতি তরকারীর জন্যও আবদার আরম্ভ করিল। কোন কোন গৃহস্থ দয়াপরবশ হইয়া দুই একটি আধলা বা পয়সা ভিক্ষা দিল। পৌষ মাসের শেষ দিন সর্ব্বসাধারণের 'তিলুয়া'-ভক্ষণের ব্যবস্থা আছে; অপরাহ্নে স্নান করিয়া, ভিক্ষালব্ধ পয়সায় ময়রার দোকান হইতে 'তিলুয়া' কিনিয়া, ইহারা পীরের দরগায় সেই তিলুয়া শির্ণি দিল, তাহার পর বিভিন্ন দল ভিন্ন ভিন্ন মাঠে পোষলা করিতে গেল। সন্ধ্যার সময় তাহাদের আড়ম্বর-হীন বনভোজন সমাপ্ত হইল।

* * * * * *

আজ সকালে অনেকেই গুড়ের 'বাইনে' আসিয়া ধন্না দিয়াছে। পৌষ-সংক্রান্তি উপলক্ষে সকল বাড়ীতেই পিঠে পুলি আঁদোসার আয়োজন হইবে—গুড়ই তাহার প্রধান উপকরণ; সুতরাং আজ সকলেই খানিক টাট্‌কা খেজুরে গুড় সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছে।

পল্লী অঞ্চলে খেজুর গাছের অভাব নাই। এ সময় গোয়ালা, বাগ্দী ও কৈবর্ত্তেরা চারি পাঁচ জন একত্র হইয়া, শীতকালের কয়েক মাস শুধু খেজুরে গুড়েরই কারবার করে। খেজুর গাছ 'কাটা' হইতে রস জাল দিয়া গুড় করা পর্য্যন্ত সকল কাজই তাহারা স্বয়ং করিয়া থাকে; সুতরাং এই ব্যবসায়ে তাহাদের বেশ লাভ হয়। যেখানে রস জাল দিয়া গুড় প্রস্তুত হয়, তাহার নাম 'বাইন'। একটা বড় তেঁতুল-

গাছের তলায়, কিম্বা বাঁশ-ঝাড়ের আড়ালে বড় বড় উনন কাটিয়া প্রকাণ্ড এক একটা মাটীর পোড়ান 'খোলা'তে রস জ্বাল দেওয়া হইতেছে। 'বাইনের' চারি দিকে শুষ্ক খর্জ্জুরপত্রের 'টাটি'; আঙ্গিনাখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; তাহার এক পাশে কতকগুলা ভাঁট, আখাওড়া, কালকাসিন্দের শুষ্ক গাছ 'পালা' দেওয়া রহিয়াছে। গুড় জ্বাল দেওয়ার জন্য গাছিরা জঙ্গল হইতে সেগুলি কাটিয়া আনিয়া রাখিয়াছে; 'গাছ বাঁধিবার' ঠিলিগুলি দড়িগলায় চারি দিকে বিশৃঙ্খলভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। মোটা মার্কিনের অপ্রশস্ত মলিন চাদর গায়ে জড়াইয়া গাছীরা এক হাতে উননে 'জঙ্গল' ঠেলিয়া দিতেছে, আর এক হাতে ডাবা হুঁকা ধরিয়া, গাঁজার কিঞ্চিৎ মোলায়েম সংস্করণ—দা-কাটা ঘরে-মাখা তামাকে টান দিতেছে; চট্‌পট্‌ করিয়া উননে আগুনের শব্দ হইতেছে, কল্‌কল্‌ করিয়া রস ফুটিয়া উঠিতেছে, আর এক একবার তাহারা 'ওড়ং' দিয়া রসের 'গাদ' কাটিয়া নিকটবর্ত্তী একটা ঠিলির মধ্যে ফেলিতেছে, এবং নানারকম গল্প করিতেছে। গল্পের অধিকাংশই গুড়সম্বন্ধীয়,—কাহার পিতা ও পিতামহ গুড়ের কারবার করিয়া দুই শত টাকা রাখিয়া গিয়াছিল, কে কবে খেজুর গাছে উঠিতে গিয়া পা ফস্‌কাইয়া পড়িয়া 'জন্মের ভাত' খাইয়াছে, শেষরাত্রে ঠিলি খুলিতে গিয়া কে কতবার বাঘের হাতে পড়িয়াছে, এবং কে কতদিন সন্ধ্যাবেলা 'বাঁকের বাড়ি' মারিয়া রসলিপ্সু ঠিলিচোরের রসপিপাসা নিবারণ করিয়া দিয়াছে, ওজস্বিনী চাষার ভাষায় সেই সকল গল্প চলিতেছে; আর পাড়াপ্রতিবেশী গোয়ালা, কৈবর্ত্ত, মালো, চাঁড়াল, বাইতিদের ছেলেরা চারি দিকে বসিয়া অত্যন্ত তৃপ্তিভরে সেই সকল গল্প গিলিয়া যাইতেছে! এক একবার তাহারা হাসিয়া অস্থির হইতেছে,

এক একবার বা ভয়ে তাহাদের বক্ষের স্পন্দন পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া আসিতেছে!

বেলা প্রায় দশটার সময় গুড়জ্বাল দেওয়া শেষ হইয়া গেল। একটা খোলার গুড়ে 'সরাগুড়' বা 'গুড়মুচি' করিবার জন্য তাহাতে 'বীজ' মিশাইয়া ঘুঁটিয়া ঘুঁটিয়া সেই গুড় অপেক্ষাকৃত সাদা ও ঘন করিয়া তুলিল; তাহার পর বিশ পঁচিশটা ঠিলি দুই সারি করিয়া সাজাইয়া লম্বা দুখানা কাপড় দিয়া তাহাদের মুখ বাঁধিয়া সেই কাপড়ের উপর ঠিলির মুখে অল্পপরিমাণ গুড় ঢালিয়া 'সরাগুড়' প্রস্তুত করিল। পল্লীরমণীগণ ঘাটে যাইতে যাইতে ছেলে মেয়েদের সঙ্গে লইয়া 'বাইনে' উপস্থিত হইল, এবং কুটুম্ববাড়ী পাঠাইবার জন্য পুরু দেখিয়া 'সরাগুড়' পছন্দ করিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিল।

'সরাগুড়' প্রস্তুত হইয়া ডালায় উঠিলে, সমবেত চাষার ছেলেরা কেহ কচুর, কেহ কলার, কেহ বা কাঁটালের পাতা ছিঁড়িয়া ঠোঙ্গা প্রস্তুত করিয়া 'খোলা'র চারি দিক ঘিরিয়া দাঁড়াইল; তখন গাছীরা তাহাদের পাতায় একটু একটু গুড় উপহার দিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিল;—তাহারা সেই মধুর টাট্‌কা গুড়টুকু আস্বাদন করিতে করিতে বাইন ত্যাগ করিল। পল্লীবাসিগণও, যাহার যতটুকু গুড়ের দরকার, তাহা লইয়া চলিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে 'বাইন' জনশূন্য হইয়া পড়িল; শুধু ঠিলিগুলি প্রকাণ্ড উননের উপর স্তূপাকারে অধোমুখে পড়িয়া উত্তপ্ত হইতে লাগিল।

মধ্যাহ্ন হইতেই রমণীগণের মধ্যে 'পৌষ-বাউড়ী'র আয়োজন পড়িয়া গেল। বিধবাগণ স্নান করিয়া আসিয়া কেহ গ্রাম্য বিগ্রহের

মন্দিরে, কেহ কালীবাড়ীতে এক আধ পোয়া—যাঁহার যাহা সাধ্য, তিলুয়া পাঠাইয়া দিলেন, তাহার পর সকলে গামলাতে আতপ চাউল ভিজাইয়া 'আতাল' পাতিলেন। চাউল অল্প ভিজিলে তাহা জল হইতে ছাঁকিয়া তুলিয়া কুটিবার জন্য ঢেঁকিঘরে লইয়া যাওয়া হইল। প্রথমে ঢেঁকির 'নোটে'র কাছে সেই চাউল সাতবার ছড়াইয়া দিয়া তবে ঢেঁকিতে পাড় দিতে আরম্ভ করা হয়; ইহাকেই 'আতাল' পাতা বলে। পৌষ-সংক্রান্তির দিন মধ্যাহ্নে সকল বাড়ী হইতেই ঢেঁকির শব্দ উঠিয়া গ্রামখানিকে প্রতিধ্বনিত করিতে থাকে। এই দিন গ্রাম্য বাজারে অসংখ্য মাটীর 'সরা' ও 'মুচি' বিক্রয় হইতে আসে; পিঠে ভাজিবার জন্য সকলেই আগ্রহসহকারে এক এক জোড়া 'সরা' ও 'মুচি' কিনিয়া লইয়া যায়।

দুপুরের সময় প্রায় কোনও বাড়ীতেই ভাতের আয়োজন হয় না। যাঁহাদের বাড়ীতে দু' বেলা গরম ভাত না হইলে চলে না, ছেলেপিলে রোগা, এবং কর্ত্তাটি গরম গরম ভাত ও 'ময়া' মাছের ঝোল ভিন্ন আর কিছুই পরিপাক করিতে পারেন না, শুধু তাঁহাদের বাড়ীতেই এবেলা ভাত রান্না হইতেছে। অনেক বাড়ীতেই আজ ছেলেমেয়েদের জন্য 'তিলজাউ' হইতেছে। তিলজাউ জিনিসটির সহিত সহরাঞ্চলের লোকের পরিচয় নাই বলিয়াই অনুমান হয়; কিন্তু পল্লীগ্রামে 'পরমান্ন' বা পায়েসের নীচেই তিলজাউর আসন! তিলজাউ যে কিরূপ উৎকৃষ্ট খাদ্য, পল্লীঅঞ্চলে গৃহস্থরমণীগণের মধ্যে তাহার একটা গল্প আছে :—

একবার এক গৃহস্থের জামাই স্ত্রী আনিতে অনেক দিন পরে শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিল। স্ত্রীটি কোনও সম্পন্ন লোকের কন্যা। শ্বাশুড়ী বহুদিন পরে জামাতাকে পাইয়া তাহাকে 'পরম আদরে' খাওয়াইতে আরম্ভ করিলেন।

দুই চারি দিন পরে একদিন অতি যত্নে 'তিলজাউ' রাঁধা হইল। জামাইটির শ্যালক-পত্নী পরিবেশন করিতে আসিল। অন্ন-ব্যঞ্জনাদি সমস্ত যথারীতি দিবার পর যুবতী হাসিয়া বলিল, "ঠাকুরজামাই, আজ তোমার জন্যে 'তিলজাউ' রাঁধা গিয়েছে, কি রকম হয়েছে, দেখ দেখি।" ঠাকুরজামাইয়ের উদর তখন বহুবিধ সুস্বাদু ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জন ও মৎস্যাদিতে পূর্ণপ্রায়, অতএব জামাতৃসুলভ লজ্জার বশবর্ত্তী না হইলেও সে উত্তর করিল, "না, পেট ভরে গিয়েছে, 'তিলজাউ'-টাউ পেটে ধর্‌বে না; আর ওটা ত বাড়ীতে রোজই খাওয়া যায়!" জামাই বাবাজীর আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না; সে প্রত্যহই বাড়ীতে 'তিলজাউ' খায় শুনিয়া, সে যে কেমন 'তিলজাউ', তাহা বুদ্ধিমতী শালাজ ঠাকুরাণী অবিলম্বেই বুঝিতে পারিল; তাই সে সাগ্রহে বলিল, "তা হোক না, বাড়ীতে রোজ খাও ব'লে কি আর এখানে খেতে নেই? একটু দিই?" সে এক হাতা তাহার পাতে দিতে উদ্যত! কিন্তু ঠাকুরজামাই কিছুতেই লইবে না, এক টোপ পাতে পড়িবামাত্র তাহার প্রবল প্রতিবাদে শালাজঠাকুরাণীকে উদ্যত হাতাখানি টানিয়া লইতে হইল। জামাই সেই তিলজাউটুকু মুখে দিয়াই বুঝিতে পারিল, বাড়ীর তিলজাউ ও শ্বশুরবাড়ীর এই তিলজাউ, উভয়ে আকাশ পাতাল তফাৎ! কিন্তু সে স্বেচ্ছায় ফিরাইয়া দিয়াছে, কি করিয়া আবার চাহিয়া লয়? অথচ তাহার মধুর আস্বাদনও ভুলিবার নয়। একালের জামাই হইলে হয় ত বলিত, "তুমি কষ্ট করিয়া তিলজাউ রাঁধিয়াছ, আমার না লওয়াটা বড়ই অন্যায় হইতেছে দেখিতেছি! আচ্ছা, খানিকটে দিয়া যাও;" কিন্তু সেকেলে বোকা পাড়াগেঁয়ে জামাই, বুদ্ধি তত প্রখর নহে, শুধু গুরুমহাশয়ের

তামাক সাজিয়া ও তাঁহার মাথার পাকাচুল তুলিয়া যা কিছু বিদ্যা হইয়াছে ; কাজেই কি কর্ত্তব্য তাহা সে বুঝিতে পারিল না। বিস্তর চিন্তার পর সে ঠিক করিল, রাত্রে রান্নাঘরের হাঁড়ি হইতে খানিক তিলজাউ চুরী করিয়া খাইতে হইবে! তিলজাউ জিনিসটি এক রকম গ্রাম্য মিঠা পোলাও, শীতকালেরই একান্ত উপযোগী ; কিন্তু অন্যান্য প্রভেদ ভিন্ন পোলাওয়ের সঙ্গে ইহার একটা প্রধান পার্থক্য এই যে, পোলাও গরম গরম ভাল, কিন্তু তিলজাউ একদিন হাঁড়িতে বাসি করিয়া রাখিয়া পরদিন মধ্যাহ্ন কালে রৌদ্রে পিঠ দিয়া বসিয়া খাইলে, তবে তাহার মাধুর্য্য সম্যক্ উপভোগ করিতে পারা যায়! তাই রাত্রে রান্নাঘরে হাঁড়ি-বোঝাই তিলজাউ পর দিনের জন্য সঞ্চিত থাকে। জামাই বাবাজী গভীর রাত্রে উঠিয়া নিজের শয়নকক্ষের বাহিরে আসিল ; এবং রান্নাঘরে প্রবেশপূর্ব্বক অন্ধকারেই 'হাতড়াইয়া' তিলজাউর হাঁড়ি আবিষ্কার করিয়া 'সড়াসড়' খাইতে আরম্ভ করিল! তাহার একটি সম্বন্ধী সেই সময় বাহিরে আসিয়াছিল ; সে ভাবিল, এত রাত্রে দ্বার খুলিয়া চুপি চুপি কে রান্নাঘরে প্রবেশ করিল?—এ নিশ্চয়ই চোর! সম্বন্ধী মহা সোরগোল আরম্ভ করিয়া দিল। বিপদ বুঝিয়া জামাই বাবাজী দু' থাবা তিলজাউ হাতে লইয়াই রান্নাঘরের খিড়কী-দ্বার খুলিয়া চম্পট দিবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ কৃতকার্য্য হইতে পারিল না! মধুর তিলজাউ ও তদপেক্ষা সুমিষ্ট 'ধনঞ্জয়ে' পরিতৃপ্ত হইয়া সেই রাত্রেই সে শ্বশুরবাড়ী হইতে প্রস্থান করিল!

স্থূলবুদ্ধি গ্রাম্যজামাই-বাবাজীর পরিণাম দেখিয়া বোধ হয় আমাদের কোনও সূক্ষ্মবুদ্ধি নগরবাসী বন্ধু এরূপ বিপদসঙ্কুল সুখাদ্যটির প্রতি

লোভ প্রকাশ করিবেন না! কিন্তু এখানে এ কথাও বলা অসঙ্গত নয় যে, খাদ্যহিসাবে তিলজাউর কোন উৎকর্ষতা নাই; বিশেষতঃ, অল্পাহারী, ভোজনবিলাসী বাবুলোকের পক্ষে ইহা একান্ত গুরুপাক, এবং ইহা অসঙ্কোচে তাঁহাদের পাতে দেওয়াও যায় না! কারণ, চাউল, দুগ্ধ, ভাজা তিলের গুঁড়া ও খেজুরে গুড়ের সংমিশ্রণে ইহা প্রস্তুত হয়। কিন্তু শিল্প ও আস্বাদন হিসাবে ইহার প্রাধান্য না থাকিলেও, ইহার সহিত মাতৃহৃদয়ের যে অকৃত্রিম স্নেহ, যত্ন ও উৎসাহ মিশ্রিত থাকে, এবং ইহার স্বাদগ্রহণের জন্য পল্লীবালকবালিকাগণের হৃদয়ে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে আগ্রহ জাগে, আর তাহার চরিতার্থতায় সরল শিশুহৃদয়ে আনন্দের যে উচ্ছ্বাস উঠে, তাহার সহিত মধুর পৌষপার্ব্বণের সুখস্মৃতির সমাবেশেই তিলজাউ অত্যন্ত মুখরোচক ও তৃপ্তিদায়ক বলিয়া ধারণা হয়।

কিন্তু সকল বাড়ীতে তিলজাউ না হইলেও, সকল গৃহস্থবধূই, আজ মধ্যাহ্নে 'মুঠে' ও 'সিদ্ধপুলি' লইয়া ব্যস্ত। ভিজে চাউলের গুঁড়াগুলি গরম জলে ভিজাইয়া, তাহা গোল করিয়া দলা বাঁধিয়া জলে সিদ্ধ করিলেই 'মুঠে' প্রস্তুত হয়। অনেকে চাউল গুঁড়ার পুলি প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে নারিকেলের ছাঁই বা ক্ষীর পুরিয়া 'মুঠে'র সঙ্গে সিদ্ধ করে। ইহাতে বেশী খরচ নাই। অবস্থাপন্ন গৃহস্থেরা মুঠে ও সিদ্ধপুলি জলে সিদ্ধ না করিয়া দুধে সিদ্ধ করিয়া চিনির রসে ডুবাইয়া রাখিতেছেন। যাহারা চিনির রসের যোগাড় করিতে না পারে, তাহারা নলেন গুড় দিয়াই রসের অভাব পূর্ণ করে।

অপরাহ্নকালে প্রত্যেক বাড়ীতেই হুলাহুলি পড়িয়া গেল; চারি দিকেই আনন্দ, উৎসাহ, কলরব! সমস্ত পল্লী সজীব হইয়া উঠিল।

বালিকা ও যুবতীগণ 'ঝিকি-মিকি' বেলা থাকিতে নদীতে গা ধুইয়া কলসী-কাঁকে কাঁপিতে কাঁপিতে গ্রাম্যপথ দিয়া বাড়ী আসিতেছে, তাহার পর বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া ঘরে দ্বারে আলিপনা দিতে বসিয়া গিয়াছে। তুলসীতলা আজ আলিপনা দেওয়ার প্রধান স্থান। সকালে তুলসীতলাটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া নিকানো হইয়াছিল; এখন সেখানে আলিপনায় কত রকম চিত্র বিচিত্র ছবি অঙ্কিত হইতে লাগিল;—ঘর, বাড়ী, গোয়াল, গোলাবাড়ী, ঢেঁকিঘর, পুকুর, হাঁস, পদ্মফুল, মাছ, বুড়ো বুড়ী! গোলাবাড়ীতে সারি সারি গোলা, গোয়ালে সারি সারি গরু। এই সকল আঁকিয়া অঙ্কিত গোলাগুলির উপর ছোলা, মটর, ধান, গম প্রভৃতি নানা রকম শস্য অল্প অল্প রাখিয়া পোয়াল দিয়া সমস্ত ঢাকিয়া দেওয়া হইল।

ক্রমে সন্ধ্যা গাঢ় হইয়া আসিল। ছোট ছোট মেয়েরা গোবরের কতকগুলি 'নুড়ি' তৈয়ারী করিয়া প্রত্যেকটির মাথায় সিন্দূর লাগাইয়া তাহাতে দুই তিনগাছ দুর্ব্বাঘাস বসাইয়া বারকোসে সাজাইয়া নিরাপদ স্থানে রাখিয়া দিল; তাহার পর রান্নাঘরে পিঠে পুলি গড়ান দেখিবার জন্য মা, দিদিমা, কাকীমাদের কাছে গিয়া বসিল।

অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন গৃহস্থগণের বাড়ীতে আজ পৌষপার্ব্বণ উপলক্ষে মুগের ডালের পুলি, চিঁড়ার পুলি, আলুর পুলি প্রভৃতি নানারকমের পুলি, আঁদোশা, গোকুলপিঠে, সরুচাকলি প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে; কিন্তু দিনের বেলা যেমন মুঠে ও সিদ্ধপুলি সর্ব্বসাধারণ হিন্দু গৃহস্থের অপরিহার্য্য খাদ্য, 'পিঠে'ও প্রত্যেক গৃহস্থের সেইরূপ রাত্রের খাদ্য। গৃহস্থরমণীরা উননের সম্মুখে মৃৎপ্রদীপের নিকটে বসিয়া পিঠে ভাজিতেছেন। দিনের বেলা বাজার হইতে যে 'সরা' ও 'মুচি' আনীত হইয়াছে,

তাঁহারা সেই সরাখানি উননের উপর রাখিয়া একটা বেগুনের বোঁটাসমেত পশ্চাতের অংশ তৈলপাত্রে ডুবাইয়া তাহা দিয়া মধ্যে মধ্যে সরায় তেলের 'পোঁচ্‌ড়া' দিতেছেন, আর একটা বাটিতে করিয়া ঘন চাউলের গোলা তুলিয়া সরায় ঢালিয়া 'মুচি' দিয়া তাহা ঢাকিয়া দিতেছেন; 'ছ্যাঁকছুঁক্‌' করিয়া শব্দ হইতেছে, আর ছেলে মেয়েরা আনন্দে হাততালি দিয়া বলিতেছে—

"উননে পিঠে ফোলে,
'কাণ্টা'য় শিয়াল ফোলে।"

পিঠে ভাজা শেষ হইলে একখানি পিঠে আঁস্তাকুড়ে শৃগালের জন্য ফেলিয়া রাখা হইল, আর একখানি উননের পাড়ে অগ্নিদেবের জন্য সরা সমেত সংরক্ষিত হইল। ছেলে মেয়েরা সানন্দে দুধগুড় দিয়া পিঠে খাইতে লাগিল। রমণীগণ ভাঁড়ার ঘরের দ্রব্যপূর্ণ হাঁড়ি, কলসী, খোলাহাঁড়ি, ঝাঁঝুরি প্রভৃতিতে 'বাঁউড়ি' বাঁধিতে লাগিলেন। অল্প 'পোয়াল' দ্বারা হাঁড়ি কলসীগুলিকে বেষ্টন করিয়া রাখাকে 'বাঁউড়ি বাঁধা' বলে; গৃহস্থরমণীদের পক্ষে ইহা একটা ভারি লক্ষণের কাজ! 'বাঁউড়ি' বাঁধিবার উদ্দেশ্য কি, ঠিক বলা যায় না; তবে ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহাদের মতে পৌষ মাস লক্ষ্মীমাস, আজ পৌষ মাসের শেষ দিন, এইরূপে পোয়াল বাঁধিয়া লক্ষ্মীকে ঘরে আট্‌কাইয়া রাখিবার চেষ্টা হইতেছে!

ইতিপূর্ব্বে যে সিন্দূরচর্চ্চিত দূর্ব্বাদলমুকুটিত গোবরের নুড়ির কথা বলা হইয়াছে, সেগুলি ও কতকগুলি চাউলের গুঁড়া একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে গুছাইয়া রাখিয়া আহারাদির পর সকলে শয়ন করিতে চলিলেন।

কিন্তু রাত্রি তিনটার পূর্ব্বেই পল্লীরমণীগণ আবার জাগিয়া উঠিলেন। পৌষ-সংক্রান্তির শেষ রাত্রে সেই দুরন্ত শীতে রমণীগণ, এমন কি, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা পর্য্যন্ত গায়ে কাপড় জড়াইয়া পৌষ 'আগ্‌লাইতে' আরম্ভ করিল। প্রথমে এক জন গৃহস্থের গৃহপ্রাঙ্গণে মৃৎপ্রদীপের মৃদু আলোকচ্ছটা ফুটিয়া উঠিল, দুই একটি কোমল কণ্ঠের অস্ফুট ধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল; কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যে সমগ্র পল্লীর সমস্ত পরিবার জাগিয়া উঠিল! এক জন মাটীর প্রদীপ লইয়া আগে আগে চলিয়াছে, তাহার পশ্চাতে একটি বধূ বাড়ীর ভিতরের উঠানে, বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণে, নানা স্থানে অল্প অল্প চাউলের গুঁড়া ছড়াইয়া দিয়া যাইতেছে; আর এক জন পূর্ব্বোক্ত গোবরের নুড়ি সেই চাউল-গুঁড়ার উপর বসাইয়া দিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে সকলে সমস্বরে বলিতেছে,—

এস পৌষ, যেও না;
ভাতের হাঁড়িতে থাক পৌষ, যেও না।"

অল্পক্ষণ পরেই পাশের বাড়ী হইতে শব্দ উঠিল,—

"লেপ কাঁথায় থাক পৌষ, যেও না;
পোয়ালগাদায় থাক পৌষ, যেও না।"

বৃক্ষলতায় সমাচ্ছন্ন, ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরে পূর্ণ, আম্রকাননে ও বাঁশ-বনে পরিবেষ্টিত, নৈশ অন্ধকারে মগ্ন পল্লীখানি দেখিতে দেখিতে বামাকণ্ঠের মধুর গুঞ্জনে মধুকর-মুখরিত মধুচক্রের ন্যায় শব্দ-সমাকুল হইয়া উঠিল। পৌষমাস তাহার সমস্ত আনন্দ, সুখ ও উপভোগের মধুর স্মৃতি বক্ষে লইয়া অবসানের এই পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে পল্লীরমণীগণের কৃতজ্ঞহৃদয়ে নিজের যে উজ্জ্বল দেবীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, ধনধান্যদাত্রী লক্ষ্মীস্বরূপিনী সেই

দেবীর উদ্বোধনের জন্য পল্লীবাসিনীগণ ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে একাগ্র মনে সমস্বরে পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিল,—

"এসো পৌষ, যেও না!
ভাতের হাঁড়িতে থাক পৌষ, যেও না;
লেপ কাঁথায় থাক পৌষ, যেও না;
পোয়ালগাদায় থাক পৌষ, যেও না;
পৌষ মাস, লক্ষ্মীমাস, যেও না!"

কিন্তু তাহাদের মধুর কণ্ঠের সেই আগ্রহপূর্ণ আহ্বানধ্বনি শুনিয়াও পৌষ মাস এক দণ্ড অপেক্ষা করিতে পারিল না; বর্ত্তমানের আনন্দোচ্ছ্বাসটুকু পাথেয়স্বরূপ সঙ্গে লইয়া, নৈশবায়ুর অতি শীতল নিশ্বাস ফেলিয়া, অতীতের অনন্ত রহস্যান্ধকারে মিশিবার জন্য সে দ্রুতবেগে ধাবিত হইল!

আকাশে নক্ষত্রের দল ক্রমে বিরল ও দীপ্তিহীন হইয়া আসিল, পূর্ব্ব-গগন পাণ্ডুরবর্ণ ধারণ করিল, এবং আলোকান্ধকারের সেই মধুর মিলন দেখিবার জন্যই বুঝি একটি অতি উজ্জ্বল তারকা পূর্ব্বাকাশের ঊর্দ্ধদেশ হইতে স্থিরদৃষ্টিতে মৌন ধরণীর দিকে চাহিয়া রহিল।

তখন উৎসবের দীপ নির্ব্বাপিত করিয়া রমণীগণ আবার ধীরে ধীরে শয্যাগ্রহণ করিল; যেন কোনও ঐন্দ্রজালিকের কুহকদণ্ডস্পর্শে মর্ম্মর-ধ্বনিমুখরিত উৎসবাকুল সুপ্তিহীন চঞ্চল পল্লী মুহূর্ত্তমধ্যে নিস্তব্ধ ও নিদ্রিত হইয়া পড়িল!

উত্তরায়ণ মেলা

উত্তরায়ণ মেলা

১লা মাঘ সূর্য্যদেব উত্তরায়ণপথে গতিপরিবর্ত্তন করেন। সেই দিনের স্মরণার্থ ত্রিহট্টে একটি মেলা বসিয়া থাকে। ত্রিহট্ট একটি ক্ষুদ্র গ্রাম, আমাদের গ্রামের পাঁচ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে একটি থানা ও একটা ছোট ডাকঘর আছে। পল্লীগ্রামের 'ভিলেজ'-পোষ্টমাষ্টারদের আর একটা ছোট রকমের চাকরী করিবার অধিকার আছে,—তাঁহারা পাঠশালার গুরুমহাশয়গিরিও করিয়া থাকেন; ডাকঘর ও পাঠশালা একই স্থলে অবস্থিত; সুতরাং গ্রাম্য ডাকমুন্সীর পক্ষে এই দুই কাজ এক সঙ্গে নির্ব্বাহ করা কিছুমাত্র কঠিন নহে। ডাকমুন্সী এই পল্লী-গ্রামের এক জন হাকিম; আর এক জন সর্ব্বশক্তিমান হাকিম এখানকার থানার দারোগা।

ত্রিহট্ট গ্রামখানি ছোট হইলেও সুন্দর। ইহার পশ্চিম ধারে খড়িয়া নদী প্রবাহিত; মাঘ মাসে নদীতে অধিক জল থাকে না; উপরে উঁচু পাড়, উভয় তীরে প্রকাণ্ড বালির চর। পূর্ব্ব, উত্তর ও দক্ষিণ, তিন দিকে প্রশস্ত ক্ষেত্র, নানাবিধ শস্যে পরিপূর্ণ; যত দূর দেখিতে পাওয়া যায়, শুধুই শস্যশীর্ষ ধরণীর শ্যামল বস্ত্রাঞ্চলের ন্যায় আন্দোলিত হইতেছে; মধ্যে ক্ষুদ্র গ্রামখানি। ধনীর অট্টালিকা একখানিও নাই, অধিকাংশই দরিদ্রের পর্ণকুটীর, মধ্যবিত্ত গৃহস্থের 'চৌরী', আটচালা ঘরও দুই চারি-খানি আছে; মধ্যে মধ্যে দুই একটা গোলাবাড়ী, আঙ্গিনাখানি পরিষ্কার

পরিচ্ছন্ন; এক পাশে একখানি প্রকাণ্ড আটচালা কাছারী, তাহারই দুই পাশে ছোট বড় সারি সারি গোলা স্থাপিত;—গোলাকার মৃত্তিকাস্তূপের উপর মোটা মোটা কাঠের গুঁড়ি পাতিয়া তাহার উপর এই সকল গোলা সংরক্ষিত হইয়াছে। চাটাই ও বাঁশের বাতা দিয়া এই সকল গোলা সুকৌশলে দৃঢ়রূপে নির্ম্মিত, ভিতরের দিকটা মাটী ও গোবর দিয়া পরিপাটী রূপে লেপা, উপরে খড়ের চাল, চালের চূড়ায় একটা উঁচু ঝুঁট; অনেকেই মাটীর পোড়ান গামলা উল্‌টাইয়া সেই ঝুঁট ঢাকিয়া রাখিয়াছে। গোলা ধান, গম, মশিনা, শর্ষপ প্রভৃতি শস্যে পরিপূর্ণ; পাছে চোরে চুরী করে, এই ভয়ে মহাজনদের গোমস্তারা তাহার অতি ক্ষুদ্র কাঠের দ্বারে চাবি লাগাইয়া রাখিয়া গিয়াছে; দরকার পড়িলে চাবি খুলিয়া শস্য বাহির করে; কিন্তু ইঁদুরের উৎপাত হইতে শস্য রক্ষা করা কঠিন! তাহারা চাল ফুটা করিয়া গোলার শস্য নষ্ট করে, এবং এক পাল বেজী নিঃশঙ্কচিত্তে গোলার নীচে আসিয়া কাঠের গুঁড়ির ফাঁকে ফাঁকে আপনাদের বসবাসের জন্য চিরস্থায়ী আড্ডা স্থাপন করে।

অনেক গৃহস্থের বাড়ী মাটীর প্রাচীরে পরিবেষ্টিত, কিন্তু গোবরের 'চাপড়ী'তে এই সকল প্রাচীর একেবারে ঢাকিয়া গিয়াছে! প্রাচীরের চালে শিমগাছ লতাইয়া উঠিয়াছে, এবং তাহাদের সাদা ও বেগুণে রঙ্গের ফুল সবুজ পাতার ব্যবধানে অতি সুন্দর দেখাইতেছে। বাড়ীর পাশ দিয়া ক্ষুদ্র গ্রাম্য পথ; সেই রাস্তার এক পাশে বাঁশ-ঝাড়, জঙ্গলপরিবৃত গর্ত্ত,—উননের ছাই ও বাঁশের পাতাতে গর্ত্ত পরিপূর্ণ-প্রায়। সরু পথের অপর দিকে জামাল্‌কোটার গাছে ঘেরা বেড়; বেড়ের

ধারে ধারে দুই পাঁচটা দীর্ঘ সজিনা গাছ, পাতা প্রায় দেখা যায় না, সমস্ত শাখা সাদা ফুলে ভরিয়া গিয়াছে, এবং ফুলভারে শাখাগুলি অবনত হইয়া পড়িয়াছে ; এই ফুল পল্লীবাসীর অতি মুখরোচক তরকারী ; ইলিশ মাছের সহযোগে ইহার চচ্চড়ি এমন সুস্বাদ হয় যে, অরুচিগ্রস্তের ও তাহা পরম রুচিকর ; কিন্তু কোন ডাক্তারই ভরসা করিয়া কোন অরুচিগ্রস্ত রোগীকে এই পথ্যের ব্যবস্থা দেন না ! মটরের ডালের বড়ি দিয়া সজিনা ফুলের যে অম্বল হয়, তাহার আস্বাদন পল্লীবাসিগণ সারা বছর ভুলিতে পারে না ; সজিনা ফুলে পর্য্যাপ্তপরিমাণে মধু থাকে, এই মধু অম্লের সহিত মিশ্রিত হইয়া অম্লমধুর স্বাদ উৎপাদন করে। বিশেষতঃ, এই সময় গাছে গাছে তেঁতুল পাকিতে আরম্ভ হয়, সেই পরিপুষ্ট পক্কপ্রায় তেঁতুলের অম্ল-রস তেমন দুঃসহ তীব্র নহে, তাহার মধ্যেও একটু মিষ্টতা আছে। কিন্তু আজ কয় বৎসর এ অঞ্চলে ম্যালেরিয়া প্রবেশ করিয়া এই অম্বলের রাজ্যে অরাজকতা উপস্থিত করিয়াছে ! তেঁতুল পাড়াইয়া কেহ যে মনের মত করিয়া অম্বল রাঁধিয়া খাইবে, সে যো নাই ; এমন কি, টোপাকুলগুলি গাছে পাকিয়া পাকিয়া অভিমানে লাল হইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে অরুচিগ্রস্তা গুর্ব্বিণীদের লালা-সংবরণ করা দুরূহ হইতেছে ! কিন্তু হায়, নিরুপায় ; সরকার বাহাদুর ডাকঘরে এক পয়সায় আড়াই রতি কুইনাইন পাইবার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। মন্দ লোকে বলে, গয়ারাম ডাকমুন্সী কুইনাইন-বিক্রয়ের কমিশনেই বাড়ীতে দালান দিয়া ফেলিল ! 'কাহারও পৌষ মাস, কাহারও সর্ব্বনাশ' !—কিন্তু লোকের জ্বর কিছুতেই বন্ধ হইতেছে না। সেকালেও কাঁচা তেঁতুল ছিল, গাছভরা কুল ছিল, ইলিশমাছ ও কলাই-ডাল ছিল, কিন্তু কুইনাইন ছিল না ; কেহ

ম্যালেরিয়ার নামও জানিত না। সেকালে কদাচিৎ কাহারও জ্বর হইলে 'ধাউত' গরম হইয়াছে বলিয়া রোগী বেশী করিয়া শরিষার তেল মাখিয়া নদীতে গোটাকত ডুব দিয়া আসিত, তাহার পর বাসি মাছের ঝোল ও গোঁড়া লেবু দিয়া এক পেট পান্ত ভাত খাইয়া জ্বর তাড়াইত; কেহ বা মিছরীর পানা ও ডাব খাইয়া 'শৈত্যক' করিত; যদি নিতান্ত বাড়াবাড়ি দেখিত ত কবিরাজ ডাকাইত। কবিরাজমহাশয় নগদ আট গণ্ডা পয়সা দর্শনী লইয়া চাদরের খুঁট হইতে 'লৌহাস্তক চূর্ণ' বাহির করিয়া তাহাই সেবনের ব্যবস্থা দিতেন, এবং যত দিন রোগী আরাম না হইত, তত দিন দুই বেলা আসিয়া নাড়ী টিপিয়া যাইতেন; ব্যারাম সারিলে আর কিছু দিলেই চলিত। কিন্তু একালে সকলই আশ্চর্য্য! পাড়াগাঁয়ের দোকানে দোকানে সাবু ও বার্লি বিক্রয় হইতেছে। সকালে উঠিয়াই যে ব্যক্তি দু' রতি কুইনাইন না খায়, তাহার সে দিনের মত জ্বরভীতি লাগিয়াই থাকে! প্লীহার আবির্ভাবে উদরটি ঢক্কাকার, তাহার উপর ব্লিষ্টারের পদাঙ্কলেখা; শরীর ক্ষীণ, রক্তশূন্য, হাত পায়ের নলা সরু, এবং মস্তক কেশবিরল; গ্রামের অধিকাংশ লোকের অবস্থাই এই রকম!

কিন্তু গ্রামের এ রকম অবস্থা সত্ত্বেও উৎরুণির মেলা বন্ধ থাকিবার যো নাই! এ বহুদিনের মেলা, অনেক দেশ বিদেশ হইতে দোকানীপসারী আসিয়া এই মেলায় খরিদ বিক্রয় করে। পাঁচ সাত ক্রোশ দূরের লোকেও সংবৎসর হইতে আশা করিয়া থাকে,—'উৎরুণি'র মেলায় জুতা কিনিবে। এখানে মেলার সময় যে হাঁড়ি বিক্রয় হইতে আসে, তাহা খুব 'বয়' বলিয়া অনেক দূরবর্ত্তী গ্রামের বৃদ্ধাগণও মেলার সুযোগের প্রতীক্ষা করে; 'বাণ্যে'র হাঁড়ির প্রতি তাহাদের অগাধ শ্রদ্ধা ও

বিশ্বাস! এ মেলা কি কখন বন্ধ থাকিতে পারে? বিশেষতঃ, এ মেলা বন্ধ করিলে কৃষ্ণরায়ের অপমান করা হয়। কৃষ্ণরায় ত্রিহট্টের গ্রাম্য-দেবতা; এমন জাগ্রত দেবতা সচরাচর দেখা যায় না। মেলার সময় ঘটা করিয়া তাঁহার পূজা হয়। কাহারও কাহারও মতে এই মেলা কৃষ্ণরায়ের জন্মোৎসব! সকলের বিশ্বাস, যত দিন কৃষ্ণরায় আছেন, তত দিন পর্য্যন্ত এখানে মেলা বসিবে।

কৃষ্ণরায় শুধু যে জাগ্রত দেবতা, তাহা নহে; এ অঞ্চলের মধ্যে তিনি প্রধান দেবতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ত্রিহট্টের চারি দিকে আট দশ ক্রোশের মধ্যে কাহারও কিছু কামনা থাকিলে কৃষ্ণরায়কে মানিলেই অবিলম্বে সে কামনা সফল হয়। কাহারও গরুর প্রথম 'বিয়েনে' ভাল দুধ হইল না; গৃহকর্ত্তা মানিল, "দোহাই কৃষ্ণরায়, ফিরে বিয়েনে যেন আমার গরুর বেশী দুধ হয়, আমি সেই দুধ দিয়ে তোমার পূজো দেব।" কাহারও বাড়ীতে প্রকাণ্ড কাঁটালের গাছ হইয়াছে, কিন্তু ফলের সঙ্গে সাক্ষাৎ নাই, যে দুই পাঁচটা 'মুচি' পড়ে, তাহা পচিয়া যায়! গৃহস্থ মনে মনে মানিল, "এবার কাঁটাল হ'লে সকলের বড় কাঁটালটি কৃষ্ণরায়ের জন্য পাঠাব। হে ঠাকুর, এবার আমাকে গাছভরা কাঁটাল দাও।" এইরূপে আম কাঁটাল ডাব হইতে আরম্ভ করিয়া আতা পেয়ারা ডালিম, এমন কি, লাউ কুমড়ো পর্য্যন্ত কোন ফলই কৃষ্ণরায়ের 'মানত' না হইয়া যায় না। যাহার যে জিনিস মানত থাকে, সাময়িক হইলে সে সেই সকল জিনিস লইয়া ১লা মাঘ কৃষ্ণরায়ের মন্দিরে উপস্থিত হয়। যদিও কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতেই মেলার দোকানপাটের আমদানী হয়, কিন্তু ১লা মাঘই প্রকৃতপক্ষে মেলা বসে। এই মেলা দশ বার দিন

পর্য্যন্ত থাকে; তাহার পর ভাঙ্গা মেলা দুই এক দিনের বেশী থাকে না। কিন্তু এই সময়েই লোকের ভিড় বেশী হয়; কারণ, সাধারণের বিশ্বাস, দোকানী পসারী দোকানপাট তুলিয়া চলিয়া যাইবার সময় ভাঙ্গা মেলায় কিছু সস্তা দরে জিনিস বিক্রয় করিয়া থাকে।

বাল্যকাল হইতেই দেখিয়া আসিতেছি, উত্তরায়ণ মেলার সময় আমাদের পল্লী অঞ্চলে ভারি একটা আনন্দকল্লোল উত্থিত হয়।

অনেক স্কুল পাঠশালার ছেলে পড়া কামাই করিয়া দল বাঁধিয়া মেলা দেখিতে ছোটে, এবং গ্রাম্য যুবকেরা সারা বৎসরের ব্যবহারোপযোগী জুতা কিনিবার জন্য ধোপদস্ত কাপড়, ইস্ত্রী-করা কামিজ, কোট ও তাহার উপর দোলাই বা র‍্যাপারে সজ্জিত হইয়া, কেহ ছাতি কেহ ছড়ি লইয়া, দলে দলে পারঘাটায় খেয়া নৌকায় পার হইয়া ত্রিহট্টে যায়। বৃদ্ধারা পর্য্যন্ত 'হাঁড়ি' কিনিয়া আনিবার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া এই মেলায় উপস্থিত হয়। এই সকল কারণে আমরা কয়-বন্ধুতে একবার ত্রিহট্টে যাইবার জন্য প্রলুব্ধ হইয়াছিলাম; অবশেষে একদিন গৃহত্যাগের সুবিধা পাওয়া গেল।

৩০এ পৌষ সন্ধ্যার পর বন্ধুবর্গে পরিবৃত হইয়া 'জিয়েন কাটের' সুমিষ্ট খেজুর-রস পান করিতে করিতে স্থির করা গেল, আগামী কল্য রাত্রি থাকিতেই বাহির হইয়া পড়িতে হইবে। পৌষ পার্ব্বণের হর্ষকোলাহলে তখনও প্রতি গৃহ প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, এবং খর্জ্জুররসের সঙ্গে পৌষের প্রবল শীত আমাদের বুকের মধ্যে কম্পন উপস্থিত করিতেছিল। আমরা স্থূল শীতবস্ত্রে সর্ব্ব শরীর আবৃত করিয়া দেশভ্রমণের এক মোহকর স্বপ্নে মুগ্ধ হইতেছিলাম। শুধু বোধ হইতেছিল, আমরা

কয়টি বন্ধু যেন এই বিশ্বসংসারের রঙ্গমঞ্চে কোন বিচিত্র অভিনয়ের দর্শকমাত্র। ঠাকুরমার গল্পের নায়ক সেকালের রাজপুত্র, মন্ত্রিপুত্র, কোটালের পুত্র ও সদাগরের পুত্র, এই চারি বন্ধুতে যেমন একত্র মিলিয়া কোনও এক স্বপ্নদৃষ্ট আকাশসম্ভব রত্নের সন্ধানে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইত, আমাদেরও মনে হইতে লাগিল, আমরাও যেন রাত্রিপ্রভাতে সেইরূপ কোনও অনুদ্দিষ্টা কল্পনাসুন্দরীর আবিষ্কারের আশায় গৃহ ছাড়িয়া এক দূরবর্ত্তী প্রবাসে প্রস্থান করিব;—সেখানে সকলই অজানিত, বিচিত্র, রহস্যপূর্ণ!—অথচ ত্রিহট্টের দূরত্ব আমাদের বাড়ী হইতে পাঁচ ক্রোশের বেশী নয়।

বাল্যকালে ঠিক এই রকমই হইয়া থাকে। আমরা এ পর্য্যন্ত কখনও গ্রামের বাহিরে পদার্পণ করি নাই, এবং বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে আমাদের কখনও পরিচয় হয় নাই। চারি দিকের বন্ধন যেখানে যত নিবিড়, স্বাধীনতার আলোক ও হিল্লোল সেখানে তত আকাঙ্ক্ষণীয় বলিয়া মনে হয়। সুতরাং রাত্রে শুইয়া শুইয়া মনে হইতে লাগিল, উষাকালে আমাদের জীবনেও একটি অভিনব উষালোকে ফুটিয়া উঠিবে; তাই নিদ্রাবস্থাতেও গ্রামের পর গ্রাম, মাঠের পর মাঠ, নূতন নূতন শস্যক্ষেত্র, অগণ্য অপরিচিত লোকের মুখ,—সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড মেলার আশ্চর্য্য দৃশ্যের অপরূপ কল্পনা, বুকের মধ্যে পুনঃ পুনঃ উৎসাহ-কম্পন জাগাইয়া তুলিতে লাগিল। আধ ঘুমে আধ জাগরণে শীতের দীর্ঘ রাত্রি কাটাইয়া দিলাম। অবশেষে রাত্রিশেষে বন্ধুত্রয় যখন জানালার কাছে আসিয়া উৎসাহভরে আমার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল, তখন আমি লাফাইয়া উঠিলাম।

শীতবস্ত্রে মণ্ডিত হইয়া যখন আমি বন্ধুত্রয়ের সঙ্গে ত্রস্তপদে গ্রাম্যপথে বাহির হইলাম, তখন পূর্ব্বদিক ঈষৎ লোহিতাভ হইয়াছে মাত্র। সেই লোহিতাভার নীচে বহু দূরে অসংখ্য বৃহৎ বৃক্ষের শ্রেণী কুজ্ঝটিকাবৃত হইয়া দূরবর্ত্তী পর্ব্বতমালার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। পূর্ব্বগগনের অনেক ঊর্দ্ধে, লক্ষ লক্ষ ক্রোশ দূরে একটি অতি উজ্জ্বল বৃহৎ তারকা ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া জ্বলিতেছিল, এবং কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীয়মাণ পাণ্ডুর চন্দ্রকলা পশ্চিমগগনপ্রান্ত হইতে অতি ক্ষীণ আলোক বিকীর্ণ করিতেছিল। রাত্রি অবসানপ্রায়, সুতরাং নক্ষত্র-বিরল আকাশে সুদূর ব্যবধানে যদিও দুই চারিটি তারকা দেখা যাইতে-ছিল, কিন্তু তাহারা ম্লান, দীপ্তিহীন; যেন তাহাদের দীর্ঘজাগরণক্লান্ত চক্ষু তন্দ্রাভারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছে, এবং আর একটু পরেই তাহারা উষার আলোকলেখালাঞ্ছিত নীলাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া সুপ্তিমগ্ন হইবে!

পথের দুই ধারে খর্জ্জুরকুঞ্জ। ছোট বড় সারি সারি অসংখ্য খেজুর গাছ সোজা দাঁড়াইয়া আছে, কচিৎ দুই একটা হেলিয়া পড়িয়াছে; তাহাদের কণ্ঠদেশে ঠিলি বাঁধা। ঠিলিগুলা যাহাতে এক পাশে সরিয়া না যায়, এ জন্য গাছীরা খেজুরের 'ডেগ্‌ড়ো' চিরিয়া তদ্দ্বারা গাছের গলায় আঁটিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে। গাছগুলির আগা-গোড়া রসলিপ্সু 'গাছী'দের বঙ্কিম তীক্ষ্ণাস্ত্রের ক্ষতচিহ্নে পূর্ণ, ক্ষতস্থান শুকাইয়া বহুদিনের রৌদ্রে ফাটিয়া গিয়াছে; প্রত্যেক গাছে এই রকম কুড়ি পঁচিশটা ক্ষতচিহ্ন রহিয়াছে,—কুড়ি পঁচিশ বৎসরের অতীত ইতিহাস তাহাদের সহিত বিজড়িত; সেই সকল স্থান এখন কালো কাঠে পরিণত হইয়াছে, এবং

শীতকালের দীর্ঘ রাত্রিতে কখনও যে সেখান হইতে অবিরলধারায় স্নিগ্ধ মধুর রস নিঃসারিত হইত, প্রভাতকালে শালিক, বুলবুল, দোয়েল প্রভৃতি পাখীর দল যে সেখানে রসসিক্ত 'নলি'র মুখে বসিয়া আকণ্ঠ রসপানে পরিতৃপ্ত হইয়া গান করিতে করিতে মুক্ত আকাশে উড়িয়া যাইত, রাখালেরা খোলা মাঠে গরু ছাড়িয়া দিয়া বাঁশের লম্বা লম্বা চোঙ্গা বাঁধিয়া সমস্ত দিনের রৌদ্রতাপে উত্তপ্ত ফেনিল রস সংগ্রহ করিত,—সে কথা এই সকল শুষ্ক চিহ্ন দেখিয়া কোনও মতে বিশ্বাস করা যায় না।

বৃক্ষশ্রেণীসমাকীর্ণ সঙ্কীর্ণ গ্রাম্যপথ ছাড়িয়া আমরা বাজারে প্রবেশ করিলাম। তখন বাজারের সমস্ত দোকান ঝাঁপে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া সুপ্তিমগ্ন। শুধু অদূরবর্ত্তী মসজিদে সমাগত মুসলমান উপাসক-বর্গের সমবেত কণ্ঠস্বরে আজানের যে পবিত্র গম্ভীর গাথা উত্থিত হইতে-ছিল, তাহাই চারি দিকের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা নদীতীরে উপস্থিত হইলাম। তখনও সূর্য্যোদয়ের অনেক বিলম্ব ছিল। নদীতীরে বহু প্রাচীন শিবমন্দিরে মঙ্গল আরতির শঙ্খঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। নিকটে একটি সুন্দর পুষ্পোদ্যান; এক সময়ে তাহা জনৈক বিলাসী জমীদারের বিলাসকানন ছিল, এখন তাহা শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে; কিন্তু এখনও সেখানে নানাজাতীয় ফুলের অভাব নাই। দেখিলাম, সেই প্রভাতে মুণ্ডিতমস্তক, দাড়ি-গোঁফ-বর্জ্জিত, নামাবলীতে আবৃতদেহ বৃদ্ধ বাচস্পতি মহাশয় বামহস্তে একটি ফুলের সাজি ও দক্ষিণহস্তে একখানি অনতিদীর্ঘ আঁকুশি লইয়া পুষ্পচয়ন করিয়া বেড়াইতে-ছেন। একটা বকফুলের গাছে একটু উঁচুতে থোকা থোকা ফুল

ফুটিয়াছিল; বাচস্পতি গম্ভীর স্বরে সুর করিয়া স্তোত্র আবৃত্তি করিতে করিতে, সাজিটি জাফ্রির বেড়ার উপর রাখিয়া, বকফুলের একটা থোকায় আঁকুশি বাধাইয়া দিলেন; আমাদের একটি বন্ধু কৌতুকভরে বলিল, "কি দাদাঠাকুর! গাছে উঠে না পাড়লে পড়া ফুলে কি পুজো হয়?" দাদাঠাকুর তত সকালে আমাদিগকে সেই স্থানে দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন, এবং হাসিয়া শ্যালক সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "তোদের এখন রক্তের জোর আছে, গাছে উঠ্‌তে পারিস্; আমি বুড়ো মানুষ, সে শক্তি নেই,—তাই ব'লে কি মা সিদ্ধেশ্বরী আমার ফুল নেবেন না? যা হোক্, তোরা এত সকালে যাচ্ছিস্ কোথা?" আমরা উত্তর দিলাম, "ত্রিহট্টে মেলা দেখ্‌তে।"

আজ ১লা মাঘ। অনেকেই মেলা দেখিতে চলিয়াছে; সুতরাং পথে সঙ্গীর অভাব নাই। নফর মাঝি পয়সার লোভে শেষরাত্রি হইতে এই দারুণ শীতে সর্ব্বশরীরে কাঁথা জড়াইয়া নৌকা ঠেলিবার 'নগা' গাছটা হাতে লইয়া বসিয়া আছে; নিকটে একটা মোটা পোয়ালের 'বুঁদি'তে আগুন রহিয়াছে, সে তাহারই সাহায্যে মধ্যে মধ্যে তামাক সাজিয়া খাইতেছে। প্রত্যেক যাত্রীর কাছে সে এক পয়সা হিসাবে পারাণী আদায় করিতেছে। আমাদের পয়সা দিতে হইল না; কারণ, গ্রামের লোককে পার হইবার সময় পারাণী দিতে হয় না। মাঝি প্রত্যেক গৃহস্থের কাছে পূজার সময় পার্ব্বণী লয়; তাহা ভিন্ন বিবাহ কিংবা অন্য কোনও উৎসব উপলক্ষে পয়সা কড়ি, চাল, ডাল প্রভৃতি সিধা ও জলপান পায়, এবং পূজার সময় অনেক বাড়ীতে ধুতি চাদর ও নারিকেলও 'বার্ষিক' পাইয়া থাকে।

নদী পার হইয়া মেঠো রাস্তা ধরিয়া উত্তর-পশ্চিম মুখে চলিতে লাগিলাম। শিবমন্দিরের উচ্চ চূড়া প্রভাতসূর্য্যের কনককিরণে উজ্জ্বল প্রভায় দীপ্তি পাইতে লাগিল; কত মাঠ, কত শিশির-সিক্ত 'আইরি' বন, দীর্ঘশীর্ষ গোধূমের ক্ষেত্র, আম কাঁটালের বাগান ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম অতিক্রম করিয়া বেলা আট্‌টার পর ত্রিহট্টের নিকট উপস্থিত হইলাম। ত্রিহট্টের প্রান্তসীমায় পদার্পণ করিয়া দেখিতে পাইলাম, দলে দলে স্ত্রীপুরুষ, এমন কি, বালক বালিকা পর্য্যন্ত উৎসাহের সহিত মেলা দেখিতে চলিয়াছে। সকলেই বিবিধ বর্ণের সৌখীন বস্ত্রে সুসজ্জিত; অনেকে জানুর উপর কাপড় তুলিয়া, কোমরে চাদর বাঁধিয়া কাঁধে লাঠি লইয়া চলিয়াছে; পথের ধূলিতে তাহাদিগের জানু পর্য্যন্ত সাদা লইয়া গিয়াছে! এক দল মুসলমান রমণী চিত্র বিচিত্র কাপড় পরিয়া এক বর্ষীয়সী বিধবার অনুগমন করিতেছে;—কাহারও পায়ে বাঁকমল, কপালে উল্‌কী, সিঁথিতে সিন্দুরের স্থূল রেখা, কেশরাশি কাপড়ের পাড়ের ফালি দিয়া মাথার উপরে চূড়াকারে বাঁধা; কাহারও নাকে প্রকাণ্ড এক নথ, কানে পাশা; কাহারও নাকে নাকছাবি, হাতে রূপার অতিবিস্তীর্ণ খাড়ু! চাষার ছেলেরা দল বাঁধিয়া কখন দ্রুত, কখন মন্থর গতিতে চলিয়াছে; কেহ হুঁকা টানিতে টানিতে যাইতেছে, কেহ বা নিকটবর্ত্তী কলা-বাগান হইতে একটা কলার 'ডেগ্‌ড়ো' কাটিয়া তদ্দ্বারা হুঁকার অভাব মোচন করিতেছে; মাথায় চেরা সিঁথি, দীর্ঘ চুলগুলি কাঁকুই দিয়া আঁচড়াইয়া ঘাড়ের উপর প্রসারিত করিয়াছে, দ্রুতপদসঞ্চালনে 'বাব্‌রিকাটা' কেশগুচ্ছ নাচিয়া উঠিতেছে।

মাঠের মধ্যে কৃষ্ণরায়ের প্রকাণ্ড মন্দির। মন্দিরটি অনেক কালের; তাহার চারি দিকে প্রশস্ত প্রাচীর, প্রাচীরের অনেক স্থান জীর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া

পড়িয়াছে। দ্বারপ্রান্তে একটি অতি বৃহৎ তমালগাছ। চারি ধারে তুলসীগাছও যথেষ্ট আছে।

কৃষ্ণরায়ের সর্ব্বাঙ্গ স্বর্ণালঙ্কারে মণ্ডিত। প্রস্তরনির্ম্মিত দেহ অতি মসৃণ, এবং সুকৌশলে চিত্রিত। মস্তকে শিখিপুচ্ছশোভিত মোহনচূড়া ও হাতের বাঁশী সোনা দিয়া বাঁধান, পরিধানে পীতাম্বর, করতল ও পদারবিন্দ হিঙ্গুলরাগরঞ্জিত, প্রশান্ত চক্ষে প্রসন্ন হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু বাঁকাভাবটুকু দূর হয় নাই; মুখের ভাব অতি সুন্দর ও শান্তি-পূর্ণ, দেখিলে এই প্রতিমার চিত্রকরের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না;—যে ব্যক্তি এই প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছে, সে হৃদয়ের সমস্ত আগ্রহ, ভক্তি ও সৌন্দর্য্যানুভূতি একত্র সঞ্চিত করিয়া এই প্রতিমার প্রত্যেক অঙ্গে কোমল মাধুর্য্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। বৃদ্ধ পুরোহিত, তাঁহার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র—কৃষ্ণ-রায়ের প্রণামী সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত। প্রায় পনের দিন পর্য্যন্ত এই মেলা থাকিবে। এ কয়েক দিন পূজার কোনও নির্দ্দিষ্ট সময় নাই, যে যখন পূজা দিতে আসিতেছে, পুরোহিত তখনই পূজায় বসিতেছেন। পূজা শেষ হইলে উপাসকমণ্ডলী সাষ্টাঙ্গে দেবচরণে প্রণাম করিতেছে, পুরোহিত তাহাদিগের গলায় 'ছোত্‌ড়া'য় গাঁথা পুষ্পবিল্বল এক এক গাছি মালা পরাইয়া দিতেছেন; তাহারা দেবতার যৎকিঞ্চিৎ প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইয়া যাইতেছে। উপহার দ্রব্যের সংখ্যা নাই, শত শত লোক 'খাব্‌রে,' 'ভাঁড়' ও ঘটিতে করিয়া দুধ লইয়া গিয়াছে; সেই দুধে বড় বড় জালা ভরিয়া উঠিয়াছে! এক এক দিন কৃষ্ণরায় দুধ ও গঙ্গাজলে স্নান করেন। নারিকেল, ইঁচড়, পেঁপে, বেল, পেয়ারা, ডালিম, এমন

কি, শিম, বেগুন, উচ্ছে, করলা প্রভৃতি তরকারীও প্রচুরপরিমাণে জমা হইয়াছে,—যাহার গাছের যে ফলটি ভাল ও বড়, যে যে জিনিসটি কৃষ্ণরায়ের নামে রাখিয়াছে, এখন সেইটিই তাঁহাকে আনিয়া দিতেছে; এত সুবৃহৎ উৎকৃষ্ট ফল কখনও বাজারে বিক্রয় হইতে দেখা যায় না। বিভিন্নজাতীয় এত রকম ফলের আমদানী দেখিয়া এই উৎসবকে কাহারও কাহারও 'কৃষিপ্রদর্শনী' বলিয়া ভ্রম হওয়া অসম্ভব নহে। এই মেলার কয় দিন পুরোহিতেরা যে দক্ষিণা পান, এবং ঠাকুরকে যে সকল জিনিস উপহার দেওয়া হয়, তাহা তাঁহাদের সংবৎসরের খরচের পক্ষে যথেষ্ট।

কৃষ্ণরায় কত দিনের প্রতিমা, তাহা কেহ ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। কিন্তু ইহা কৃষ্ণনগর রাজপরিবারের সম্পত্তি; যাহাতে সংবৎসর বিগ্রহের সেবা চলিতে পারে, সে জন্য কৃষ্ণনগরের রাজসরকার হইতে দেবত্র সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে। কৃষ্ণরায় সারা বৎসর এখানেই বাস করেন, কেবল প্রতি বৎসর 'বারো দোলে'র সময় অন্যান্য বিগ্রহের ন্যায় তাঁহাকেও কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে লইয়া যাওয়া হয়; সেখানে কিছু দিন অবস্থান করিয়া পুরোহিতরূপী বাহকদিগের স্কন্ধে আরোহণ পূর্ব্বক তিনি স্বমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শুনা যায়, পূর্ব্বকালে এই অঞ্চলের এক জন লোক নারায়ণকে পুত্ররূপে পাইবার জন্য তপস্যা করিয়াছিল। তপস্যার ফলে সে নারায়ণের প্রস্তরমূর্ত্তি মাটীর নীচে প্রোথিত আছে, এরূপ স্বপ্ন দেখিতে পায়; এবং স্বপ্নাদেশে এই মূর্ত্তি তুলিয়া তাহা উপযুক্ত চিত্রকরের দ্বারা চিত্রিত করাইয়া এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করে।

কৃষ্ণরায় এখন ঠাকুরাণীহীন; সাধারণ কথায় যাহাকে 'লক্ষ্মীছাড়া' বলে, তাহাই! কিন্তু লক্ষ্মীহীন হইয়াও তিনি স্বমহিমায় নিত্যভাবে বিরাজিত; তাঁহার ঠাকুরাণীটি অনেক দিন হইল, গত হইয়াছেন। বহুকাল পূর্ব্বে একবার কৃষ্ণরায়ের মন্দিরদ্বার ভাঙ্গিয়া চোরে ঠাকুরাণীর অঙ্গ হইতে অলঙ্কারগুলি চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, ঐ সকল তস্কর হিন্দু নহে, মুসলমান, সুতরাং প্রভুর এলাকার বাহিরে; তিনি তাহাদিগকে কোনও শাস্তি দিতে পারিলেন না!—কিন্তু পুরুষের রাগ কোথায় যাইবে? 'চোরের উপর রাগ করিয়া মাটীতে ভাত খাওয়া' শুধু হিন্দুর পক্ষে খাটে না, হিন্দুর দেবতার নিকটেও এই উক্তি গ্রাহ্য! মুসলমানেরা ঠাকুরাণীকে স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া অপবিত্রজ্ঞানে তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। ঠাকুরাণী মনোদুঃখে তদবধি মন্দিরের অদূরবর্ত্তী দীঘিতে আশ্রয় লইয়াছেন। তাহার পর ঠাকুর আর দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন নাই; পাত্রীর অভাবে অথবা সেবাইতের অমনোযোগে, বলা যায় না।

মন্দিরের সন্নিকটেই মেলা বসিয়াছে। দুই ধারে সারি সারি অনেক দোকান, মধ্যে সরু রাস্তা; এক এক রকম জিনিসের দোকান এক এক দিক অধিকার করিয়াছে। দোকানগুলি অস্থায়িভাবে নির্ম্মিত, কিন্তু তাহা হইলেও যাহাতে মাঘের হিমে দোকানদারগণ কোনও কষ্ট না পায়, তাহার বন্দোবস্ত আছে। মণিহারী জিনিসের দোকানই বেশী, তাহাতে 'নূতন পঞ্জিকা' হইতে রামরাজা-মার্কা তাস, দৌপদীর বস্ত্রহরণ ও ভীষ্মের শরশয্যা প্রভৃতির ছবি, নানা রকম কাচের জিনিস, খেলানা, কাঠের ও টিনের হাতবাক্স, লোহার কড়াই, হাতা বেড়ি, খাঁচা, এমন

কি, রঙ্গ বেরঙ্গের কম্ফর্টার, ছেলেদের উলের টুপি, মোজা, দেশলায়ের বাক্স,—কিছুরই অভাব নাই। যাত্রীরা দোকানের সম্মুখে অনেকে একত্র দাঁড়াইয়া নিজের পছন্দমত জিনিস দর করিতেছে; বৃদ্ধেরা ছোট ছোট নাতি-নাতিনীদিগের জন্য কাঠের ঘোড়া, মানুষ, মাটীর ছোট ছোট পুতুল কিনিতে অত্যন্ত ব্যস্ত।

মণিহারী দোকানের পর নানা রকমের দোকান। বাসনের দোকানে রাশি রাশি বাসন বিক্রয় হইতেছে; বড় বড় ঘড়ার উপর 'পরাত' থালা প্রভৃতি রাখিয়া তাহাতে নানা রকম বাসন সাজান হইয়াছে; একটা দোকানে পুরাণো লণ্ঠন ও ভাঙ্গা পোর্টম্যাণ্টো মেরামত হইতেছে। শুধু টিন ও কাচের কারখানা। দোকানদার কিরূপ কৌশলে কাচ কাটিতেছে, তাহাই দেখিবার জন্য অনেকে দোকানের চারি দিকে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

একটা দোকানে শুধু বাঁশের বাঁশী; ছেলেরা বাঁশী পরীক্ষা করিতেছে; সেখান হইতে শুধু চোঁ বোঁ পোঁ শব্দ উঠিতেছে! দোকানদার একটা বাঁশী আড় করিয়া ধরিয়া তাহার ছয়টা ছিদ্রে দ্রুত অঙ্গুলি-চালনা করিয়া গ্রীবাভঙ্গীপূর্ব্বক ক্রমাগত বাজাইয়া যাইতেছে; তাহার গলার শিরা ফুলিয়া উঠিতেছে, দম আট্‌কাইবার উপক্রম হইতেছে, কিন্তু বিরাম নাই। বাঁশীর সুরে আকৃষ্ট হইয়া অনেক কৃষিকর্ম্মবিরত কৃষকযুবকও বাঁশী কিনিবার উমেদারিতে রাশীকৃত বাঁশী ওলট্‌-পালট্‌ করিতেছে, কিন্তু ঠিক মনের মতটি মিলিতেছে না! এ দিকে দোকানদারও ছাড়িবার পাত্র নহে; কোনটা ক্রেতার পছন্দ না হইলেই, সে সেই বাঁশীটা হাতে লইয়া তাহা নাক দিয়া বাজাইয়া, দেখাইবার চেষ্টা করিতেছে—

এমন বাঁশী আর নাই, এত উৎকৃষ্ট আওয়াজ এই একটিতেই সম্ভবে। স্ত্রীলোকদের দল ঘোমটা টানিয়া তফাৎ দিয়া সরিয়া যাইতেছে। বৃন্দাবনে একটা বাঁশের বাঁশীতে অনেক দিন আগে একটা দারুণ অনর্থ ঘটিয়াছিল, তাই এতগুলি বাঁশী একত্র দেখিলে মনে বুঝি বড় আতঙ্ক হয়! ঠিক বলা কঠিন এই অগণ্য যাত্রীপুঞ্জের মধ্যে বাঁশের বাঁশী শুনিয়া নূতন করিয়া কাহারও মনে উদিত হইয়াছিল কি না,—

"যে দেশে বাঁশীর ঘর, যে দেশে না যাব,
ঝাড়ে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসা'ব।"

ময়রাপটীতে সারি সারি সন্দেশের দোকানগুলাতেও ক্রেতার সংখ্যা অল্প নয়। জুতাপটী একটু তফাতে। সেখানে নানারকমের জুতা বিক্রয় হইতেছে। 'নাগরা' জুতার খদ্দেরই অধিক। দুই তিনখানা 'বটতলার বহি'র দোকানে অনেক 'খুট-আখুরে' ক্রেতা জড় হইয়াছে; কেহ 'এবার পুজোয় বাঁচা ভার, বৌ চেয়েছে চন্দ্রহার', কেহ 'হায় রে মজার শনিবার' প্রভৃতি চটী বহির কদর্য্যরসিকতাপূর্ণ ছত্রগুলি বানান করিয়া পড়িতেছে, সর্ব্বত্র ভাবগ্রহ হইতেছে না, কিন্তু তাহাতেই যে রস পাইতেছে, তাহা তাহাদের সন্তোষের পক্ষে অনেক অতিরিক্ত! তাহা পড়িয়াই মুখবিবরে হাস্য আবদ্ধ করিয়া রাখা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে, এবং পুস্তকের মলাটে ছাপার অক্ষরে ছয় আনা দাম লেখা থাকিলেও, তাহা নগদ দুই পয়সা মূল্যে কিনিতে পাইয়া তাহারা আপনাদিগকে যৎপরোনাস্তি লাভবান্ মনে করিতেছে।

একটু তফাতে একটা যায়গায় ছোট ছোট 'টোঙ্গ' তুলিয়া কয়েক জন বেদে খেলা দেখাইবার জন্য আড্ডা গাড়িয়াছে; তাহাদের সঙ্গে

অনেকগুলি ছোট বড় ঝুড়িতে নানাজাতীয় সাপ, দুইটি বৃহৎ ছাগল, দুইটি বানর ও একটা ভালুক। ভালুকটির ঘণ্টায় তিন চারি বার জ্বর আসিতেছে, আর সে উবু হইয়া পড়িয়া কাঁপিতেছে! ছাগল দুটি কাঁটালের পাতা খাইতেছে, এবং একটা বানর আর একটা বানরের হস্তে আপনার মস্তকটি সমর্পণ পূর্ব্বক ঘাড় বাঁকাইয়া অতি সুস্থিরভাবে বসিয়া আছে, দ্বিতীয় বানরটি তাহার সঙ্গীর মস্তকের উকুন বাছিতে অত্যন্ত ব্যস্ত! চারিদিকের এই বিপুল জনতা ও কলরবের প্রতি সে সম্পূর্ণ উদাসীন! ইহার একটু দূরে আর একটা অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর কুটীরের সম্মুখে একটা বৃহৎ নিশান উড়িতেছে; নিশানের নীচে একটা লাল-নীল রঙ্গের পর্দ্দার সম্মুখে একখানি সাদা কাগজের সাইনবোর্ড মোটা মোটা অক্ষরে লেখা আছে,—"অতি আশ্চর্জ্জ ভেল্‌কি! ভানুমোতির হরেক রকম ভোজবাজি!! দর্সনি এক 'এক পএসা!!!" এক জন লোক এই কুটীরদ্বারে বসিয়া একটা খেলো হারমোনিয়ম্ বাজাইতেছে, আর একটা লোক-গায়ে একটা গঞ্জীফ্রক, গলায় নানা রঙ্গের বাহারে কম্ফটার জড়ান—ষাঁড়ের মত মোটা গলায় বিদ্যাসুন্দরের একটা টপ্পা গায়িয়া রসপিপাসু কৌতূহলাক্রান্ত পল্লীযুবকদিগের বিক্ষিপ্ত চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে। দলে দলে লোক দ্বারপ্রান্তে জমা হইতেছে, এবং সেখানে এক একটি পয়সা দর্শনী দিয়া কুটীরের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ভেল্‌কী দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া যেরূপ ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিতেছে, তাহা হইতে ভাল মন্দ কিছুই বুঝা যাইতেছে না।

ক্রমে বেলা প্রায় দুই প্রহর অতীত হইল। যাত্রিদল কিছু কালের জন্য স্নানাহারের চেষ্টায় চলিল। মেলার কাছে যে দীঘি আছে, তাহাতে

বেশী জল নাই। সেই জানুপ্রমাণ জলে দাঁড়াইয়া অনেকে স্নান করিতেছে, এবং কলার পাতায় চিঁড়াদৈয়ের ফলার ভিজাইয়া দীঘির পাড়ে বসিয়াই তদ্দ্বারা ক্ষুধানিবৃত্তি করিতেছে।

অনেকে গ্রামস্থ আত্মীয় কুটুম্বের বাড়ী মধ্যাহ্নের মত আশ্রয় গ্রহণ করিল। দলে দলে লোক ব্রাহ্মণ ও মুসলমানের হোটেলে বসিয়া তেল মাখিয়া তামাক টানিতে লাগিল। চন্-চন্ করিয়া মধ্যাহ্নের রৌদ্র 'পড়িতেছে'। দূরে অনেকগুলি গরুর গাড়ী; সেই সকল গাড়ীতে যাত্রীরা বিভিন্ন গ্রাম হইতে মেলা দেখিতে আসিয়াছে, গাড়োয়ানেরা অশ্বত্থ গাছের নীচে তিউড়ি কাটিয়া ভাত রাঁধিতেছে; বলদ ও মহিষ-গুলি ধূলার উপর শরীর ঢালিয়া দিয়া জাবর কাটিতে কাটিতে পথশ্রম দূর করিতেছে। কিন্তু এই প্রচণ্ড মধ্যাহ্নেও মেলার কাছে জনতার হ্রাস হয় নাই। এখনও জোড়া জোড়া চাষার ছেলে নাগরদোলার উপর বসিয়া মহানন্দে দুলিতেছে, এবং সাত আটটি ছেলে কাঠের ঘোড়াবিশিষ্ট আর এক রকম দোলায় বসিয়া ঘুরপাক খাইতেছে; তাহারা শক্ত হইয়া ঘোড়ার পিঠে বসিয়া আছে, আর দোলা'র মালিক সেই ঘোড়াগুলিকে বন্-বন্ করিয়া ঘুরাইতেছে। ভিন্ন গ্রামের মেয়েরা কুমোরের দোকানে পাঁচ ছয়টা 'চাকা' হাঁড়ি কিনিয়া সেগুলি লম্বা কাপড়ে সারি করিয়া বাঁধিয়া বেলা থাকিতে থাকিতেই গৃহমুখে চলিয়াছে; এবং চাষার ছেলেরা ও দূরগ্রামস্থ ভদ্রলোকের চাকরেরা চারি পাঁচ পয়সা মূল্যে এক এক আঁটি আখ কিনিয়া কাঁধে লইয়া ঘরে ফিরিতেছে; কেহ বা এক আধখানা আখ লুব্ধদন্তে ছুলিয়া তাহার রস উপভোগ করিতে করিতে গৃহের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কেবল হিন্দু দেব-দেবীর

নিন্দাকুৎসা ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মাহাত্ম্যপ্রচারের অভিপ্রায়ে রতনপুরের পাদরী সাহেব, টমাস্ বিশ্বাস, ড্যানিয়েল রাহা ও সলোমন দাস প্রভৃতি দেশীয় খ্রীষ্টানবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া সকাল হইতে অতি ওজস্বিনী ভাষায় তারস্বরে যে বক্তৃতা করিতেছিলেন, আপাততঃ তাহাতে বিরত হইয়া এখন অন্নচিন্তায় ব্যস্ত আছেন। কিন্তু নেড়ানেড়ীর দলের গানের আর বিরাম নাই! তাহারা দলে দলে কাঁথা পাতিয়া তাহার উপর বসিয়া গিয়াছে; পাশে প্রকাণ্ড ঝুলি, ময়লা কাপড়ের পুঁটুলী, গায়ে নানা রঙ্গের কাপড়ের বহুতালিবিশিষ্ট আলখেল্লা, সম্মুখে জীর্ণবস্ত্র প্রসারিত; গৌরপ্রেমে মগ্ন এই বাবাজীদিগের প্রতি কৃপা করিয়া,—যাহার যাহা ইচ্ছা—এই বস্ত্রখণ্ডের উপর সে তাহা দান করিয়া যাইতেছে। নেড়ানেড়ীর দলের পাঁচ সাত জন স্ত্রীপুরুষ চক্রাকারে বসিয়া অত্যন্ত উৎসাহে গান গায়িতেছে, পুরুষদের হাতে ময়লা লাল 'একরঙ্গা'-বেষ্টিত 'গাব্‌গুবাগুব্'; তাহারা মাথা নাড়িয়া সুদীর্ঘ দাড়ীর নানারকম ভঙ্গী করিয়া একটা ছোট কাটী দিয়া অত্যন্ত ক্ষিপ্রহস্তে তাহাদের বাদ্যযন্ত্রের তন্ত্রীতে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতেছে, আর নাকে রসকলি-কাটা, ভ্রূযুগলের মধ্যে বা অধরের নিম্নে উল্‌কী-পরা, রৌপ্যবলয়বেষ্টিতপ্রকোষ্ঠা 'বোষ্টুমী'র দল খঞ্জনীতে মৃদুমন্দ ঘা দিয়া তীক্ষ্ণ বামাকণ্ঠে চারি দিক ধ্বনিত করিয়া গায়িতেছে,—

"ব্রজের শ্যাম! ব্রজে চল, দিনেক দু'দিন তরে,
বারেক দেখা দিয়ে, প্রাণ বাঁচিয়ে, এসো তুমি ফিরে.
ধ'রে রাখবো না হে!—"

শ্রীপঞ্চমী

শ্রীপঞ্চমী

বাঙ্গালা দেশের পল্লী অঞ্চলে সাধারণ ভদ্রলোকের মধ্যে মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতীপূজা উপলক্ষে যেরূপ উৎসাহ দেখা যায়, সেরূপ বোধ হয় আর কোন উৎসবেই দৃষ্ট হয় না। শীতের প্রারম্ভ হইতেই আমাদের গোবিন্দপুরে বড়বাজারের পাণ্ডারা সরস্বতীপূজার আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া উঠে। বিশেষতঃ, গত বৎসর বড়বাজারে তেমন ধূমধামে সরস্বতীপূজা হয় নাই বলিয়া, বৌবাজারের দল জন্মাষ্টমীর প্রতিমা বাহির করিয়া নগরপ্রদক্ষিণ করিবার সময় ছোট বড় নানা রকম নিশান উড়াইয়া, পাখাওয়ালা বড় বড় ঢাক বাজাইয়া, এবং ময়ূরপঙ্খীতে চড়িয়া দলে দলে সারি গান গায়িয়া বড়বাজারের পাণ্ডাদিগকে যেরূপ ধিক্কার দিয়াছিল, ও বিদ্রূপপূর্ণ ছড়া কাটিয়া তাহাদের অক্ষমতার প্রতি ব্যঙ্গোক্তি বর্ষণ করিয়াছিল, তাহাতে বড়বাজারের পাণ্ডারা লজ্জায় মরিয়া গিয়াছিল; এবং অবিলম্বে সকলে মিলিয়া রামচরণ দফাদারের দোকানে এক বৈঠক বসাইয়া ঠিক করিয়াছিল যে, যদি এবার সরস্বতী পূজায় অসাধারণ ধূমধাম করিতে না পারে ত তাহারা আর কখনও বারোয়ারী করিবে না, দড়ী কলসীর আশ্রয় লইতে হয়, সেও বরং ভাল! উৎসাহে কয় রাত্রি তাহাদের নিদ্রা হয় নাই।

ইতিপূর্ব্বে কৈলাস পরামাণিকের হস্তেই বড়বাজারের দোকানদার-বর্গের নেতৃত্ব ন্যস্ত ছিল। কৈলাস বড়বাজারের বিখ্যাত আড়তদার

নীলমণি নন্দীর গদিয়ান বা প্রধান কার্য্যকারক। নীলমণির বাড়ী ফরাস-ডাঙ্গা। তাহার পিতার আমল হইতেই গোবিন্দপুরে তাহাদের কারবার চলিতেছে। দেশী ও বিলাতী কাপড় ভিন্ন তাহাদের আড়তে ধান, চাউল, তুলা, লবণ, সুতা ও লোহা প্রভৃতি নানা রকম জিনিস বিক্রয় হয়, এবং এক সময়ে এই দোকানই গোবিন্দপুরের মধ্যে 'সেরা' দোকান ছিল, কিন্তু গোবিন্দপুরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাজারে দোকানপাটের বৃদ্ধি হওয়াতে কিছু দিন হইতে নীলমণির দোকানের কাজ কর্ম্ম কিছু 'মন্দা পড়িয়াছে'; এমন কি, চাকর বাকরদের বেতন দিয়া ও দোকানের খরচ-পত্র সরবরাহ করিয়া বেশী কিছু লাভ থাকে না। তাই নীলমণি একবার 'মোকামে' আসিয়া ব্যবসায়ের অবস্থা দেখিয়া বড়ই অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া গিয়াছিল, এবং দোকানখানি উঠাইয়া দিতেই কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। কিন্তু ব্যবসায় করিতে বসিয়া এখানে তাহার যে বিশ হাজার টাকা 'বিলাত' পড়িয়াছে, তাহার একটা 'কিনারা' না করিয়া কিছুতেই ব্যবসায় বন্ধ করা যায় না বলিয়া, নীলমণি নন্দী অগত্যা তাহার এই কারবার চালাইতে বাধ্য হইয়াছে।

কৈলাস প্রভৃতি কর্ম্মচারিবর্গ দেখিল, বিষম বিপদ; 'বিলাত' বাকীগুলি আদায় হইলেই তাহাদের চাকরী যায়! তাই তাহারা 'বিলাত' আদায়ের জন্য তেমন চেষ্টা করিল না। এমন সুখের চাকরী কি সহজে ছাড়া যায়? কোন চেষ্টা নাই, পরিশ্রম নাই; বাজারের ঠিক মধ্যস্থলেই দোকান, মাছ তরকারী প্রভৃতি যে কিছু ভাল খাদ্যসামগ্রী বিক্রয় হইতে আসে, তাহা তাহারাই আগে কিনিয়া লয়; মধ্যাহ্নে দিব্য নিদ্রা ভোগের সুযোগ আছে; বৈকালে উঠিয়া কেহ কাশীদাসের মহাভারতখানি হাতে লইয়া

বসে, কেহ পাঁচু কুণ্ডুর দোকানে পাশার 'কচেবারো' আরম্ভ করে; কেহ বা গল্পের ভাণ্ডার খুলিয়া দেয়। প্রভুর অন্নে দেহ পুষ্ট হইতেছে, অবাধে ভুঁড়ির পরিধি বাড়িতেছে; সকলেই 'হাম্‌সে দিগর নাস্তি' হইয়া ক্ষুদ্র বাজারের মধ্যে নিঃসঙ্কোচে মোড়লী করিতেছে; কিন্তু কাহারও মানসম্ভ্রম পসার প্রতিপত্তি কৈলাসের মত নহে। আদালতের পেয়াদা ও গ্রাম্য জমীদারের বরকন্দাজগুলাও মাথা নোয়াইয়া কৈলাসকে সেলাম করে! গ্রামস্থ থানার জমাদার জনাবালী মিঞা পর্য্যন্ত পোষাকে সজ্জিত হইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া তদন্তে যাইবার সময় বিরল শ্মশ্রুজালে হস্তার্পণ পূর্ব্বক স্মিতমুখে বলে, "কেয়া কৈলাছ্ বাবু! তবিয়ৎ আচ্ছা হ্যায়?" শুনিয়া কৈলাস সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া উদরে হাত বুলাইয়া উত্তর করে, "হুজুরের মর্জ্জি, যেমন রেখেছেন, তেমনই আছি।" কৈলাসের এই অসাধারণ সম্মান দেখিয়া বাজারের লোক সবিস্ময়ে ভাবে, "বাপ রে! সরকার বাহাদুরের কাছে পরামাণিকের পোর কি খাতির!"

সুতরাং বলা বাহুল্য, গোবিন্দপুরের বাজারে কৈলাসের অসাধারণ প্রভুত্ব। বাজারের মধ্যে কেহ কোন অন্যায় কাজ করিলে কৈলাসই তাহার বিচার করিত; এবং সে যে দণ্ডবিধান করিত, অপরাধীকে নত-মস্তকে তাহাই স্বীকার করিয়া লইতে হইত। এইরূপে কৈলাসের মারফত অনেক টাকা জরিমানা আদায় হইত। তাহার কিয়দংশ ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ ফরিয়াদী পাইত; অবশিষ্টাংশ বাজারের বারোয়ারীর তহবিলে জমা হইত। কোন দোকানীর নিকট বাজারের কোন দোকানদারের দেনা থাকিলে সেজন্য আদালতে নালিশের প্রথা ছিল না; কৈলাস প্রবল যুক্তি তর্কের সাহায্যে সপ্রমাণ করিত যে, যে টাকাটা উকীলের রসুনে,

পেয়াদার রোজে, সাক্ষীর বারবরদারীতে, আরজির 'ইষ্টাম্পে' ও আমলা বাবুদের পূজায় ব্যয় হইবে, তাহার অর্দ্ধেক টাকা বারোয়ারীতে দান করিলে ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ ফলই লাভ হইবে। বলা বাহুল্য, কেহ কখনও সাহস করিয়া কৈলাসের এ যুক্তি খণ্ডনের চেষ্টা করে নাই। গ্রামে কাহারও কন্যার বিবাহ উপস্থিত হইলে কৈলাস বিবাহের সাত দিন পূর্ব্ব হইতে বিবাহবাড়ীতে 'পাক পাড়িতে' আরম্ভ করে, এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে বরকর্ত্তার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ চাঁদা প্রাপ্তির আশায় অতি ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করে; কিন্তু দৈবক্রমে যদি বড়-বাজারের বারোয়ারীর পাণ্ডা নবীন হালদার কিছু চাঁদা আদায়ের আশায় সে দিকে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে কৈলাস সদলবলে তাহাকে এমন আক্রমণ করে যে, সে বেচারী পলায়ন করিবার পথ পায় না! সত্য সত্যই গোবিন্দপুরে বড়বাজারের এলাকা অনেকদূর বিস্তৃত, এবং এই জন্যই বিবাহাদি শুভকার্য্যে বড়বাজারে অনেক টাকা চাঁদা আদায় হয়। বড়বাজারে দোকানদারদের ঘরে যে 'ঈশ্বরবৃত্তি' জমা হয়, তাহাও বৌবাজার অপেক্ষা অনেক অধিক; কিন্তু তথাপি বৌবাজারের কয়েক ঘর দোকানদার যে জন্মাষ্টমীর সময় বারোয়ারীর উৎসবে অত্যন্ত ধূমধাম করে, তাহা কেবল গোবিন্দপুরের অন্যতম জমীদার মজুমদার বাবুদেরই অনুগ্রহে।

কয়েক বৎসর হইতে বাহাদুরী প্রদর্শনের জন্য এই মজুমদার বাবুদের সঙ্গে চাটুয্যে জমীদারদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে! চাটুয্যেরা যখন দেখিলেন যে, মজুমদারেরা বৌবাজারের দলের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন, তখন বড়বাজারের দলের প্রতি ক্ষমবেদনায়

তাঁহাদের হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিল, তাঁহারা বড়বাজারের বারোয়ারীর পৃষ্ঠ-পোষকতায় প্রবৃত্ত হইলেন।

এতদ্ভিন্ন বড়বাজারের দলের সহিত চাটুয্যে বাবুদের সহানুভূতির আরও একটু কারণ ছিল। একে ত চাটুয্যেরা বড়বাজারের প্রতিবেশী; তাহার উপর স্বগায় জমীদার দেবনাথবাবুর এক পুত্র চন্দ্রনাথ কিছুদিন হইতে বড়বাজারে মুদীখানার এক দোকান খুলিয়াছেন; তৈল, লবণ, তামাক, ঘি ও ময়দা প্রভৃতি জিনিস দোকানে বসিয়া বিক্রয় করিতে প্রথম প্রথম এই জমীদারপুত্রের বড়ই বাধ-বাধ ঠেকিত, এবং সকালে কি বিকালে বন্ধুবান্ধবগণের সহিত দেখা হইলে তিনি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভাবে বলিতেন, "চুপ করে' বসে' থাকা আর পোষায় না। চাকর বাকরদের একটা দোকান করে দেওয়া গেছে; তারা কি রকম কাজ কর্ম্ম করে না করে, তদারক করতে এক একবার এ দিকে আসতে হয়।" প্রথম প্রথম দোকান করিতে তিনি এইরূপ সঙ্কোচ বোধ করিলেও অবশেষে যখন দেখিলেন যে, সামান্য পৈত্রিক আয়ে আর সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, এবং সখের খাতিরে দোকান করাও চলে না, তখন তিনি আপনার জমীদার-গর্ব্বটা একটু খর্ব্ব করিয়া বাজারে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই সময় হইতে বৃদ্ধ কৈলাসের প্রভুত্ব বিলুপ্ত হইল; কিন্তু চন্দ্রনাথ কৈলাসের প্রতি কখনও অসম্মান প্রদর্শন করেন নাই।

জমীদারের ছেলেকে দোকান করিতে দেখিয়া বৌবাজারের পাণ্ডা-দের পরিহাসস্পৃহা অতিশয় প্রবল হইল। জন্মাষ্টমীর সময় তাহারা এক সং বাহির করিল, তাহাতে চন্দ্রনাথের প্রতি অশিষ্ট ইঙ্গিত ছিল। বৌবাজারের দল জমীদাররূপী একটি পুত্তলিকার হস্তে তৌলদণ্ড দিয়া

তাহাকে পথে বাহির করিয়াছিল। এই পুত্তলিকার পরিধানে মিহি শান্তি-পুরে ধুতি, গায়ে ইস্ত্রীকরা শার্ট, বুকে চেন, পায়ে মোজা ও জুতা, মাথায় চেরা সিঁথি, কিন্তু বাম হস্তে দাঁড়ি বাটখারা! সং দেখিয়া সকলেই তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিল। তাহার উপর 'কি মজা হালের দোকানদারী',—এই গান! ক্রোধে ক্ষোভে যুবক চন্দ্রনাথ বিচলিত হইয়া উঠিল। প্রথমে সে সঙ্কল্প করিল, একটা মানহানির মামলা করিয়া বৌবাজারের বারোয়ারীর পাণ্ডাদের সকলকে সদলে জেলে পুরিবে। কিন্তু কোনও প্রবীণ উকীল যখন পরামর্শ দিলেন যে, "বাপু! আদালতে তোমার মামলা টিকিবে না, উপরন্তু অপমানের একশেষ হইবে। দোকান করিতে লজ্জা বোধ হয়, ও কর্ম্ম ছাড়িয়া দাও, ক্ষেপিলে লোকে আরও বেশী করিয়া ক্ষেপাইবে।"—তখন চন্দ্রনাথ মানহানির মামলা ছাড়িয়া সরস্বতীপূজায় অধিক সমারোহে সং বাহির করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল;—বাজারে রটাইয়া দিল, "ধনপ্রাণ যায় যাক্, এবার বেটাদের জব্দ করবো।" শুনিয়া বৌবাজারের দল হাসিয়া বলিল, "এবার পিঁপড়ের গর্ত্ত খুঁজ্‌তে হচ্ছে!" বৌবাজারের গানের ওস্তাদ নিমচাঁদ বিশ্বাস গোঁফে চাড়া দিয়া বলিল, "আমরাও উতোর কাট্‌তে জানি।"

চন্দ্রনাথের চেষ্টায় ও উৎসাহে বড়বাজারে প্রচুর চাঁদা উঠিতে লাগিল; দোকানদারেরা লাভের উপর প্রতি টাকায় এক আনা করিয়া চাঁদা দিতে প্রস্তুত হইল। এবার কৃষ্ণনগরের কুমোর আসিয়া প্রতিমা নির্ম্মাণ আরম্ভ করিল। অগ্রহায়ণ মাস পড়িতে না পড়িতে বাজারে প্রতি সন্ধ্যায় বৈঠক বসিতে লাগিল। এবার কি কি রকমের সং বাহির হইবে, কাহার যাত্রার দল 'বায়না' করা হইবে, এবং কয় রাত্রি যাত্রা হইবে,

খেম্‌টা ও কবির দল বায়না করিবার সুবিধা হইবে কি না, বৈঠকে এই সকল আলোচনা চলিল। উৎসাহ, উদ্দীপনা, উত্তেজনার অন্ত নাই! সকলে সোৎসাহে বলিতে লাগিল, "ধন্য চন্দোর বাবু! না হবে কেন? জমীদারের ছেলে, দু'দিনেই বাজারটাকে সরগরম ক'রে তুলেছে।"

সরস্বতীপূজার তিন দিন পূর্ব্ব হইতেই বাজারের শ্রী ফিরিয়া গেল! বাজারের প্রবেশপথে প্রকাণ্ড বংশ-তোরণ, তাহার উপর নহবৎখানা, তাহার উপরিভাগ লাল 'টুলে'র কাপড়ে ঢাকা; চূড়ায় লাল নিশান উড়িতেছে। প্রভাতে ও সন্ধ্যায় শ্যামনগরের রসুনচৌকীদল এই নহবৎখানায় বসিয়া আপনাদের গুণপণায় পল্লীবালকদিগকে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে। শানাই মিষ্ট নহে, এবং ঢোলকের বাজনা বেসুরো হইয়া গিয়াছে। তথাপি সেই বাজনা শুনিবার জন্য গ্রামের সব ছেলে বাজারে আসিয়া জুটিয়াছে; কারণ, এমন উৎসব সচরাচর ঘটে না! বাজারের মধ্যে চাটাইয়ের টাপোর বাঁধা হইয়াছে; তাহার নীচে সাদা চাঁদোয়া, লাল ঝালর, তাহার এক প্রান্তে লাল কাপড় কাটিয়া চাঁদোয়ার মালিকের নাম ও সন তারিখ লেখা। চাঁদোয়ার নীচে কতকগুলি বেল ও ঝাড় ঝুলিতেছে; চারি দিকে বাঁশের খুঁটিগুলি মৃত্তিকানুলিপ্ত হইয়া স্তম্ভে পরিণত হইয়াছে, তাহা লাল কাপড়ে ও সোনালি জগ্‌জগায় মণ্ডিত, তাহার গায়ে একটা করিয়া দেয়ালগিরি আঁটা, এবং প্রত্যেক দেয়াল-গিরির নীচে এক একখানা 'আর্টষ্টুডিওর' পট বা বিলাতী ছবি শোভা পাইতেছে। কিন্তু সেই ছবিগুলিতে রুচিগত সামঞ্জস্যের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না; এক স্থানে মদনভস্মের ছবি, তাহারই পাশে হয় ত ইন্দ্রের নন্দনকাননের চিত্র,—অত্যন্ত অশ্লীল; তৎপর বিলাতী

দম্পতীর মিলনদৃশ্য; চক্ষু ফিরাইলেই দেখা যায়, তাহার পাশের ছবি-খানিতে যমুনাতীরে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীদের লাল নীল পীত বর্ণের বস্ত্র ও ঘাগ্‌রা অপহরণ করিয়া কদম্ববৃক্ষে উঠিয়াছেন, গোপকন্যাগণ যমুনাজলে আবক্ষ নিমগ্ন হইয়া যুক্তকরে ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে হৃত বসন ফিরিয়া চাহিতেছে।—তাহার পরেই একখানি বিলাতী শিকারীর ছবি,—উপরে নীল আকাশ, দূরে ধূসর গিরিশ্রেণী, দুইধারে শ্যাম-স্নিগ্ধ বনানী, এক পাশে বঙ্কিম গিরি-নদী, তীরে দুই একটা গাছ, ঘোড়ার উপর লোহিতপরিচ্ছদ-ধারী শিকারী, তাহার হাতে বন্দুক, সঙ্গে একপাল কুকুর। দেখিলেই একটি উৎসাহশীল, শ্রমসহিষ্ণু, স্বাধীন জাতির স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি ও বলিষ্ঠ মনুষ্যত্বের কথা মনে পড়িয়া যায়, এবং তাহার পাশে ঐ ইন্দ্রের নন্দনবন, ও কৃষ্ণের বস্ত্রহরণদৃশ্য তাহাদের রসমাধুর্য্য এবং বঙ্গীয় চিত্রকরগণের অতিরঞ্জিত অমার্জ্জিত কলাকৌশলের সহিত একবারে মলিন হইয়া পড়ে!

আজ কাল বাজারে মণিহারী দোকানে কেবল খাকের কলম ও কলমীর 'ছড়' বিক্রয় হইতেছে; ক্রেতারা সকলেই দুই চারিটি কিনিয়া লইয়া যাইতেছে। অনেকে শুধু এই 'ছড়' কিনিবার অভিপ্রায়েই দূর-বর্ত্তী গ্রাম হইতে বাজারে আসিয়াছে। এই কলম সরস্বতীপূজার একটা অপরিহার্য্য উপকরণ।

সরস্বতীপূজার পূর্ব্বদিন স্কুল ও পাঠশালা দেড়টার সময় বন্ধ হইল। পূজার ফুল তুলিবার জন্য শিক্ষক মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহাদিগকে এই ছুটীটা দিয়া থাকেন। সরস্বতীপূজার ফুলের আয়োজন না করিলে কি তাহাদের বিদ্যা হইবে? তাই আজ তিন দিন ধরিয়া ছেলেদের মধ্যে পরামর্শ চলিয়াছে, কোথায় কোন্ দল ফুল সংগ্রহ করিতে যাইবে। এই

দিন কোন কোন দল ফুলের সন্ধানে দুই তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রামে যাইতেও কুণ্ঠিত হয় না।

ছুটী হইবামাত্র ছেলেরা বাড়ী আসিয়াই কেহ সাজি, কেহ ডালা, কেহ বা একটা ধামা লইয়া পুষ্পসংগ্রহে বাহির হইল; অন্যান্য ফুল ভিন্ন, পলাশ, কাঞ্চন ও গাঁদা ফুল এ সময় খুব বেশী পাওয়া যায়। পল্লীগ্রামে প্রায় সকল গৃহস্থেরই বাড়ীর গাছে দু'চারিটা গাঁদাফুল থাকে, কিন্তু বাড়ীর ফুল তুলিবার জন্য কেহ ব্যস্ত নয়, সে ত ইচ্ছা করিলেই পাওয়া যাইবে; তাই সকলে মল্লিকদের চারাবাগানে পলাশ ও কাঞ্চন ফুলের আশায় ছুটিল। যাহারা গাছে উঠিতে জানে, তাহারা কোমর বাঁধিয়া গাছে উঠিল, অন্য সকলে তলা হইতে ফুল কুড়াইতে লাগিল; ফুল পাড়া হইলে তাহা কয়েক ভাগে বিভক্ত হইল; যাহারা গাছে উঠিয়াছিল তাহারা অবশ্য কিছু বেশী পাইল।

ফুল পাড়া হইলে ছেলেরা বক্সীদের বাগানে কুলের সন্ধানে চলিল। দেশী কুলের গাছ সকল বাড়ীতেই আছে; কিন্তু তাহার জন্য কাহারও বড় আগ্রহ নাই। নারিকেলকুলের জন্য সকলেই সচেষ্ট। সরস্বতী পূজা হয় নাই বলিয়া অনেক নিষ্ঠাবান বালক এ পর্য্যন্ত কুল খায় নাই; কারণ, অধিকাংশ পল্লীবালকেরই বিশ্বাস—সরস্বতীর ভোগে না দিয়া কুল খাইতে নাই; সরস্বতীপূজার পূর্ব্বে কোন বালককে কুল খাইতে দেখিলে তাহার ঠাকুরমা তাহাকে 'বেসবৎ' বলিয়া তিরস্কার করিয়া থাকেন। তবে যাহারা লোভ সংবরণে অসমর্থ হইয়া কুল খাইয়া ফেলে, তাহারা খাইবার পূর্ব্বে সরস্বতী দেবীকে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক কুল দান করিতে প্রতিশ্রুত হয়; কেহ পাঁচ গণ্ডা কেহ দশ গণ্ডা কেহ বা এক পণ দিবে, এইরূপ

প্রতিজ্ঞা করে। আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে একদল ছেলে একঝাঁক পঙ্গপালের মত বক্সীদের বাগানে গিয়া পড়িল; কেহ ঢিল মারিয়া, কেহ জামালকোটা বা চিতের ডাল ছুড়িয়া, কেহ বা কুলগাছের নাতিস্থূল শাখাতে নাড়া দিয়া কুল পাড়িতে লাগিল। ছোট ছোট ছেলেরা দেখিল, দুই একটা গাছে বুলবুলের দল উড়িয়া উড়িয়া ঘুরিয়া বসিতেছে, এবং সরস সুপক্ক কুলে চঞ্চুর আঘাত করিতেছে; দেখিয়া তাহাদের রসনা সিক্ত হইয়া উঠিল! তাহারা সতৃষ্ণ নয়নে সেই দিকে চাহিয়া, ক্ষুদ্র শিশুহস্ত ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া নাচিয়া নাচিয়া বলিতে লাগিল,—

বুলবুলি মোর কাকা!
কুল ফেলে দে পাকা।"

কিন্তু বুলবুলি এই সকল লুব্ধ শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রের আগ্রহপূর্ণ অনুরোধ রক্ষা করিবার পূর্ব্বেই তাহারা সভয়ে দেখিতে পাইল, বাগানের মালী দূর হইতে তাহাদিগকে কুলতলায় দেখিয়া এক হাতে একটা হুঁকা ও অন্য হাতে একগাছা মোটা লাঠী লইয়া গালি দিতে দিতে তাহাদের দিকে দৌড়িয়া আসিতেছে! ছেলেরা তৎক্ষণাৎ 'বেড় বাতাড়' ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিল। একটি ছেলে সরস্বতীকে একপণ কুল দানের প্রতিজ্ঞা করিয়া ইতিপূর্ব্বে কুল খাইয়াছে, আজ সে বারো গণ্ডার বেশী সংগ্রহ করিতে পারে নাই; এ দিকে মালীর লাঠীর ভয়, অন্য দিকে মা সরস্বতীর অভিসম্পাতের আশঙ্কা! বালক কাঁদ-কাঁদ হইয়া তাহার সঙ্গিগণের নিকট দু'পাঁচটা করিয়া কুল ভিক্ষা চাহিল, কিন্তু কেহই তাহাকে সাহায্য করিল না; কারণ গোবিন্দপুর ও তাহার সন্নিকটবর্ত্তী পল্লীসমূহে নারিকেলকুল বড়ই দুর্লভ সামগ্রী। ভগ্নমনোরথ হওয়াতে বালকের

চক্ষুঃপ্রান্তে অশ্রু উছলিয়া উঠিল। তখন অপেক্ষাকৃত বয়োবৃদ্ধ কূটবুদ্ধি একটি বালক তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "তুই কাঁদিস্ কেন? মা সরস্বতীকে এক পণ কুল দিতে চেয়েছিস্, এক পণই নারিকেলকুল দিবি, তা তো আর বলিস্‌নি; আট গণ্ডা দেশী কুল দিয়ে এক পণ পুজিয়ে দিস্।" বিপন্ন বালক অকূল সাগরে কূল দেখিতে পাইল; সে চোখের জল মুছিয়া সঙ্গিগণের সঙ্গে বাড়ী ফিরিল।

আজ রাত্রেও তাহাদের নিদ্রা নাই। চতুর্থীর চন্দ্র দেখিতে দেখিতে চারি দিক অন্ধকারে আবৃত করিয়া অস্ত গেল। ছেলেরা পাত্র সমেত ফুলগুলি (কেহ ঘরের চালে, কেহ ছাদের উপর, কেহ বা সিমের 'টালের' উপর) নীহারে রাখিয়া নৈশপুষ্পচয়নে বাহির হইল।

গ্রামের মধ্যে নিতাই বোরেগী ও বলরাম সরকার গুরুমহাশয়ের উপরই ছেলেদের অধিক আক্রোশ। নিতাইয়ের অপরাধ, তাহার আখড়ার যে সুপরিষ্কৃত তক্‌তকে আঙ্গিনাখানিতে তুলসীমন্দির আছে, তাহারই চারি দিকে অনেকগুলি গাছে অপর্য্যাপ্ত 'কাশির গাঁদা' (চন্দ্রমল্লিকা) ফুটিয়া চারি দিক আলো করিয়া থাকিত। সকালে সন্ধ্যায় সেই ফুলগুলির উপর অনেক ছেলের দৃষ্টি পড়িত; কিন্তু নিতাইয়ের সতর্ক দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া তাহারা এ পর্য্যন্ত তাহা চুরী করিতে পারে নাই। নিতাই এই ফুলগাছগুলিকে প্রাণ অপেক্ষা অধিক যত্ন করিত, এবং বসন্ত কালের মধুর সন্ধ্যায় এক একদিন দক্ষিণ দিক হইতে সুমন্দ মলয়ানিল প্রবাহিত হইয়া যখন তুলসীমুঞ্জরীর ও পীত-পাটল-কোরকবিশিষ্ট এই সকল গাঁদার অতি মৃদু অথচ মনোহর সুবাস আহরণ পূর্ব্বক সুপরিচ্ছন্ন ক্ষুদ্র আখড়াখানিকে অপূর্ব্ব সৌরভপ্রবাহে আকুল করিয়া

তুলিত, তখন সেই কৌপীনবহির্ব্বাসধারী, মুণ্ডিতমস্তক, 'রাধাকৃষ্ণ-চরণ-ভরসা' ও ছাপচর্চ্চিত-দেহ নিতাইদাস আপনার ক্ষুদ্র আখড়া-খানিকে বৃন্দাবনস্থ কোনও কুঞ্জ-কাননের অনুরূপ বলিয়াই কল্পনা করিত, এবং অদূরবর্ত্তী ক্ষুদ্রকায়া তরঙ্গিণী বৃন্দাবন-প্রান্তবাহিনী শ্যাম-সোহাগিনী যমুনা বলিয়া তাহার ভ্রম হইত; সে ভক্তিগদগদচিত্তে একটি ক্ষুদ্র মৃৎপ্রদীপ লইয়া তাহার উপাস্য দেবতা সেই তুলসীমঞ্চের পাদ-দেশে স্থাপন পূর্ব্বক 'রাধারাণী কি জয়!' বলিয়া সর্ব্বাঙ্গ লুটাইয়া পরম ভক্তি ভরে প্রণিপাত করিত, এবং অত্যন্ত পবিত্র জ্ঞানে সেই ধূলি মস্তক, কণ্ঠ ও ওষ্ঠে স্পৃষ্ট করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিত! গ্রামের ছেলেরা নিতাইয়ের এই ভক্তিবিহ্বলতা তেমন অনুকূল ভাবে দেখিত না। আজ সরস্বতীপূজার পূর্ব্ব-নিশীথে তাহারা তাহার সাধের পুষ্পকানন লুণ্ঠন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল।

গভীর রাত্রে গ্রামস্থ সকলে নিদ্রিত হইলে, তাহারা আখড়ার সমস্ত ফুল অপহরণ করিল। এক দল অপেক্ষাকৃত সাহসী, সবলকায় পল্লীবালক বলরাম সরকারের প্রাচীর লাফাইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। বলরাম ও তাহার পরিবারবর্গ তখন নিদ্রামগ্ন, কিন্তু তাহার ঘরের বারান্দায় একটা কালো কুকুর শুইয়া সমস্ত রাত্রি তাহার বাড়ী পাহারা দিত। এই অনধিকার-প্রবেশকারিগণকে দেখিয়া কুকুরটা ভয়ানক চীৎকার আরম্ভ করিল; সুতরাং বালকেরা সুস্থিরচিত্তে অধিকক্ষণ সেখানে পুষ্পচয়নে সাহস করিল না। তাহারা ত্রস্তহস্তে একে একে সমস্ত গাঁদা ফুলের গাছ উৎপাটন করিয়া লইয়া সেখান হইতে অদৃশ্য হইল, তাহার পর পথে আসিয়া গাছ হইতে সমস্ত ফুল ছিঁড়িয়া লইয়া সরকারের

গৃহপ্রান্তবর্ত্তী একটা পচা পুকুরের ধারে গাছগুলি উল্টা করিয়া পুঁতিয়া চলিয়া গেল। পরদিন সকালে গুরু মহাশয় তাঁহার গাঁদা গাছের দুর্দ্দশা দেখিয়া কিরূপ সন্তপ্ত হইবেন, তাহাই কল্পনা করিয়া, তাঁহার সুগুরু-চপেটাঘাত-পীড়িত পড়ুয়াগণের প্রতিহিংসাবৃত্তি কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইল।

রাত্রি শেষ হইয়াছে; অল্প অল্প অন্ধকার আছে; এমন সময় জেলেপাড়া ও গোয়ালাপাড়া হইতে সুপ্তোত্থিতা জেলেনী ও ঘোষানীগণের কলরব উঠিতে লাগিল। মেছুনীরা মাছের ঝুড়ি কক্ষে লইয়া এবং ঘোষানীরা দধির ভাঁড় হাতে ঝুলাইয়া গ্রামের বড়লোক ও গৃহস্থবাড়ীতে 'সাইত' করিতে বাহির হইল। 'সাইতে'র কথাটা আমাদের নাগরিক পাঠকবর্গের নিকট একটু বিশেষভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক। শ্রীপঞ্চমীর দিন অতি প্রত্যূষে আমাদের পল্লী অঞ্চলের মেছুনী ও ঘোষানীরা অনেক বাড়ীতেই মাছ ও দধি উপহার দিয়া যায়; ইহাকেই তাহারা 'সাইত' করা বলে। সরস্বতীপূজার দিন ইলিশমাছ-ভক্ষণ পল্লীগ্রামের অনেকেই একটা সুলক্ষণের কাজ বলিয়া মনে করে; সেই জন্য অনেক মেছুনী বহুদূরস্থ পদ্মাতীরবর্ত্তী স্থান হইতে ইলিশ মাছ সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা 'সাইত' করে; যাহারা 'ইলশে' মাছ দিয়া 'সাইত' করে, তাহাদের লভ্যও কিছু বেশী হইয়া থাকে। বাজারে যে ইলিশের দাম দশ বারো পয়সার বেশী নয়, সেই মাছ দিয়া 'সাইত' করিলে ইহারা নগদ আট গণ্ডা পয়সা বা একখানা কাপড় পায়। পল্লীগ্রামের নিম্ন-শ্রেণীর রমণীগণ শুভ ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া ও কিঞ্চিৎ প্রাপ্তির প্রলোভনে যে উপহার দান করিয়া যায়, তুচ্ছ হইলেও, সেকালের সদাশয় গৃহস্থেরা তাহা পরমপরিতোষসহকারে গ্রহণ করিতেন; এবং তাঁহারা হৃষ্টচিত্তে

তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিতেন। সেকালে দেখা যাইত, শ্রীপঞ্চমীর দিন সকালে কাহারও ঘরের চালে পাঁচটা মাছ গোঁজা রহিয়াছে, রান্নাঘরের কুলুঙ্গীতে কাতারে কাতারে দৈ! রাত্রি শেষে, গৃহবাসীদের নিদ্রা ভঙ্গের পূর্ব্বেই মেছুনী ও ঘোষানীরা আসিয়া এই সকল জিনিস 'সাইত' করিয়া গিয়াছে। সকালে উঠিয়া সেই সকল জিনিস দেখিয়া কর্ত্তা গিন্নীর মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। গিন্নী সেই ইলিশ মাছের কপালে 'তেল সিঁদুর' দিয়া, নূতন কস্তাপেড়ে কাপড় পরিয়া শুদ্ধাচারে রৌদ্রোত্তপ্ত প্রাঙ্গণে বসিয়া তাহা কুটিতে আরম্ভ করিলেন; কারণ, এই দিন ইলিশ মাছের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের ইহাই লৌকিক নিয়ম। কর্ত্তা হাসিমুখে ছেলেদের আমোদ দেখিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ইলিশমাছদাত্রী মেছুনী আসিয়া কর্ত্তাকে লক্ষ্য করিয়া আব্‌দারের সুরে বলিল, "ইলিশমাছ দিয়ে আজ 'সা'ত' করেছি আজাই!—একখান গরদ চাই।"—কর্ত্তামহাশয় সহাস্যে উত্তর করিলেন, "পচামাছ দিয়ে তোর কাপড় চাইতে লজ্জা করে না?" আর কোথা যান!—মেছুনী নথ নাড়িয়া বলিল, "এ ত আর মুখের কথা নয় আজাই! সে কি এখেনে? পনেরো কোশ জমী হেঁটে আমাদের বলাই মোষকুণ্ডি থেকে কাল রেতের বেলা মোটে পাঁচটি মাছ এনেচে,—এখন কি আর ইল্‌সে জালে পড়্‌চে? আগুনের মত দাম!"—কর্ত্তা বলিলেন, "যা আর বক্‌তে কর্ত্তে হবে না, ও বেলা আসিস্, তোর কপালে যা আছে, পাবি।" বিকালে তাহার একখানি লালপেড়ে নূতন শাড়ী লাভ হইল। এইরূপ দানে দাতার মনের প্রসন্নতা গৃহীতার আনন্দ অপেক্ষা অল্প হইত না; কিন্তু একালে এরূপ সাইতের প্রথা ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে। আগে যে বাড়ীতে পাঁচ জন লোক 'সাইত' করিতে যাইত, এখন সেখানে এক

জনও যায় কি না সন্দেহ। গ্রামস্থ ভদ্রসম্প্রদায় ও ইতর লোকের মধ্যে পূর্ব্বে যেরূপ ঘনিষ্ঠতা ও সখ্যভাব ছিল, পরস্পরের সুখে দুঃখে তাহারা যে পরিমাণে সহানুভূতি প্রকাশ করিত, একালে তাহা কার্য্যতঃ দুর্ল্লভ হইয়া কেবল বক্তৃতায় অত্যন্ত সুলভ হইয়া উঠিয়াছে।

* * * *

শ্রীপঞ্চমীর দিন অতি প্রত্যূষে বড়বাজারের নহবতের সানাই-ধ্বনিতে নিদ্রা ভাঙ্গিলে বালকগণ শয্যাত্যাগ করিয়াই পূজার আয়োজন আরম্ভ করিল। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ব্যক্তিগণ চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া ছুরী দিয়া লম্বা লম্বা থাক ও কলমীর ছড় কাটিয়া কলম 'বাড়িতে' লাগিল। আম্রমুকুল ও যবশীর্ষ সরস্বতীপূজার অত্যাবশ্যক উপকরণ; পুষ্পচয়নে ব্যস্ত থাকায় পূর্ব্বদিন যাহারা উক্ত দুই দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারে নাই, তাহারা আম্রকাননে ও নদীতীরবর্ত্তী শস্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। কিন্তু যবশীর্ষ সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না; সুতরাং তাহারা যবশীর্ষের পরিবর্ত্তে এক এক গোছা গোধূমশীর্ষ সংগ্রহ করিয়া 'মধুর অভাব গুড়ে মিটাইতে' বাধ্য হইল!

পূর্ব্বকালে প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতেই 'ঝিউনী'র কালীপূর্ণ দুই চারিটা কালো মাটীর দোয়াত থাকিত। সেগুলি দেখিতে প্রস্তরনির্ম্মিত দোয়াতের মত, তাহাদের গঠনও বিচিত্র; কোনটা চতুষ্কোণ, তাহার উপরে তিন চারিটা ঝুঁট; কোনটি গোলাকার; দুই একটা দোয়াতের সঙ্গে একটা ছোট কুঠুরী, তাহাতে বালি রাখিবার নিয়ম ছিল; কারণ, সেকালে একালের মত ব্লটিং কাগজের চলন হয় নাই। মাটীর দোয়াত যাহাতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে না পারে, এ জন্য অনেকে দোয়াতের সর্ব্বাঙ্গে পুরু করিয়া মাটী লেপিয়া রাখিত। পূর্ব্বকালে দুইটা হইতে

চারি পাঁচটা পর্য্যন্ত দোয়াত এক পয়সায় কিনিতে পাওয়া যাইত! কিন্তু একালের কুম্ভকারেরা এই দোয়াত প্রস্তুত করা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে। এখন প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে কাঁচের দোয়াত। শক্ত চীনামাটীর দোয়াত-গুলির যুগও অতীত হইয়াছে। সরস্বতীপূজার দিন সকালে উঠিয়া এই সকল দোয়াত ধোয়া ছেলেদের একটা প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

একটু বেলা হইলে কাঁপিতে কাঁপিতে সকলে স্নান করিয়া আসিল। মাঘের প্রবল শীত, তাহার উপর বাতাস বহিতেছে; কাহার সাধ্য সুদীর্ঘকাল জলে থাকে? পৌষ মাঘের প্রচণ্ড শীতে ছেলেদের জলক্রীড়াটা অত্যন্ত মন্দীভূত হইয়া পড়ে।

নয়টা বাজিতেই পুরোহিত মহাশয় লাল বনাতের নীচে সাদা চাদর দ্বারা সর্ব্বশরীর ঢাকিয়া গৃহস্থবাড়ী প্রবেশ করিলেন। বড় বাজারের বারোয়ারীপূজাতে আজ তাঁহাকেই পৌরোহিত্য করিতে হইবে, তাই তিনি সকল যজমানবাড়ীতেই কিছু বেশী রকম তাড়া-তাড়ি করিতেছেন! বাড়ীর কর্ত্তা তাঁহার নিত্য ব্যবহৃত, সিন্দুর ও চন্দনে চর্চ্চিত কাঁটাল-কাঠের কালো পুরাতন পৈত্রিক বাক্সটা জমা-খরচের খাতা-পত্র সমেত ছাড়িয়া দিলেন। একখানা পীঁড়ির উপর তাহাই সরস্বতী দেবীর প্রতিনিধি হইয়া বসিল! ছেলেরা দু'দিনের জন্য লেখাপড়ার হাত হইতে পরিত্রাণলাভের অভিপ্রায়ে তাহাদের শ্লেট, ধারাপাত, হস্তা-ক্ষরের খাতা ও শিশুবোধক হইতে সীতার বনবাস, কবিকঙ্কণের চণ্ডী, রামায়ণ, মহাভারত, এমন কি, কার্ট্‌বুকখানা পর্য্যন্ত সেই বাক্সের উপর সাজাইয়া দিল। বাক্সের সম্মুখে দোয়াতগুলি সন্নিবিষ্ট, তাহাদের ভিতর দুধ গঙ্গাজল ঢালা; এবং খাকের কলম, আমের মুকুল, যবের শীষ,

ও গাঁদা ফুল এই সকল দোয়াতের মুখ বন্ধ করিয়া ফেলিল। আজ আর লেখাপড়ার হাঙ্গামা নাই, দোয়াত কলমের ছুটি, পুরাতন কালি মস্যাধার হইতে নির্ব্বাসিত ; হঠাৎ কাহারও কিছু লিখিবার আবশ্যক হইলে একটা ঝিনুকে একটু আলতা গুলিয়া নূতন কঞ্চির কলমের সাহায্যে কার্য্যোদ্ধার হইতেছে।

হাতে অনেক কাজ বলিয়া পুরোহিত মহাশয় 'নমো নমো' করিয়া সঙ্ক্ষেপে পূজা সারিলেন; তাহার পর 'অঞ্জলি' দেওয়ার জন্য সকলকে আহ্বান করিলেন। এত বেলা পর্য্যন্ত কিছুই খাইতে না পাইয়া ছোট ছোট ছেলেরা ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু পিতার তাড়নায় ও সরস্বতীকে অঞ্জলি না দিয়া খাইলে বিদ্যা হইবে না, এই ভয়ে এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল ; পুরোহিত মহাশয় অঞ্জলিদানের জন্য আহ্বান করিবামাত্র বিলম্ব না করিয়া কেহ ময়ূরকণ্ঠী, কেহ চেলী, কেহ ধূপছায়া বা গরদের ধুতি পরিয়া, দোব্‌জা গলায় ফেলিয়া, সরস্বতীর সম্মুখে আসিয়া সারি দিয়া দাঁড়াইল। এমন কি, তিন চারি বৎসরের ছোট ছেলেগুলি পর্য্যন্ত তাহাদের দাদাদের দেখাদেখি অঞ্জলি দিতে আসিল। সকলে ডালা হইতে অঞ্জলি ভরিয়া ফুল লইয়া দাঁড়াইয়া, পুরোহিতের শিক্ষামত সমবেতকণ্ঠে বলিতে লাগিল,—

"সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকালী কপালিনী।
বেদবেদান্তবেদাঙ্গবিদ্যাস্থানেভ্য এব চ।
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ সরস্বত্যৈ নমঃ।"

ভক্তবৃন্দ সেই বাক্য ও পুস্তক-রূপিণী সরস্বতীর উপর এক একবার করিয়া তিনবার অঞ্জলিপূর্ণ পুষ্প নিক্ষেপ করিল। তাহার পর সকলে

মাটীতে মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিবার সময় পুরোহিতের কথার প্রতিধ্বনিপূর্ব্বক সুর করিয়া বলিতে লাগিল,—

"বীণাপুস্তকরঞ্জিতহস্তে
ভগবতী ভারতী দেবী নমস্তে !"

পুরোহিত চলিয়া গেলে ছেলেরা জলযোগের আয়োজনে ব্যস্ত হইল। সরস্বতীর খাতিরে যাহারা এত দিন কুল খাইতে পারে নাই, তাহারা খুব ঘটা করিয়া কুল খাইতে লাগিল। অনেকে শুধু কুলে সন্তুষ্ট হইল না, 'কুল-সুল্‌পো' করিবার প্রলোভন তাহাদের পক্ষে দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল। সেকালের অনেক জিনিসের মত 'কুল-সুল্‌পো' জিনিসটাও এ কালে দুর্ল্লভ হইয়া পড়িতেছে; কিন্তু এক সময়ে ইহা পল্লীবালকদিগের বড়ই মুখ-রোচক চাট্‌নি ছিল। তাহারা 'কুল-সুল্‌পো' করিবার উদ্দেশ্যে পাড়া হইতে খুঁজিয়া খুঁজিয়া 'সুল্‌পো'র পাতা লইয়া আসিল; কুলগুলি ছেঁচিয়া বা খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রথমে পাথরের বাটীতে রাখিল; তাহার পর তাহাতে তেল, নুণ, মরিচ ও সুল্‌পোর পাতা মিশাইয়া গামছা বা বস্ত্রখণ্ডে ঐ পাত্র আচ্ছাদিত করিয়া তাহা ক্রমাগত ঝাঁকাইতে ঝাঁকাইতে সমস্বরে বলিতে লাগিল,—

"কুল-সুল্‌পো হ'লো,
ধোপা মাগী ম'লো,
ধোপা মাগীর কাঁধে ঘা,
তেল নুণ দিয়ে চেটে খা।"

ছেলেরা 'কুলসুল্‌পো' লইয়া ব্যস্ত, কিন্তু তাহাদের মা দিদিমাদের আর বিশ্রাম নাই! একে ত আজ সরস্বতীপূজা উপলক্ষে খাওয়া দাওয়ার

আয়োজন কিছু গুরুতর ;—তাহার উপর কাল শীতল ষষ্ঠী, অগ্নি স্পর্শ করিতে নাই ; ভাত ব্যঞ্জন সমস্ত আজ রাঁধিয়া রাখিয়া কাল 'পান্ত' খাইতে হইবে। বড় বড় গৃহস্থ-বাড়ীতে তিন বেলার রান্না একটা 'যজ্ঞি'র ব্যাপার,—তাহা রাঁধিতেই তাঁহাদের রাত্রি দুপুর পার হইয়া গেল !

বাজারের বারোয়ারীতলায় আজ আর উৎসাহের সীমা নাই। গ্রামের যত ছেলে আহারাদির পর সেখানে জুটিয়াছে। বারোয়ারীপূজার এই বরখানি সারা বৎসর মাসিক পাঁচ টাকা ভাড়ায় ঈশ্বর নন্দীকে দোকান করিতে দেওয়া হয় ; পূজার কয় দিন পূর্ব্বে ঈশ্বরকে স্থানান্তরে পাঠাইয়া সরস্বতী ঠাকুরাণী অসঙ্কোচে তাহার দোকান অধিকার করিয়াছেন। দেবীর আরক্ত পদতলে সুবৃহৎ রক্তোৎপল, হস্তে মৃণ্ময়-বীণা, সর্ব্বাঙ্গ ডাকের সাজে সজ্জিত, কণ্ঠে মোমের ফুলের মালা, মস্তকে বৃহৎ তারের মুকুট ; দুই পাশে সখীযুগল ; সম্মুখে কতকগুলি দোয়াত কলম, খাতাপত্র, ও একটি বৃহৎ মঙ্গলঘট সংস্থাপিত ; তাহারই উপর অঞ্জলি-প্রদত্ত পুষ্পরাশি বিশৃঙ্খলভাবে বিরাজ করিতেছে।

পাশে আর একটা ঘরে কতকগুলি সং। সে ঘরের দ্বার আজ রুদ্ধ। পাণ্ডারা আজ রাত্রে গীত বাদ্যের আয়োজন লইয়াই ব্যস্ত, তাই আজ সং দেখাইবার অবসর নাই ; কিন্তু বালকবালিকগণ ঝাঁপের ফাঁক দিয়া কৌতূহল বিস্ফারিত নেত্রে সেই সকল মূর্ত্তিসন্দর্শনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত করিতেছে।

পল্লী অঞ্চলে শ্রীপঞ্চমীর অপরাহ্নে 'কাচ-কাক' (নীলকণ্ঠ) দেখিতে মাঠে যাইবার প্রথা আছে। ইহা রাজপুত জাতির আহেরিয়ার মত। আহেরিয়ার দিন অরণ্যে বরাহ শিকার করিতে পারিলে তাহা যেমন

রাজপুতদের সারা বৎসরের শুভ সূচনা করে, সেইরূপ পল্লীবালকগণ, এমন কি, বৃদ্ধেরা পর্য্যন্ত এই দিন মাঠে গিয়া 'কাচ-কাক' দেখিলে সংবৎসর শুভদায়ক হইবে বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

সুতরাং বেলা শেষ না হইতেই বালকেরা, যুবক ও বৃদ্ধেরা শীতবস্ত্রে মণ্ডিত হইয়া, দলে দলে মাঠের দিকে ধাবিত হইতেছে। প্রান্তরস্থ প্রত্যেক বৃক্ষে, দূর আকাশের দিকে তাহাদের দৃষ্টি ঘুরিতেছে,—যদি দৈবাৎ একটা 'কাচ-কাক' তাহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়! মাঘ-শেষে নববসন্ত সমাগত, শীতের তীব্রতা অপগতপ্রায়, অস্তমান সান্ধ্য তপনের পীত রশ্মিজাল বাসন্তী-লক্ষ্মীর হেমাভ লাবণ্যের ন্যায় শোভাময়; রবিশস্যসমলঙ্কৃত প্রশস্ত প্রান্তর-বক্ষে তাহা বিচিত্র বর্ণচ্ছটার বিকাশ করিতেছে; এমন সময় সহসা নববসন্তের প্রণয়ানুরাগস্ফুরিত আবেগ-চঞ্চল নিশ্বাসের মত ঈষদুষ্ণ বায়ুপ্রবাহ আম্রমুকুলের সৌরভ ও তরুশাখাসীন বিহঙ্গমকুলের মধুর হর্ষকাকলি বহিয়া আনিয়া মূক ধরণীর সুপ্তবক্ষে নবাগত যৌবনের আবাহন ঘোষণা করিয়া গেল। চারি দিক নিস্তব্ধ, শান্ত, স্থির। তপনের কনককান্তি পশ্চিম দিগন্তে বিলীন হইল। আকাশের অতি ঊর্দ্ধে দুই একটি পক্ষী তখনও ধরাতলে ক্ষুধিত দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ভাসমান। অদূরবর্ত্তী শাল্মলীর পত্রহীন শাখায় বিকশিত লোহিত পুষ্পস্তবকের অন্তরাল হইতে একটা কোকিল স্তব্ধ, উদার, ধূসর সন্ধ্যায় তাহার ব্যাকুল হৃদয়ের উচ্ছ্বাস কুহুস্বরে ব্যক্ত করিয়া চতুর্দ্দিক ধ্বনিত করিয়া তুলিল। ক্রমে শুক্লা পঞ্চমীর ক্ষীণ চন্দ্রকলা ঊর্দ্ধাকাশ হইতে অনতি-উজ্জ্বল রজতরশ্মিজাল বিকীর্ণ করিয়া মুক্ত প্রান্তর ধৌত করিতে লাগিল।

সন্ধ্যা অতিবাহিত হইল দেখিয়া সকলে প্রান্তর-প্রান্ত হইতে গৃহমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। আজ রাত্রে বারোয়ারীতলায় দাশুরায়ের 'পালা' হইবার কথা ; তাই বিভিন্ন গ্রাম হইতে অনেক লোক গোবিন্দপুরে গান শুনিতে আসিতেছে। তাহাদের এক জন মেঠো সুরে গাহিয়া উঠিল :—

"হৃদি-বৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি,
ওহে ভক্তি-প্রিয় ! আমার ভক্তি হ'বে রাধা সতী ;
বাজায়ে কৃপা-বাঁশরী, মন-ধেনুরে বশ করি',
তিষ্ঠ মম হৃদি-গোষ্ঠে, কৃষ্ণ, মম এই মিনতি।"

সেই পল্লীযুবকের তানলয়বর্জ্জিত, অমার্জ্জিত কণ্ঠনিঃসৃত, ভক্ত কবি গায়ক দাশরথির এই সঙ্গীতধারা ম্লান-চন্দ্রিকা-পরিব্যাপ্ত, শ্যামল শস্যশীর্ষ-পরিশোভিত পাণ্ডুর প্রান্তর প্লাবিত করিয়া ফেলিল।

দূরে রাজনগরের কাঁচা 'সরাণে'র উপর দিয়া ধূলি উড়াইতে উড়াইতে একখানি গরুর গাড়ী ভার-ক্লিষ্ট চক্রশব্দে আপনার মন্থর গতির বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া গোবিন্দপুরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল; তাম্রকূট-ধূমপিপাসু গাড়োয়ান চকমকীর পাথরে ঠুক্‌নীর ঘা দিয়াই গান ধরিল :—

"মন ! তুমি কৃষিকাজ জান না !
এমন মানব-জমীন রৈল পতিত,
আবাদ কল্লে ফল্‌তো সোনা।"

সন্ধ্যার পর দাশুরায়ের 'মানভঞ্জন' আরম্ভ হইল। বাজারের মধ্যেই আসর। আসরের চারি দিকে স্থানের অভাব নাই ; কিন্তু আমোদ-লিপ্সু পল্লীযুবক ও বালক বালিকাগণ সন্ধ্যাকালেই নৈশ আহার শেষ করিয়া আসিয়া আসর অধিকার করিয়া বসিয়াছে ;—তাহাদের হাসি, গল্প,

কলরবের বিরাম নাই! ক্রমে শ্রোতৃবর্গের ভিড় বাড়িতে লাগিল; যাত্রাওয়ালারা একে একে আসরে আসিয়া বসিলে, যাত্রার সূচনাস্বরূপ ডুগি ও মন্দিরা দ্রুত তালে বাজিতে আরম্ভ হইল।

একটু অধিক রাত্রে গোবিন্দপুরের মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থ পরিবারের রমণীগণ ময়লা কাপড়ের ছদ্মবেশে প্রতিবেশিনীবর্গের সঙ্গে আসিয়া দূরে সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়াইয়া সরস্বতী প্রতিমা দর্শন করিতেছেন;—দৈবাৎ তাঁহাদের কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি আসর-সন্নিকটে উপবিষ্ট দর্শকগণের মস্তকের উপর দিয়া আসরের মধ্যস্থলে নিক্ষিপ্ত হইতেছে,—সেখানে তখন কুঞ্চিত-পরচুলধারী কৃষ্ণ, ঝুঁটা মতির মালা গলায় ঝুলাইয়া, কপালে ও মুখে অলকা তিলকা কাটিয়া, পায়ে ঘুঙুর বাঁধিয়া, বাম হস্তে বংশীধারণ করিয়া এক এক পা চলিতেছে, আর দক্ষিণ হস্ত ঘন ঘন ঊর্দ্ধে তুলিয়া এক ঘেয়ে অনুনাসিক বক্তৃতা দ্বারা নন্দ যশোদার পুত্রবিরহ-শঙ্কাকুল হৃদয়ে শোকশল্য বিদ্ধ করিতেছে; এবং তাহাদের সেই অভিনয়ের ক্রন্দনোচ্ছ্বাসে ভাববিহ্বল অজ্ঞ শ্রোতৃবর্গের অশ্রুসংবরণ দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছে! ভাবাবেশে কোনও কোনও ভক্ত উচ্ছ্বাসভরে 'হরিবোল' বলিয়া হুঙ্কার করিতেছে, আর শত শত কণ্ঠের সমুচ্চ হরিধ্বনিতে 'সঙ্গতে'র ঐক্যতান ডুবিয়া যাইতেছে।

ক্রমে রাত্রি আরও গভীর হইল। সমস্ত গ্রাম সুপ্ত, অন্ধকারাচ্ছন্ন; শুধু বাজারের মধ্যে নিদ্রাবিজড়িত শত শত নির্নিমেষ চক্ষুর সম্মুখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া অভিনয়, এবং একই রকম সুরে দৃশ্যের পর দৃশ্যের অনুসরণে বক্তৃতা চলিতেছে। অবশেষে উৎসব-প্রাঙ্গণের আলোক-রশ্মি ম্লান হইয়া গেল, আকাশে নক্ষত্রের সংখ্যা বিরল হইয়া আসিল, পূর্ব্বা-

কাশে উষাগমের চিহ্ন পরিস্ফুট হইল। কিন্তু তখনও বিরাম নাই; তখনও সঙ্গীতরসাসক্ত সহিষ্ণু শ্রোতৃবর্গের মুগ্ধ চিত্ত মথিত করিয়া সদ্যোমুণ্ডিত-গুম্ফশ্মশ্রু, তুলসীমাল্যে বিভূষিতকণ্ঠ, পট্টাম্বরপরিহিত যাত্রার দলের প্রবীণ অধিকারী বৃন্দা দূতী সাজিয়া, পুষ্পমাল্যগ্রন্থনরতা, দীর্ঘজাগরণ-ক্লিষ্টা, আসন্ন বিরহসম্ভাবনায় ব্যথিতা, অশ্রুমুখী, গরবিনী, বৃকভানুনন্দিনী রাধিকাকে সম্বোধন করিয়া গায়িতেছিল,—

"রাই, তুমি অমূল্য মাল্য গাঁথিছ যাহার কারণে,
মথুরায় তার মাল্য-বদল হ'বে না জানি কার সনে!
কেন গাঁথ চিকণ মালা, ছেড়ে যাবে চিকণ কালা,
শেষে কেবল ঐ মালা—জপমালা হ'বে মনে।"

শীতল-ষষ্ঠী

শীতল-ষষ্ঠী

গোবিন্দপুরের জনসাধারণ শ্রীপঞ্চমীর উৎসবের রাত্রি সুখ স্বপ্নের মত কাটাইয়া দিল। প্রত্যূষে গান ভাঙ্গিলে বারোয়ারীতলার আসর জনহীন হইল। ঝাড় ও দেয়ালগিরির বাতিগুলি নির্ব্বাপিত হইল; ঢুলী বাজন্দারেরা একবার গানভঙ্গসূচক ঢোল ঢাক বাজাইয়া হিমযামিনীর সুপ্তি-কুহক ভাঙ্গিয়া দিল। তাহার পর নহবতের উপর হইতে রসুনচৌকীর দল মধুর ভৈঁরো রাগিণীতে সানাই বাজাইয়া উষাদেবীর আবাহন-সঙ্গীতের সূচনা করিল। সমস্ত রাত্রির উৎসবে প্রমত্ত গ্রামখানি প্রত্যূষে নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিয়াছিল। উৎসব-নিশার অবসানে উষাগমে এই মঙ্গলবাদ্য যেন সুপ্ত গ্রামবাসিগণের কর্ণে সুধাবর্ষণ করিতে লাগিল।

আজ প্রভাতেও উৎসবের বিরাম নাই। আজ শীতল-ষষ্ঠী। উৎসব-মুখর গ্রামে আজ কাহারও কোনও কাজ নাই; গ্রামবাসিগণের আজ সমস্ত দিনই অবসর। স্কুল পাঠশালার ছুটী, স্ত্রীলোকের রন্ধনশালার কাজ বন্ধ; কৃষকেরা ক্ষেতে যায় নাই; বাজারে মাছ, তরকারীর আমদানী নাই; অরন্ধনের দিন কে মাছ তরকারী কিনিবে? বাজারের দোকানদার ব্যবসায়িগণ, পাঠশালার ছেলেরা ও অধিকাংশ গৃহস্থ সকাল সকাল আহারাদি সারিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে; কারণ, বারোয়ারীর আসরে বেলা একপ্রহরের মধ্যেই বৈকুণ্ঠ অধিকারীর যাত্রা আরম্ভ হইবে।

বৈকুণ্ঠ জাতিতে কৈবর্ত্ত দাস। যাত্রার দলের অধিকারীগিরি করিয়া গোবিন্দপুর অঞ্চলে 'অধিকারী' খেতাব পাইয়াছে। সমস্ত রাত্রি দাশুরায়ের 'পালা' শুনিয়াও বারোয়ারীর পাণ্ডাদের আশা মেটে নাই; আসর ফাঁক দেওয়া হইবে না স্থির ক'রিয়া তাহারা অতি অল্প টাকায় বৈকুণ্ঠের দলের বায়না করিয়াছে। গোবিন্দপুরের সন্নিহিত কোনও গ্রামে বৈকুণ্ঠের বাড়ী। গানে ও বক্তৃতায় বৈকুণ্ঠ বাল্যকাল হইতেই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। বৈকুণ্ঠ সর্ব্বপ্রথমে কানাইখালীর মাধব গাঙ্গুলীর যাত্রার দলে প্রবেশ করে; অবশেষে সে ওস্তাদ হইয়া স্বয়ং এক যাত্রার দল খুলিয়া বসিয়াছে। সে সময়ে মতি রায়ের পালা, মতি রায়ের সুর, তাঁহার বক্তৃতা কি যে মাদকতা আনিয়াছিল, তাহা কি পুরুষ, কি রমণী, সকলেরই কর্ণে মধুবর্ষণ করিত! অনেক টাকা বায়না দিয়াও পল্লীগ্রামের কোনও লোক মতি রায়ের দল আনিতে পারিত না; তথাপি তাঁহার গান এ অঞ্চলের অপরিচিত ছিল না। নদীর ধারে আমবাগানের মধ্যে গরু ছাড়িয়া দিয়া রাখালের দল গায়িত,—

"ওরে রামশশী, যদি হ'বি বনবাসী,
কে আমারে ডাক্‌বে মা ব'লে?"

সন্ধ্যাকালে কর্ম্মশ্রান্ত শ্রমজীবী, জনবিরল ছায়াচ্ছন্ন পল্লীপথ ধ্বনিত করিয়া সন্ধ্যার স্তব্ধ আকাশ কাঁপাইয়া গায়িত,—

"এ ত সুধা নয়, সুধা নয়,
কুরুকুলক্ষয়কারী গরলরাশি!
খেলার সাগরে সে রূপসী।"

শুনিয়া পল্লীরমণীগণও বুঝিতে পারিত, এ মতি রায়ের গান। মতি রায়ের দলের এক জন প্রসিদ্ধ 'জুড়ি' এক দিন অধিক পরিমাণ ধান্য-সুধাপানে প্রমত্ত হইয়া কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য প্রকাশ করায় দলের অধিকারী তাহাকে প্রবুদ্ধ করিবার আশায় তাহার পৃষ্ঠে বেহালার 'ছড়ে'র আঘাত করেন। ইহাতে জুড়িপ্রবর অপমান বোধ করিয়া মতি রায়ের দল পরিত্যাগ করে; সঙ্গে সঙ্গে সে অন্নদাতা মতি রায়ের 'ভীষ্মের শরশয্যা গীতাভিনয়' নামক গ্রন্থখানির নকল চুরী করিয়া লইয়া যায়। অতঃপর সে বৈকুণ্ঠের দলে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে। বৈকুণ্ঠ দেখিল, একটি শ্রেষ্ঠ দলের এক জন খ্যাতনামা জুড়ি ও একখানি ভাল 'পালা' একত্র হস্তগত হইতেছে; ইহাতে ব্যবসায়ের বিলক্ষণ সুবিধা হইতে পারিবে। সুতরাং সে মাসিক পনের টাকা বেতন ও খোরাক পোষাকের অঙ্গীকার করিয়া লোকটিকে নিজের দলে ভর্ত্তি করিয়া লইল। তাহাকে তিন মাসের বেতনও অগ্রিম দিতে হইল।

বৈকুণ্ঠ "ভীষ্মের শরশয্যা"র নাম পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক এই নবার্জ্জিত গ্রন্থখানির নাম রাখিল,—"ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু গীতাভিনয়"। সে মহা উৎসাহে এই গ্রন্থের 'তালিম' দিতে লাগিল, এবং নিজের কৃতিত্ব প্রকাশের জন্য পুস্তকের মধ্যে দুই একটা দৃশ্যের সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তন করিল; কিন্তু মূল গ্রন্থের গান, সুর, ভাষা, সমস্তই অপরিবর্ত্তিত রহিল!

পূজার পর বৈকুণ্ঠের দল আর কোথাও 'গাহনা' করিতে যায় নাই। গোবিন্দপুরের বারোয়ারীতলায় একপালা গান না গাহিয়া তাহারা বিদেশে যাত্রা করিবে না, এইরূপ কথা ছিল। এই প্রথম দিনের কৃতকার্য্যতায় উপর বৈকুণ্ঠের সংবৎসরের সাফল্য নির্ভর করিতেছে,—তাই সে আপনার

গুণপণা পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাজ-সরঞ্জাম লইয়া বারোয়ারীতলায় উপস্থিত হইল।

আসর হইতে ঢোলকের শব্দ উঠিবামাত্র গ্রামের মধ্যে প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে মধুলোলুপ মধুকরের গুঞ্জন আরম্ভ হইল। পরিবারস্থ পুরুষ-গণের কেহ কেহ তাড়াতাড়ী নদী হইতে স্নান করিয়া আসিল; কেহ কেহ বা কূপ হইতেই দুই ঘটী জল তুলিয়া হড় হড় করিয়া মাথায় ঢালিল; তাহার পর রৌদ্রে পিঠ দিয়া বসিয়া অরন্ধনের পান্ত ভাত খাইতে আরম্ভ করিল। আজ পান্ত ভাতের উপকরণও অদ্ভুত;—পান্ত ভাতের সঙ্গে তৈল, লবণ ও কাঁচালঙ্কা বিরাজিত; আস্ত কলাই-সিদ্ধ, লম্বা সম্বা আল্‌তাপাতি শিম-সিদ্ধ, 'সলে' বেগুণ-সিদ্ধ, 'বেথোর' পাতা ও কুল-সিদ্ধ আজ পান্তভাতের সঙ্গে খাইবার ব্যবস্থা! কেহ কেহ ইহাই যথেষ্ট উপচার নহে মনে করিয়া ডাল ও মাছের অম্বল রাঁধিয়া রাখে,—কিন্তু সকলে নহে।

এ দিকে গিন্নীঠাকুরাণী মাঘ মাসের এই প্রচণ্ড শীতে নদী হইতে প্রাতঃ-স্নান করিয়া আসিয়া সরস্বতীর প্রতিনিধিস্থানীয় বাক্স, ঘট, পুঁথির বোঝা ও দোয়াত-কলমগুলি সরাইয়া ফেলিলেন; তাহার পর তুলসীতলায় ষষ্ঠীপূজার আয়োজন করিয়া রাখিলেন।

পুরোহিত ঠাকুরের পঞ্চাশ ঘর যজমান। তিনি তাহাদের মন রক্ষা করেন, না, বারোয়ারীতলার যাত্রার মান রক্ষা করেন এই চিন্তাতেই অস্থির! যাত্রা শুনিতে গেলে যজমানের বাড়ী ষষ্ঠীপূজা হয় না, আবার ষষ্ঠীপূজা করিতে গেলে যাত্রা-শ্রবণের আশা পরিত্যাগ করিতে হয়! আহা, 'ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু গীতাভিনয়!' এ যাত্রা না শুনিলে আর জীবনে সুখ

কি? অগত্যা তিনি ষষ্ঠীদেবীকে ফুল-জল-দানে তৃপ্ত করিয়াই এক যজমানের বাড়ী হইতে অন্য যজমানের বাড়ী প্রবেশ করিতেছেন। কোনও প্রকারে ষষ্ঠীর সম্মান বজায় রাখিয়া, নাকে মুখে দুই চারি মুঠা পান্ত ভাত গুঁজিয়া তিনি যাত্রার আসরে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

ষষ্ঠীপূজা শেষ হইবার পূর্ব্বেই অনেকে আহারাদি শেষ করিয়া যাত্রা শুনিতে গিয়াছে; কিন্তু পল্লীরমণীগণের এখনও আহার হয় নাই। ষষ্ঠীর 'কথা' না শুনিয়া কাহারও জলগ্রহণ করিবার ইচ্ছা বা সাহস নাই; ষষ্ঠীদেবীর শাপে পড়িয়া সেকালের মণ্ডল গিন্নীর মত অবস্থা হইতে কতক্ষণ! বিশেষতঃ, শীতল ষষ্ঠীর মিষ্ট কথা ও-পাড়ার মুক্তো মাসী যেমন সুন্দর করিয়া বলিতে পারেন, তেমন সকলের মুখে শুনায় না। তাই রমণীগণ মুক্তো মাসীর আগমন-প্রত্যাশায় তৃষিতা চাতকীর ন্যায় বসিয়া আছেন! কিন্তু পুত্রবতী রমণীগণ ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের কোলে লইয়া এত বেলা পর্য্যন্ত অভুক্ত আছেন,—এ জন্য গিন্নীরা মুক্তো মাসীর উপর কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া উঠিলেন; তাঁহাদের মধ্যে যে সকল গিন্নীর নিকট মুক্তো মাসী কোনও প্রকারে ঋণী, তাঁহাদের তর্জ্জন গর্জ্জনের সীমা রহিল না!

*

ইতিমধ্যে মাসীমা হাস্যোজ্জ্বলমুখে সমাগত হইলেন।—তাঁহাকে দেখিয়া কর্ত্রী অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন, "হাঁ বাছা মুক্তো, তোমার আক্কেলখানা কেমন বল ত! একটু সকালে ক'রে কি কথা শুনতে আসতে হয় না? দেখ দেখি, কাঁচা পোয়াতীরা সব উপোস্ পাড়ছে, আহা বাছাদের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে!" মুক্তো মাসী কিঞ্চিৎ অপ্রতিভভাবে বিলম্বের একটা কারণ দেখাইয়া রৌদ্রোত্তপ্ত সানের উপর বসিয়াই, ষষ্ঠীর কথা শুনিবার

জন্য পরিবারস্থ সকলকে আহ্বান করিলেন। কর্ত্রী, প্রৌঢ়া রমণীগণ, বধূগণ, এমন কি, ছোট ছোট বালকবালিকাগুলি পর্য্যন্ত তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিল। মুক্তো মাসী তাঁহার মাতামহীর নিকট হইতে শীতল-ষষ্ঠীর দুর্লভ 'কথা' কিরূপে শ্রবণ করিয়াছিলেন, এবং তিনি এই পুণ্যকথা বিবৃত করেন বলিয়া রমণী সমাজে তাঁহার কিরূপ খাতির, তাহার বর্ণনা শেষ করিয়া, তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

"এক গাঁয়ে ছিল এক ঘর গেরস্ত। বুড়ো গেরস্তর 'বুড়ী' ছাড়া আর কেউ ছিল না। বুড়োবুড়ী বড় লক্ষ্মীমন্ত ছিল। কিন্তু তাদের মনে একটা বড় দুঃখ ছিল, মা ষষ্ঠীর কৃপায় তারা বঞ্চিত; তাদের ছেলে মেয়ে ছিল না। কত ষষ্ঠী সুবচনীর পূজো, পীরের দরগায় কত সিন্নি মানত, কিছুতেই তাদের ছেলে হ'লো না। বুড়ো নিশ্বাস ফেলে মুখ ভার ক'রে বল্‌তো, 'হায়, হায়, আমার এতটা বিষয় খাবে কে? বাপ 'বড় বাপে'র জলগণ্ডূষের পিত্যেশ রইল না!' বুড়ী বল্‌তো, 'এমনই কি ভগবানের বিচের! এয়োস্ত্রীরা আমাকে দেখে মুখ বাঁকা ক'রে যায়, ব'লে,—'আঁটকুড়ীর মুখ দেখ্‌লে অমঙ্গল হ'বে।'—ভিখিরী আমার হাতে ভিক্ষে ন্যায় না! ওমা! আমি যাব কোথা?'

"শেষে ষষ্ঠী ঠাকরুণের দয়ায় বুড়ী 'পোয়াতী' হলো। বুড়োবুড়ীর মনে কত আহ্লাদ! আহা, যদি এই বুড়ো বয়েসে তাদের একটি সোনার চাঁদ খোকা হয়, তা হ'লে সোনার 'টাট' বজায় থাকে। এক মাস যায়, দু' মাস যায়, এমনই ক'রে দশ মাস গেল। একদিন বুড়ো হাট করতে গিয়েছে, এমন সময় বুড়ীর ব্যথা উঠ্‌লো। তাই শুনে পাড়ার বৌ ঝিরা ঝেঁটিয়ে বুড়োর বাড়ী এসে জুট্‌লো,—তার কি ছেলে হয় দেখ্‌তে; এসে

দেখে,—ওমা! বল্লে না তোমাদের 'পিত্যয়' হবে,—বুড়ীর বুড়ো আঙ্গুলের মত ষাটটি ছেলে হয়েছে! ছেলেগুলো পিট্‌পিট্ করে তাকাচ্চে! দেখে সব্বাই বুড়ীকে 'ধিক্' দিতে লাগ্‌লো। বুড়ী তখন মনের ঘেন্নায় ছেলে-গুলোকে কুলোর উপর সাজিয়ে নিয়ে বাড়ীর পাশে বাঁশতলায় ছাইগাদায় ফেলে দিয়ে এলো।

"হাট ক'রে বুড়ো বাড়ী ফিরে এসে শুন্‌লে, লোকের কথায় বুড়ী ছেলেগুলোকে ফেলে দিয়ে এসেছে! একটা ছেলের জন্যে বুড়ো এত কাল 'নালিয়ে' মরেছে, আর ষাট-ষাটটে ছেলে কি না বুড়ী ফেলে দিয়ে এলো! শুনেই বুড়ো তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠ্‌লো, আর গালে-মুখে চড়াতে লাগ্‌লো; বুড়ীকে বল্লে, 'ভাল চাস্ ত এখনই ছেলেগুলিকে কুড়িয়ে নিয়ে আয়! তুই কি রাক্কুসী যে, লোকের গঞ্জনা শুনে এমন সোনার চাঁদ ছেলেগুলিকে ফেলে দিয়ে এলি?'—কি করবে, সোয়ামীর তাড়ায় বুড়ী ছেলেগুলিকে আবার কুড়িয়ে নিয়ে এলো।

"কত যত্নে, কত 'তাণ্ডতে' ছেলেগুলি বড় হতে লাগ্‌লো। একা মানুষ বুড়ী, এত ছেলে কি ক'রে মানুষ করে? তাই সে ছেলেদের জন্যে ষাট জন দাসী রাখ্‌লে। ছেলেগুলির ছ' মাস বয়স হ'লে বুড়ো ঘুমধাম ক'রে তাদের মুখে ভাত দিলে। বুড়ী এতটুকু-টুকু ছেলে প্রসব করেছে ব'লে আগে যারা মুখ বাঁকা করেছিল, তারাই আবার বুড়োবুড়ীকে ধনে পুত্রে লক্ষেশ্বর ব'লে সুখ্যাতি কর্ত্তে লাগ্‌লো!

"ছেলেরা বড় হ'লে বুড়ো তার ষাট ছেলেকে ষাটখান ঘর বেঁধে দিলে। তার পর ষাটটি ছেলের জন্য ষাটটি টুকটুকে বৌ আন্‌লে। ষাট ছেলে আর ষাট বৌ নিয়ে বুড়োবুড়ী সুখে ঘরকন্না কর্ত্তে লাগ্‌লো।

"শীতকালে একদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছে। ছেলের বৌরা এক সঙ্গে ব'সে দুঃখ কর্ত্তে লাগ্‌লো,—

'আজ যদি মা বাপের বাড়ী হ'তো,
চাল ছোলা ভাজা হ'তো,
কৈ মাগুরের ঝোল হ'তো,
গরম গরম খিচুড়ী হ'তো,
তা হ'লে মনের খেদ যেতো।'

"বেটার বৌদের এই রকম দুঃখ-করতে শুনে বুড়ী বল্লে, 'আমার বৌ-মাদের যা যা খেতে সাধ গিয়েছে, তাই খাওয়াব; বাছারা লজ্জায় আমার কাছে কোনও কথা বলে না!' বুড়ী তখন বুড়োকে ব'লে বৌদের জন্যে চাল ছোলা ভাজ্‌লে, কৈ মাগুরের ঝোল রাঁধ্‌লে, গরম গরম খিচুড়ী রেঁধে তাতে এক এক বাটী ঘি ঢেলে তাদের খেতে দিলে। সেদিন যে শীতল-ষষ্ঠী, তা বুড়ী ভুলে গিয়েছিল! বৌরা মনের সাধে আশ মিটিয়ে খেয়ে সন্ধ্যের পর শুতে গেল।

"তার পরদিন সকাল বেলা চার দিক ফরসা হয়ে গেল। গেরস্তরা উঠে' উঠোনে ছড়া-ঝাঁট দিলে; তুলসীতলা নিকোলে; দেখ্‌তে দেখ্‌তে রোদ্দুরে আঙ্গিনে ভরে গেল। বুড়োর বেটা, বেটার বৌরা—কেউ জাগ্‌লো না! বুড়ী তাদের ঘরের দরজার কাছে গিয়ে এক এক বেটার নাম ধ'রে কত ডাকাডাকি কল্লে, কারও কোনও সাড়া শব্দ নেই! কে তাকে সাড়া দেবে? বেঁচে থাক্‌লে ত দেবে! শেষে দরজা ভেঙ্গে ঘরে গিয়ে বুড়ী দেখে,—ষাট বেটা, বেটার বৌরা বিছানার উপর মরে পড়ে রয়েছে!—এক এক ঘরে ঢোকে, আর বুড়ী আছাড় খেয়ে প'ড়ে চোখের জলে মাটী

ভিজিয়ে ফেলে। ষাট ষাটটে বেটা,—বেটার বৌ, তাদের একটাও বেঁচে নেই!

"বুড়ী, বেটা বেটার বৌদের শোকে পাগলের মত হ'য়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লো। বনে বনে ঘুরতে ঘুরতে শেষে গহন বনে ঢুকে' এক বুড়ীকে দেখ্‌তে পেলে। বনের বুড়ী তাকে জিজ্ঞাসা কল্লে, 'কিগো বাছা! কাঁদ কেন?' বুড়ী বল্লে, 'আমার কপালের দুঃখুর কথা আর কারে ক'ব বোন! ষাটটি বেটা ষাটটি বেটার বৌকে জলে দিয়ে আমি পাগল হয়েছি, আমাতে আর আমি নেই!' বনের বুড়ী বল্লে, 'এই পথ দিয়ে যাও; যেতে যেতে একটা বড় ষষ্ঠীগাছতলায় এক বুড়ীকে দেখ্‌তে পাবে, তার সর্ব্বাঙ্গ কুড়ীকুষ্ঠতে খ'সে পড়্‌চে!—তাকেই যদি ভাল ক'রে ধরতে পার, আর তার কৃপা হয়, তা হ'লে তোমার দুঃখু ঘুচ্‌তে পারে। কিন্তু সে যা বল্‌বে, তাই তোমাকে করতে হ'বে; তাকে দেখে যেন 'হেনস্তা' করো না।'—কথা শুনে বুড়ী ছুটে চল্‌লো।

"অনেক ঘুরে ঘুরে বুড়ী দেখ্‌তে পেলে, ষষ্ঠীতলায় সত্যি সত্যি এক বুড়ী বসে রয়েচে,—থুড়থুড়ে বুড়ী, তার সর্ব্বাঙ্গে কুড়ীকুষ্ঠ; ঘা দিয়ে দর্‌দর্‌ ক'রে 'রসানি' ঝরছে; গায়ে মাথায় ছোট ছোট সাদা পোকা কিল্‌বিল্‌ কচ্ছে; দুর্গন্ধে সেখানে তিষ্ঠান ভার!

"বুড়ী তার পায়ের গোড়ায় আছাড় খেয়ে পড়লো, তার পা ধ'রে বল্লে, 'মা! আমাকে দয়া কর, বড় বিপদে প'ড়ে আমি তোমার চরণতলে এসে পড়েছি; আমার বেটা,—বেটার বৌদের প্রাণ দাও; শোকে আমি জলে মলাম। অনেক ষষ্ঠী সুবচনীর পূজো ক'রে রাজপুত্তুরের মত ষাটটি ছেলে —আজকল্লের মত ষাটটি বৌ পেয়েছিলাম—কি পাপ করেছি জানি নে—

একদিনে তাদের সকলকে হারিয়েছি; আমার প্রাণ নিয়ে তাদের প্রাণ দাও মা!'

"মণ্ডল গিন্নীর কথা শুনে ষষ্ঠীতলার বুড়ী পা দু'খানা টেনে নিয়ে বল্লে, 'তা আমার কাছে মর্‌তে এসেছিস্ কেন? আমি কি করবো? তোর বেটা—বেটার বৌরা মলো কি না মলো, তাতে আমার কি গেল এল? যা, তাদের চাল ভাজা, ছোলা ভাজা, মাগুর মাছের ঝোল, গরম গরম খিচুড়ী খেতে দিগে না? সব শোক ভাল হয়ে যাবে! পেটের জ্বালায় দেবতা ব্রাহ্মণ পূজো আর্চ্চা কিছু মান্‌তে চাস্ নি, ভারি তোদের 'আস্পর্দ্ধা' হয়েছিল। দেখ্, এখন কেমন মজা! চলে যা এখান থেকে, আমি এখন কি করবো? আমাকে দিয়ে কিছু হ'বে-টবে না।'

"মণ্ডল গিন্নী কিন্তু কোনও মতে বুড়ীর পা ছাড়লে না, তার পায়ের গোড়ায় হত্যে দিয়ে পড়ে থাক্‌লো; কেঁদে বল্লে, 'হেঁই মা, আমি তোমার দুটি পায়ে ধরেছি, আমাকে একটু দয়া কর, আমার বাছাদের বাঁচিয়ে দাও; গেরস্তর ঝি বৌ হয়ে বড় দায়ে প'ড়েই আমি পথে বের হয়েছি, মা! আমার লজ্জা নিবারণ কর।'

"মণ্ডল গিন্নীর কাকুতি মিনতিতে বুড়ীর দয়া হলো। বুড়ী মণ্ডল গিন্নীকে বল্লে, 'তবে যা, এক হাঁড়ি দই আর হলুদ নিয়ে আয়; যা কর্ত্তে হবে, তা আমি করব।' শুনে মণ্ডলগিন্নী তখনই সেখান থেকে উঠে গিয়ে নূতন হাঁড়িতে ক'রে এক হাঁড়ি সাঁজো দৈ আর গোবর-নেপা কুলোতে এক কুলো হলুদ-গুঁড়ো নিয়ে এলো। বুড়ী বল্লে, 'দুয়ে এক সঙ্গে মিশিয়ে ঢাল্ আমার গায়ে!' বুড়ী তাই কল্লে; তার গায়ের উপর দিয়ে সেই হলুদ মেশান দৈয়ের 'ছেরোত' চল্‌তে লাগ্‌লো। তখন বুড়ীর

কথামত মণ্ডলগিন্নী সেই ঘা-ধোয়া দৈ আবার হাঁড়িতে ক'রে তুলে নিলে। বুড়ী বল্লে, 'যা, এই দৈ তোর বেটা, বেটার বৌদের গায়ে ঢেলে দিগে, তা হলেই তারা বেঁচে উঠ্‌বে। আর দেখিস্, কখন যেন শীতল-ষষ্ঠীর দিন গরম ভাত তরকারী কিছু খাস্‌নে, কি কাউকে খেতে দিস্‌নে।' —মণ্ডলগিন্নী বুড়ীর পায়ে দণ্ডবত ক'রে হাঁড়ি নিয়ে বাড়ী চলে গেল।

"পথে যেতে যেতে মণ্ডলগিন্নী ভাব্‌লে, 'বুড়ী যে দৈ দিলে, তাতে মরা প্রাণী জ্যান্ত হয় কি না, একবার দেখ্‌তে হচ্ছে।' এমন সময় সে দেখ্‌তে পেলে, এক মেছুনী এক ঝুড়ি পচা মাছ নিয়ে সেই পথ দিয়ে বাজারে যাচ্ছে; মণ্ডলগিন্নী মেছুনীকে দাঁড়াতে বল্লে। মেছুনী তার কথায় মাছের ঝুড়ি যেমন নামিয়েছে, অমনি মণ্ডলগিন্নী হাঁড়ি কাৎ ক'রে তার মাছের ঝুড়িতে খানিক দৈ ঢেলে দিলে,—আর বল্‌ব কি মা, বলতে গা শিউরে উঠ্‌চে,—পচা মাছগুলো জ্যান্ত হয়ে ঝুড়ি থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে পড়্‌তে লাগ্‌লো!

"মণ্ডলগিন্নী তখন মনের আনন্দে বাড়ী ফিরে এসে মরা বেটা, বেটার বৌদের গায়ে সেই হলুদমাখা দৈ ঢেলে ঢেলে দিলে। তখন তারা 'এত বেলা হয়েছে! কি ঘুমই চোখে এসেছিল!' ব'লে গা মোড়ামুড়ি দিয়ে বিছানার উপর উঠে বস্‌লো। 'এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুমুচ্ছিলাম, মা না জানি কি মনে কচ্ছেন', ভেবে বৌরা লজ্জায় আর শাশুড়ীর সাম্‌নে আস্‌তে পারে না! মণ্ডলগিন্নী সকলকে ডেকে সব কথা বল্লে। শুনে সকলে মা ষষ্ঠীর উদ্দিশে 'পেন্নাম' কল্লে, বল্লে, 'মা ষষ্ঠী! কলিতে তুমি বড় জাগ্রত দেবতা, তুমি আমাদের মঙ্গল কর মা! আমরা ঘটা ক'রে তোমার পূজো দেব।'

"মণ্ডলের ছেলেরা তার পর থেকে খুব ধুমধামে শীতল-ষষ্ঠীর পূজো কর্ত্তে লাগ্‌লো। ষষ্ঠীর দয়ায় তাদের সংসার উথ্‌লে উঠ্‌লো। ধূলো মুঠো ধরলে সোনা মুঠো হ'তে লাগ্‌লো! মণ্ডলের ষাট ছেলে, তাদের আবার কত নাতি পুতি হ'লো। শেষকালে বেটা, বেটার বৌ, নাতি, নাৎনী সকলকে রেখে, সোয়ামীর পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে, মণ্ডলগিন্নী স্বর্গে চলে গেল। তার পরণের কস্তাপেড়ে নূতন শাড়ীর, তার পাকা চুলের সিঁথির সিঁদুরের শোভাই বা কত! সতী লক্ষ্মীর সিঁথির সিঁদুর এমনই ডগ্‌ডগ্‌ করে!"

রমণীগণ, এমন কি, বালকবালিকাগণ পর্য্যন্ত এক স্থানে স্থিরভাবে বসিয়া রুদ্ধনিশ্বাসে এই কাহিনী শ্রবণ করিল। বারোয়ারীতলায় তখন কত ধূমধামে নাচ গান চলিতেছে—সে দিকে তাহাদের লক্ষ্য নাই! তাহারা এই সহজ, সরল, অসম্ভব গল্পটিকে প্রাণের মধ্যে সত্যের আসনে স্থান দিয়াছে; সুতরাং তাহাদের সন্তোষের কিছুমাত্র ব্যত্যয় ঘটিল না।

কিন্তু গৃহস্থরমণীগণ এই কাহিনীশ্রবণে যত আনন্দ লাভই করুন, বারোয়ারী-তলায় যাত্রার আসরে আজ যে উদ্দীপনা ও আনন্দের তুফান চলিয়াছে, তাহার তুলনা নাই! দর্শকগণ চারি দিকে কাতার দিয়া বসিয়া গিয়াছে। গোবিন্দ-পুরের দুই এক জন মাত্র লোক পূর্ব্বে মতি রায়ের দলে "ভীষ্মের শরশয্যা"র অভিনয় দেখিয়াছিল; তাহারা আসরে বসিয়া যাত্রার সমালোচনাতেই সময় কাটাইতে লাগিল। কেহ কেহ গান ফেলিয়া তাহাদের বক্তৃতাতে মনঃ-সংযোগ করিলেও, অনেকেরই শ্রবণেন্দ্রিয় যাত্রার দলের অভিনেতাদের অনুপ্রাস-ঝঙ্কারিত, দীর্ঘ-সমাসবহুল, 'নাকি' সুরের বাক্য-রসে পরিতৃপ্ত হইল; এবং ভাবগ্রাহী প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ শ্রোতারা নিবিষ্টচিত্তে গানের মাধুর্য্য উপভোগ করিতে লাগিলেন।

আসরের পাশে কাঠরার চারি দিকে কতকগুলি বেঞ্চি; তাহাতে বসিয়া উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, গ্রাম্য ইংরাজী স্কুলের মাষ্টার, গ্রামস্থ ভদ্রলোক ও তাঁহাদের ছেলেরা নিবিষ্টমনে যাত্রা শুনিতেছেন। মুরুব্বি দলের মধ্যে ঘন ঘন তামাক চলিতেছে,—তিন পয়সা মূল্যের খর্ব্বাকৃতি নূতন থেলো হুঁকোই অধিক; মাতব্বর লোকেরা দুই একটা বাঁধানো হুঁকো পাইতেছেন। গায়কেরা কেহ কেহ আসরের মধ্যে বসিয়া মাথা নীচু করিয়া জলহীন হুঁকোয় এক একটা দম্ দিয়া লইতেছে, তাহার পর দণ্ডায়মান হইয়া মুখব্যাদান পূর্ব্বক বিকট চীৎকারে রাগিণী ধরিতেছে,—কাহারও কাহারও দক্ষিণ হস্তে একখানি ময়লা রুমাল,—তাহারা হস্ত, মস্তক ও ওষ্ঠের বিচিত্র ভঙ্গি করিয়া তাল লইয়া লোফালুফি করিতেছে; এবং এক জন থামিতে না থামিতে আর এক জন প্রসারিত বামহস্ত কর্ণমূলে বিন্যস্ত করিয়া, মুখগহ্বর উন্মুক্ত করিয়া ও অর্দ্ধনিমীলিতনেত্র ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া রাগিণী ভাঁজিতেছে! অধিকারীর সম্মুখে পিতলের একখানি বড় রেকাব। অন্য দিকে একখানি বিরাট কেতাব—খেরুয়া বাঁধা; এই কেতাবখানিই "ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু—গীতাভিনয়"। কাহারও বক্তৃতা মধ্যপথে বাধিয়া গেলে এক জন লোক পুস্তকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিম্নস্বরে বলিয়া দিতেছে; তাহার বক্তৃতা শেষ হইতে না হইতেই ছয় জন 'জুড়ি' চোগা চাপকান-মণ্ডিত দেহে শামলাবিহীন ছয় জন মোক্তারের মত দাঁড়াইয়া প্রাণপণে চীৎকার করিতেছে; তাহাদের চীৎকারের নিবৃত্তি হইলেই আর এক দল লোক আসরের মধ্যে বসিয়া সমোচ্চ স্বরে তাহাদের গানের অনুবৃত্তি করিতেছে! গান জমিয়া গেলে শ্রোতৃবর্গের মধ্য হইতে ঘন ঘন হরিধ্বনি উঠিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে কেহ রুমালে একটা

টাকা বা আধুলি বাঁধিয়া তাহা অধিকারীর রেকাবের দিকে ছুড়িয়া দিতেছে, রুমালখানি কোন গায়কের গাত্রে বা বাদকের পদমূলে আসিয়া পড়িলে তাহারা তাহা যথাস্থানে সরাইয়া দিতেছে; আর একজন টাকা বা আধুলিটি রেকাবে রাখিয়া রুমালখানি যে দিক হইতে আসিয়াছিল, সেই দিকে নিক্ষেপ করিতেছে। জুড়ির গানের পর বক্তৃতা। বক্তৃতার পর একই প্রকার সাজে সজ্জিত দশ বার জন 'ছোকরা' গান মুখে করিয়া উঠিয়া দিকে দিকে বিভক্ত হইয়া দাঁড়াইল। তাহাদের মাথায় জরির তাজ; পরিধানে জরির কারুকার্য্যখচিত কোট ও হাফ্-প্যাণ্ট; কালো, সবুজ ও লাল রঙ্গের মোজা হাঁটু পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, নানাবর্ণের 'গার্টার' দিয়া তাহা জানুমূলে আবদ্ধ; কটিদেশে রবারনির্ম্মিত, বগ্‌লস্-আঁটা কোমরবন্দ; ইহারা হাত ঘুরাইয়া মুখ নাড়িয়া সমস্বরে গান ধরিল,—

"বড় আশা ছিল মনে ওহে বংশীধারী!
দাদারে করিয়া রাজা হ'ব ছত্রধারী।
তা তো হ'লো না, হ'লো না;
এ দুরাত্মা হ'তে তা তো হ'লো না, হ'লো না,
অন্তে পদপ্রান্তে স্থান দয়া ক'রে দিও মুরারি!"

বসিবার স্থান লইয়া হঠাৎ চাষার দলের সঙ্গে ভদ্রলোকদের বচসা আরম্ভ হইল; দর্শকগণ ভাবিয়াছিল, কলহ সহজেই মিটিয়া যাইবে, কিন্তু কলরব ক্রমে উচ্চতর হইতে লাগিল। ভীমসেন তখন সবেমাত্র আসরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, গোঁফে চাড়া দিয়া, হস্তস্থিত তুলাভরা গদা স্কন্ধে তুলিয়া, মস্তকের দীর্ঘকেশরাশি আন্দোলিত করিয়া, তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান দুর্য্যোধনের দিকে বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া, বীরদর্পের সূত্রপাত-

করিয়াছেন; কিন্তু ভীমের অনুপ্রাস-ঝঙ্কারিত সেই নকল বীরদর্প আসল বীরদর্পের ভৈরব হুঙ্কারে ডুবিয়া গেল! অগত্যা ভীমসেনকে কিছুকালের জন্য নির্ব্বাকভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। ইতিমধ্যে আসরে এক কলিকা তামাকুর আবির্ভাব হওয়ায় কালো গর্ণেটের পেণ্টুলন-পরা দুর্য্যোধন হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া, হাতের গদা ফেলিয়া উভয় হস্তে কলিকাটির পুচ্ছদেশ চাপিয়া ধরিয়া তামাকে একটা প্রচণ্ড দম দিয়া লইল!

গোলমাল ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া, বৈকুণ্ঠ তাহার বেহালা-দারকে দুই একটা মিষ্ট গৎ বাজাইয়া গোলমাল থামাইবার জন্য ইসারা করিল।

বৈকুণ্ঠের দলের প্রধান বেহালাদার গণেশ নন্দীর হাত বড় মিঠে; অধিকারীর ইঙ্গিতমাত্র সে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং বেহালাখানি বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া, মুখের নানারকম ভঙ্গী করিয়া, কখনও ঘাড় বাঁকাইয়া, কখনও মাথা দোলাইয়া, একটি মিষ্ট গৎ বাজাইতে আরম্ভ করিল। বেহালার মিষ্টস্বরে অনেকে মুগ্ধ হইল বটে, কিন্তু তখনও কলরবের নিবৃত্তি নাই! কাজেই অধিকারীর আদেশে দুটি ছেলে ঝুঁটা মতির নোলক ও সুদীর্ঘ রুক্ষ পরচুল পরিয়া, পায়ে পিতলের বিবর্ণ ঘুঙ্গুর আঁটিয়া, পুরাতন ঘাগ্‌রাতে সর্ব্বশরীর আবৃত করিয়া, এবং মোমের রঙ্গীন লতা পাতা ফুলে, ও পাখীর পালকে বিভূষিত লাল টুপি মাথায় দিয়া আসরে প্রবেশ করিল; তাহারা নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী করিয়া, দুইহাত শূন্যে তুলিয়া, কখনও বা এক হাতে চিবুক ও অন্য হাতে কেশের বা ওড়নার অগ্রভাগ ধরিয়া, কটিদেশ মুহুঃ বিকম্পিত করিয়া, হেলিয়া দুলিয়া নাচিতে লাগিল; তাহার পর বেহালার সুরে সুর মিলাইয়া অপাঙ্গভঙ্গী করিয়া গায়িতে লাগিল,—

"বারণ কর লো সই !
আর যেন শ্যামের বাঁশী বাজে না, বাজে না !
আমরা গোপেরি বালা
না জানি বিরহ-জ্বালা,
যমুনায় জল আন্‌তে যাওয়া সাজে না, সাজে না।"

এই নৃত্যগীতের প্রভাবে কয়েক মিনিটের মধ্যেই হট্টগোল থামিয়া গেল ! তখন বক্তৃতা ও গান পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল।

এই দিন বৈকুণ্ঠের দলে যে যতই উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করুক, এবং গানগুলি যতই শ্রবণতৃপ্তিকর হউক, একটি বালকের করুণ সঙ্গীত এই গীতাভিনয়ের উপসংহারকালে দর্শকগণের নয়নে অশ্রুতরঙ্গ প্রবাহিত করিয়াছিল। কুরুক্ষেত্রের প্রথম যুদ্ধের অবসানে, দশম দিনে, ভীষ্ম শরজালে আচ্ছন্ন হইয়া ধরাতলে নিপতিত ; শত্রু মিত্র সকলে, কুরুকুল ও পাণ্ডবগণ দুই পাশে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া বিহ্বলনেত্রে পিতামহ ভীষ্মের এই অচিন্তনীয় পরিণাম নিরীক্ষণ করিতেছেন ;—যুধিষ্ঠির তাঁহার রাজ্ঞতার রাজমুকুট ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া চোখে রুমাল দিয়া কাঁদিতেছেন, তাঁহার ললাটস্থিত রক্ত-ত্রিবীররেখা ঘর্ম্মের সহিত মিশ্রিত হইয়া ধারাকারে গোঁফের পাশ দিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে ; ভীমের হাতের লৌহগদারূপী কাঠের দামাট-বিশিষ্ট তুলা-ভরা মুগুরটা ভূপতিত ; অর্জ্জুন বাখারী-নির্ম্মিত গাণ্ডীবের উপর ভর দিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন, তাঁহার নকল সাঁচ্চার পোষাকের ভিতর দিয়া কণ্ঠবিজড়িত তৈলপক্ক মোটা এক কণ্ঠি কাঠের মালার ও ময়লা সার্টের ঘর্ম্মসিক্ত 'কলারে'র কিয়দংশ দেখা যাইতেছে ;—আর অভিমানী রাজা দুর্য্যোধন একটা পিতলের গাড়ু হাতে লইয়া পিতামহের পিপাসা

নিবারণের জন্য অগ্রসর হইয়াছেন ; এমন সময় দশ বারো বৎসর বয়সের একটি সুশ্রী বালক একখানি লোহিত পট্টবস্ত্রে মণ্ডিত হইয়া, পুত্রশোকাকুলা আলুলায়িতকুন্তলা ভীষ্মমাতার বেশে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিল, এবং রণশ্রান্ত, শরাঘাতজর্জ্জরিত, ইহলোকের প্রান্তোপনীত, শর-শয্যায় শায়িত শুভ্রকেশ বীরের শীর্ণদেহ ও বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া, শোকাবেগকম্পিত করুণকণ্ঠে গায়িতে লাগিল,—

"মরি রে মরি, প্রাণকুমার আমার !
এ দশা তোর কে করিল ?
এই বিশ্ব-মাঝে কোন পাষণ্ড
আমার ভীষ্ম-জননী নাম ঘুচা'ল ?
জানি রে তোর ইচ্ছা-মরণ,
তবে এ দশা তোর কিসের কারণ ?
ওরে জীবন-ধন !
দুঃখিনীর অঞ্চলের নিধি
কোন্ দস্যুতে হ'রে নিল ?"

এই গানে শ্রোতৃগণের হৃদয় করুণায় প্লাবিত হইয়া গেল ; তাহারা সকলে আপনার কথা ভুলিয়া, এই তুচ্ছ যাত্রা ও তাহার নগণ্য গায়ক-বর্গের অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া, সেই সুরনরবন্দনীয়া পতিতপাবনী ভগবতী ভাগিরথী ও তাঁহার দেবব্রত মহাবীর পুত্রের এই অন্তিম মিলনের মর্ম্মান্তিক বেদনা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে লাগিল। পুত্রের বিপদে মাতার এই আকুলতা, এই নিদারুণ মর্ম্মোচ্ছ্বাস, এই বিলাপ ও পরিতাপ কোন্ সত্যেক

উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার আলোচনা করিবার কাহারও তখন অবসর ছিল না,—কেবল বিষাদাপ্লুত সঙ্গীতের সেই সুকোমল সুরে, পুত্রশোকে মুহ্যমান মাতৃহৃদয়ের অব্যক্ত অসহ্য বেদনা পরিস্ফুট হইয়া যেন চরাচরের সুপ্ত মাতৃস্নেহকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতেছিল! দর্শকগণের কঠোর সমালোচনা, বিরাগপূর্ণ ভ্রূকুটী ও অশ্রদ্ধার হাস্য—সুগভীর সমবেদনার অশ্রুপ্লাবনে ধৌত করিয়া, তাহাদের মুগ্ধ হৃদয়ে পৌরাণিক যুগের গৌরবময় আসন সংস্থাপন পূর্ব্বক যাত্রার দলের অধিকারী "ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু" পালার উপসংহার করিল।

যাত্রাশেষে অধিকারী গোবিন্দপুরের বড়বাজারের পাণ্ডাদের স্তুতি-সূচক সদ্যোরচিত দুই একটা 'বোঠকেরী' গান গায়িয়া তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিল।

যাত্রা ভাঙ্গিবে, এমন সময় সংএর ফরমাইস হইল। "সং আস্‌চে, সং আসচে!" শব্দে একটা মহা সোরগোল পড়িয়া গেল। সকলে উঠিবার আয়োজন করিতেছিল—সং দেখিবার আশায় আবার জাঁকিয়া বসিল। আবার নবোৎসাহে বাদ্যধ্বনি আরম্ভ হইল।

মজুমদারদের মেজবাবু গ্রামের অন্যতম জমীদার চাটুয্যেদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। চাটুয্যেরা খুব বড় কুলীন বলিয়া সমাজে সুপরিচিত; তাই তাঁহাদের প্রতি অভদ্র ইঙ্গিতের অভিপ্রায়ে মেজবাবুর পরামর্শে "কুলীনের চক্ষুদান" নামক সংএর অবতারণা করা হইল। যাত্রার দলের সং—তাহার রসিকতা ও বাক্যকৌশল উভয়ই 'মেঠো', ভদ্র সমাজে অচল! কিন্তু সেই সংএর বাঁদরামী দেখিবার জন্য গোবিন্দপুরের ভদ্রাভদ্র সকল লোক,—এমন কি, পিতাপুত্র একত্র উপবিষ্ট! অনেকেই দুই চারিটি

স্থূলরসিকতা শুনিয়া মুখবিবরে হাসি আর আট্‌কাইয়া রাখিতে পারিতেছে না, দংষ্ট্রাপংক্তি উদ্‌ঘাটিত করিয়া হাসিতে হাসিতে আসরে প্রায় গড়াইয়া পড়িতেছে। বড়বাজারের প্রধান পাণ্ডা সংএর রসিকতায় আত্মহারা হইয়া মহা উৎসাহে বলিয়া উঠিল,—"সার্থক মেজবাবুর অর্থব্যয়, এই এক সংএই তাঁর মান বজায় রেখেছে!" শুনিয়া চাটুয্যেদের দলস্থ দুই চারিজন চাটুকার শ্রোতার মুখ অন্ধকার হইয়া আসিল।

যাত্রা ভাঙ্গিবার অব্যবহিত পরেই বংশমঞ্চের উপর সমুপবিষ্ট নহবতের দল একবার বাঁশী, কাঁশী ও ঢোলক বাজাইয়া যাত্রাভঙ্গের সংবাদ গ্রামমধ্যে প্রচার করিয়া দিল। তাহার পর নহবৎ থামিতে না থামিতেই, ঢোল বাজাইয়া মৃৎপুত্তলিকার সংএর নাচ আরম্ভ হইল। এই মাটীর সং ও তুচ্ছ নহে! যাত্রার আসরের কয়েক শত হস্ত দূরে একটি স্থান চাটাইয়ের বেড়া দিয়া উঁচু করিয়া ঘেরা হইয়াছে। এই ঘেরের মধ্যে অদৃশ্য-হস্ত-পরিচালিত সংএর নাচ চলিতেছে। ঘেরের বাহিরে দর্শকদল ঊর্দ্ধমুখে দাঁড়াইয়া নাচ দেখিতেছে; সকল ইন্দ্রিয়ের শক্তি যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া তাহাদের আগ্রহতৃষাতুর নয়নে প্রতিফলিত হইতেছে!

প্রথমেই বিদ্যাসুন্দরের হীরা মালিনীর সং, বকুলতলায় গুণসিন্ধু রাজার পুত্র সুন্দরের সহিত হীরার রহস্যালাপ; ক্রমে সন্ন্যাসীবেশে সুন্দরের রাজসভায় আগমন ও মাথা নাড়িয়া আত্মপরিচয়-প্রদান। পাঞ্চাল-রাজ-সভায় নীলবর্ণ অর্জ্জুনের মৎস্যচক্রভেদ; দ্রৌপদীর স্বয়ংবর উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-গণের সহিত রাজগণের তুমুল বচসা; কীচকের সহিত ভীমের মল্লযুদ্ধ; উত্তর-গোগৃহে বৃহন্নলারূপী অর্জ্জুনের যুদ্ধযাত্রা ও প্রাণভয়ে কম্পমান

উত্তরের পলায়নাভিনয়—প্রভৃতি নানা বিচিত্র দৃশ্য দর্শকগণের সম্মুখে দক্ষতার সহিত প্রদর্শিত হইল। উল্লেখযোগ্য সংগুলির মধ্যে একটি সংএ বৌবাজারের বারোয়ারীর পাণ্ডাদের প্রতি বিদ্রূপকটাক্ষ ছিল। বৌবাজারের দলপতি হরিশ হালদার ও তাহাদের গানের ওস্তাদ নিমচাঁদ বিশ্বাস-রূপী দুটি মৃণ্ময়মূর্ত্তি বসিয়া দাবা খেলিতেছে। খেলার উৎসাহে খেলোয়াড়-দ্বয়ের কাছা স্বস্থানভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে; তাহাদের একজনের হাতে একটি ডাবা হুঁকো, একটি দুষ্ট ছেলে অতি সন্তর্পণে তাহার পশ্চাতে আসিয়া হুঁকো হইতে কলিকাটি অপসারিত করিতেছে, কিন্তু ক্রীড়ানগ্ন বৃদ্ধের সে দিকে লক্ষ্য নাই! সে ললাটের চর্ম্ম কুঞ্চিত করিয়া বিকটমুখভঙ্গীসহকারে 'বড়ে' টিপিতেছে; আর তাহার সুযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীটি এতই মনোযোগের সহিত চাল লক্ষ্য করিতেছে যে, তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া একটি ছেলে তাহার দীর্ঘ স্থূলাকার টিকিটি বামহস্তে আয়ত্ত করিয়া একখানি কাঁচির সহায়তায় তাহার মূলোচ্ছেদে প্রবৃত্ত সে দিকে খেয়াল নাই!

সুদীর্ঘ বংশদণ্ডবিশিষ্ট মোটা মোটা টিনের ল্যাম্প হইতে ধূমবহুল কেরোসিনের আলোক ধ্বক্-ধ্বক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; তখন গোধূলীর আলোক সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইয়াছিল। তখনও বারোয়ারীতলায় জনসমাগমের বিরাম নাই; ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া একই ভাবে ঢোলক বাজিতেছে, আর পুতুল-নাচের দল ক্রমাগত তাহাদের কর-ধৃত সংগুলিকে অদৃশ্যসূত্র-পরিচালনে সুকৌশলে নাচাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ কণ্ঠে গান গায়িয়া সংএর ইতিহাস বর্ণনা করিতেছে। তাহাদের গীতধ্বনি ক্রমে মন্দীভূত হইয়া, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে মিশিয়া যাইতেছে,—উৎসবের চঞ্চল আলোকশিখাগুলি দূর হইতে পল্লীগ্রামের অশিক্ষিত মানবমণ্ডলীর

অসংযত আনন্দের উদ্দাম উচ্ছ্বাসের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, তাহারাও নাচের তালে তালে হেলিতেছে, দুলিতেছে, নাচিতেছে।

কিন্তু গ্রামের বাহিরের দৃশ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বাসন্তী ষষ্ঠীর ক্ষীণ চন্দ্রকলা পশ্চিম গগন হইতে ম্লানরশ্মিজাল বিকীর্ণ করিতেছে; নৈশ কুহেলিকার শুভ্র যবনিকা ভেদ করিয়া এই হিমযামিনীর কম্পমান বক্ষে তাহার উজ্জ্বলতা পরিস্ফুট হইতেছে না। চৈতালী শস্যের ছোট ছোট শ্যামল পল্লবে শীর্ষে বিস্তীর্ণ প্রান্তর পরিপূর্ণ; নব বসন্তের ক্ষীণচন্দ্রকরোজ্জ্বল নিশায় তাহা প্রকৃতিরাজ্ঞীর সুদৃশ্য হরিৎ বস্ত্রাঞ্চলের ন্যায় প্রসারিত বলিয়া মনে হইতেছে। গ্রামপ্রান্তস্থ মেঠো রাস্তার ধারে খর্জ্জুরবৃক্ষশ্রেণীর অস্ত্রাঘাত-বিদারিত উচ্চ স্কন্ধ হইতে বিন্দু বিন্দু রস ক্ষরিত হইয়া বৃক্ষকণ্ঠলগ্ন মৃৎ কলসীতে সঞ্চিত হইতেছে। গোপপল্লীর গোয়াল-ঘর হইতে 'সাঁজালে'র প্রচুর ধূম উদ্গত হইতেছে; গোয়ালারা অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া আগুন পোয়াইতেছে। গোপবধূরা কেহ 'সাঁজা' দিয়া দৈ পাতিবার আয়োজন করিতেছে; কেহ বা ময়লা ছেঁড়া কাঁথার উপর আপনার শিশুপুত্রটিকে শয়ন করাইয়া ও স্বয়ং অর্দ্ধশায়িত হইয়া ঘুম পাড়াইবার জন্য তাহাকে স্তন্যপান করাইতে করাইতে মৃদুস্বরে সুর করিয়া বলিতেছে,—

"খোকা ঘুমুলো, পাড়া জুড়ুলো,
বর্গী এলো দেশে,
বুল্‌বুলিতে ধান খেয়েছে,
খাজ্‌না দেব কিসে?"

আর গ্রামের সীমান্তে পথিপ্রান্তস্থ কোন পল্লীবিলাসিনীর পর্ণকুটীরের অভ্যন্তর

হইতে সেই অতাপিনী তালবিহীন নৈরাশ্য-বিজড়িত নীরস তীব্র কণ্ঠধ্বনিতে সুপ্তপ্রায় শান্তিময় নৈশপ্রকৃতির সুগম্ভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সখেদে গায়িতেছে,—

"তামাক খেয়ে গেলে না বঁধু হে,
কত দুঃখ মনে যে রৈল!
ঐ যে চাঁদের পাশে তারা হাসে,
তেঁতুল-পাতা শুকালো।"

দোলযাত্রা

দোলযাত্রা

ফাল্গুন মাস। নববসন্তে পল্লীপ্রকৃতি অতি অপরূপ শ্রী ধারণ করিয়াছে। মাঠে রবিশস্য পক্কপ্রায়। কোথাও বিস্তীর্ণ অরহরের ক্ষেত, গাছগুলি ফলভারে ঈষৎ অবনত; কোথাও সৌরকরদীপ্ত হেমাভ ছোলার ক্ষেত, ছোলাগুলি পক্কপ্রায় হইয়াছে; রাখালেরা দূর মাঠে গরু ছাড়িয়া দিয়া আইলের ধারে খড়ের আগুন জ্বালিয়াছে, সেই আগুনে কতকগুলি পরিপুষ্ট-ফল-পূর্ণ ছোলার গাছ অর্দ্ধদগ্ধ করিয়া ছোলার 'হোরা' করিতেছে। কাঁচা অর্দ্ধদগ্ধ ছোলার নাম ছোলার 'হোরা';—হোরা রাখাল ও পল্লীবালকগণের অতি মুখরোচক খাদ্য। মাঠের মধ্যে কোথাও লঙ্কা-মরিচের ক্ষেত, কৃষকেরা সুপক্ক লঙ্কা তুলিয়া প্রান্তরমধ্যে স্তূপাকার করিয়া রাখিয়াছে; বহু দূর হইতে সেই সকল লঙ্কাস্তূপ সুলোহিত পুষ্পরাশির ন্যায় সুন্দর দেখাইতেছে!—এই সকল স্তূপের অদূরে বসিয়া পূর্ব্ববঙ্গের ব্যাপারীরা লঙ্কার দর লইয়া কৃষকগণের সহিত বাদানুবাদ করিতেছে। মাঠের মধ্যে স্থানে স্থানে দুই একটা কুলগাছ; কুল প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে. তথাপি কুলগাছের তলায় পল্লীবালকের অভাব নাই! যে দুই পাঁচটি সুপক্ক কুল পত্ররাশির মধ্যে ঝুলিতেছে, তাহাই লক্ষ্য করিয়া তাহারা মহা উৎসাহে 'এড়ো' চালাইতেছে; দৈবাৎ দুই একটা কুল বৃন্তচ্যুত হইয়া মাটীতে পড়িলে, সকলে তাহা কুড়াইয়া লইবার জন্য বৃক্ষমূলে হুড়াহুড়ি করিতেছে; কেহ কাহাকেও ঠেলিয়া-ফেলিয়া

হাত বাড়াইয়া কুলটি তুলিয়া লইতেছে, ইতিমধ্যে আর এক জন তাহার পশ্চাতে আসিয়া অতর্কিতভাবে হাতে থাবা দিয়া কুলটি কাড়িয়া লইয়া মুখে পুরিতেছে ; চতুর্থ বালক তাহার উভয় গাল সজোরে টিপিয়া ধরিয়া তাহার মুখবিবর হইতে কুলটি বাহির করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে! এইরূপ দ্বন্দ্বকোলাহলে কুলগাছতলা সজীব হইয়া উঠিয়াছে।

অদূরে একটা দীঘি। দীঘিতে অল্প জল আছে, তাহা অতি স্বচ্ছ ; হেলাঞ্চা কল্মীতে তাহাও আচ্ছন্নপ্রায়। দুই একটি 'পরম ধার্ম্মিক' শুভ্রপক্ষ বক দীঘির ধারে শনৈঃ ধীর পদবিক্ষেপে মৎস্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত। অপরাহ্নকাল সমাগত। অস্তমিত তপনের লোহিত রশ্মিজাল দীঘির পাড়ের খর্জ্জুরবৃক্ষগুলির শীর্ষদেশে রক্তিম আভা বিকীর্ণ করিতেছে। চাষার ছেলেরা প্রভাতে খেজুর গাছের গলায় যে বাঁশের চোঙ্গা বাঁধিয়া গিয়াছিল, তাহা খুলিয়া লইবার জন্য গাছে গাছে ঘুরিতেছে ; এই চোঙ্গার রস জাল দিয়া তাহারা গুড় প্রস্তুত করিবে।

গোবিন্দপুরের পাকা রাস্তা—এই দীঘির পাশ দিয়া, দুই পাশের আম্রকাননের ছায়া ভেদ করিয়া, গ্রামপ্রান্তবাহিনী ক্ষুদ্রকায়া স্রোতস্বিনীর তীর পর্য্যন্ত প্রসারিত। নববসন্তের ঈষৎ-উত্তপ্ত মৃদু সমীরণ-হিল্লোল সদ্যঃপ্রস্ফুটিত আম্রমুকুলের গন্ধ বহিয়া চতুর্দ্দিক সৌরভাকুল করিতেছে ; কোকিল বৃক্ষশাখায় বসিয়া কুহুস্বরে গান করিতেছে ; শ্যামা শিশ্ দিতেছে ; পাপিয়া তাহার সুমধুর স্বরলহরীতে নীলাকাশ প্লাবিত করিয়া মুক্তপক্ষে উড়িয়া যাইতেছে। নির্ম্মল নদীবক্ষে লোহিত মেঘের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। তীরে শ্যামল তৃণদলের উপর খঞ্জন পক্ষী পুচ্ছ আন্দোলিত করিয়া বিচরণ করিতেছে। জীর্ণ খেয়া নৌকায় কত

স্ত্রী পুরুষ নদী পার হইতেছে ;—কাহারও ক্রোড়ে একটি এক বৎসরের শিশু—গলায় রূপার হাঁসুলি, কোমরে রূপার কোমরপাটা, এবং পায়ে চারিগাছি 'ক্ষয়া' মল ; কাহারও স্কন্ধে গুড়ের হাঁড়ি ; কেহ একটি অশ্বের বল্‌গা ধরিয়া দণ্ডায়মান ; কোন ব্যক্তি তাহার প্রভুর নব-জামাতার জন্য প্রেরিত দোলের 'তত্ত্ব' লইয়া নৌকার ফরাসের উপর উপবিষ্ট ; মাঝি নৌকার মাথায় বসিয়া নির্ব্বিকারচিত্তে 'নগি' দিয়া নৌকা ঠেলিতেছে, নৌকা মন্থরগমনে পর পারে চলিয়াছে। স্বচ্ছ জলের মধ্যে শ্যামল শৈবালরাশি দেখা যাইতেছে ; দুই একটা 'বেলে' 'পুঁটী' ও 'কাঁক্‌লে' মাছ জলমগ্ন শৈবালদলের উপর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পল্লীযুবতীগণ গা ধুইয়া জলপূর্ণ পিত্তল কলস কক্ষে লইয়া, সিক্তবস্ত্রে বক্ষ আবৃত করিয়া, রঙ্গীন গামছাখানি কাঁধে ফেলিয়া চঞ্চলপদবিক্ষেপে গৃহমুখে চলিয়াছে। গোধূলির ছায়ায় প্রান্তরপথে চলিতে চলিতে তাহারা মুক্তকণ্ঠে হাসিতেছে ; মলের রুণুরুণু শব্দের সহিত সেই মধুর হাস্যধ্বনি মিশিয়া বসন্তের পল্লীশ্রী আরও বাড়াইয়া তুলিতেছে। গ্রামের ছেলেরা নদীতীরে দাণ্ডাগুলি খেলিতেছে। ছোট ছোট তরীগুলি যাত্রী লইয়া নদীজল আলোড়িত করিয়া গ্রামান্তরে চলিয়াছে। একখানি নৌকার ছৈয়ের ভিতর হইতে একটি নববধূ অবগুণ্ঠন অপসারিত করিয়া সতৃষ্ণ-নয়নে তরুচ্ছায়াসমাচ্ছন্ন তীরের দিকে চাহিতেছে ; নববিবাহিত জীবনের উদ্বেলিত লজ্জা তাহার লাবণ্যমণ্ডিত সুকোমল গণ্ডে রক্তিম আভা বিকাশ করিতেছে, এবং প্রিয়জনবিরহবেদনা সন্ধ্যার তরল অন্ধকারের ন্যায় তাহার সকরুণ চক্ষু দুটির উপর পাণ্ডুর ছায়া ঢালিয়া দিয়াছে।

ক্রমে নদীর জলে সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিল। বৃক্ষমূলে, লতাগুল্মে, প্রান্তরপ্রান্তে দুই চারিটি ঝিঁঝিঁর তীব্র ঝঙ্কার আরম্ভ হইল। পশ্চিম আকাশ হইতে একটি তারকা ম্লান নেত্রের নির্নিমেষ দৃষ্টিতে স্বচ্ছ সলিলদর্পণে আপনার প্রতিকৃতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে চন্দ্রালোক উজ্জ্বল হইল। গ্রামের মধ্যে গোবিন্দদেবের মন্দিরে তুমুলশব্দে ঢাক ঢোল বাজিয়া উঠিল। আজ শুক্লা চতুর্দ্দশী, গোবিন্দদেবের দোলের অধিবাস; কাল বাসন্তী পূর্ণিমায় দোলযাত্রা।

মধ্যাহ্নকালেই গোবিন্দপুরের সন্নিহিত বিভিন্ন গ্রামের বিগ্রহগুলিকে তাঁহাদের পীঠস্থান হইতে গোবিন্দদেবের পূজার দালানে আনা হইয়াছে। চারিজন ব্রাহ্মণ বাহক এক এক বিগ্রহের সিংহাসন বহন করিয়া আনিয়াছেন। কোন কোন ঠাকুর আট দশ ক্রোশ দূর হইতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের বাহক-সংখ্যা অধিক; সঙ্গে দুটি ঢাক, একখানি কাঁশি। কোন কোন ধনবানের দেবোত্তর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বিগ্রহ অধিকতর আড়ম্বরের সহিত আসিয়াছেন; তাঁহাদের বাদ্য—ঢোল, ঢাক, কাঁশি, ডগর ও সানাই।

অপরাহ্ণে গোবিন্দদেবের বিস্তীর্ণ অঙ্গন উৎসবপূর্ণ হইল। বিভিন্ন গ্রামের 'চোদ্দ ঠাকুর' চতুর্দ্দশখানি সিংহাসনে 'বার' দিয়া বসিয়াছেন। ঠাকুরদের নানাবিধ নাম; কেহ মদনমোহন, কেহ গোপাল, কেহ গোপীনাথ, কেহ রাধাবল্লভ, কেহ শ্যামসুন্দর নামে পরিচিত; কেহ প্রসারিত দক্ষিণ হস্তে একটি লাড়ু লইয়া উভয় জানু ও বামহস্তে ভর দিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ স্বর্ণাভরণে মণ্ডিত; কেহ ত্রিভঙ্গভাবে দণ্ডায়মান, করতলে অলক্ত, অধরে মুরলী, বঙ্কিম চূড়ায় শিখিপুচ্ছ, পীতধড়ায় কটি-

তট বেষ্টিত ;—বিভিন্ন ভঙ্গীর ভিন্ন ভিন্ন দেবমূর্ত্তি। সিংহাসনগুলির কোনখানি বৃহৎ, কোনখানি সোনালি বা রূপালি রাঙ্গতা দ্বারা সুসজ্জিত, কোনখানি পীত বা লোহিত বস্ত্রে আবৃত, কোনখানি শুভ্র কাঠমল্লিকা, জুঁই, বেলি, বা পীতাভ চম্পকপুষ্পে ভূষিত। সভার মধ্যস্থলে সিংহাসনে গোবিন্দদেব লাড়ুগোপাল মূর্ত্তিতে উপবিষ্ট; তাঁহার ললাটে ও কপোলে অলকা-তিলকা অঙ্কিত, তিনটি শিখিপুচ্ছ ললাটের উর্দ্ধে অলক-গুচ্ছের সহিত সুবর্ণফলকে আবদ্ধ। আজ তাঁহার পরিধানে পীতধড়া, সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণভূষণ, মস্তকের উপর রৌপ্যনির্ম্মিত রাজছত্র, রৌপ্যসিংহাসনস্থ শয্যার চতুর্দ্দিকে পীত মখমলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুগোল উপাধান। অন্যান্য বিগ্রহের অধিক পরিচ্ছদপারিপাট্য নাই; তাঁহারা ক্ষুদ্রগ্রামের দেবতা নিমন্ত্রণে আসিয়া রাজ-পারিষদবর্গের ন্যায় গোবিন্দদেবের উভয় পার্শ্বে শোভা পাইতেছেন।

গোবিন্দদেবের আঙ্গিনাখানি আজ সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়াছে। প্রতিদ্বারে কুশনির্ম্মিত রজ্জুতে আম্রপত্র ও সোলার কদম্ব ফুল দুলিতেছে; আঙ্গিনার প্রবেশদ্বারে একটি সুদৃশ্য তোরণ. দেবদারু ও কামিনীপত্রে ভূষিত, তাহার উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ কদলীতরু; আঙ্গিনাখানি আচ্ছাদিত করিয়া শুভ্র চন্দ্রাতপ উর্দ্ধে প্রসারিত; লোহিতবস্ত্র পদ্মাকারে কাটিয়া তাহার চারি কোণে ও মধ্যস্থলে আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে, মধ্যস্থলের লাল পদ্মটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। চন্দ্রাতপের একধারে তাহার অধিকারীর নাম, ধাম ও চন্দ্রাতপ-নির্ম্মাণের সন তারিখ লেখকের বর্ণজ্ঞানের দৃষ্টান্তস্বরূপ বিরাজ করিতেছে! বাঁড়ুয্যেদের বড় সরিক সূর্য্যকুমার বাবু এই চন্দ্রাতপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন; চন্দ্রাতপের এক প্রান্তে তাঁহার নাম লেখা—"শ্রীজুৎ

শুর্জ্জ ঙ্গমার বন্দপাধ্যায়।” একালের লোকে এই বানানের মধ্যে অনেকখানি ‘ওরিজিনালিটী’ দেখিতে পায়!

সমস্ত আঙ্গিনাখানি গোময়ানুলিপ্ত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বেলা যত শেষ হইয়া আসিল, ততই সেখানে গ্রামের বালক যুবক বৃদ্ধগণের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল; পল্লীরমণীগণ অন্দরের পথ দিয়া চিকের আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইল। দেউড়ীর পাশে একটি ছোট অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠে বসিয়া বাজন্দারেরা অধিবাসের বাজনা বাজাইতে লাগিল।

সন্ধ্যা গাঢ় না হইতেই বাঁড়ুয্যে-বংশধরগণ—পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র, ভাগিনেয়েরা পবিত্র পট্টবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক স্থূল তুলসীমাল্যে কণ্ঠের শোভাবৃদ্ধি করিয়া মুক্তপদে আঙ্গিনায় সমবেত হইলেন। তাঁহাদের কাহারও অঙ্গে রাধাকৃষ্ণের নাম ও চরণাঙ্কিত রেশমী নামাবলী, কাহারও দেহে রেশমী দোবজা বা সুচিক্কণ রামপুরে চাদর, কাহারও মাথায় টিকি, কাহারও দাড়িগোঁফ কামান, প্রায় সকলেই সর্ব্বাঙ্গে গঙ্গামৃত্তিকা ও চন্দনে তিলক চর্চ্চা করিয়াছেন, এবং পাছে মোহরাঙ্কিক অঙ্গের শোভা সাধারণের দৃষ্টিপথে না পড়িয়া ব্যর্থ হয়, এই আশঙ্কায় অনেকে সাবধানে সর্ব্বাঙ্গ অনাবৃত রাখিয়াছেন; নামাবলী বা দোবজাখানি হয় মস্তকে, না হয় কটিদেশে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। কাহারও স্কন্ধে খোল ঝুলিতেছে, কেহ করতাল, কেহ কাঁশর, কেহ বা রামশিঙ্গা লইয়া সঙ্কীর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন; প্রাচীন মুরুব্বি মহাশয়েরা গম্ভীরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া ভক্তিবিহ্বলনেত্রে দেবদর্শন করিতেছেন।

‘বাবুরা’ আজ সঙ্কীর্ত্তনে বাহির হইবেন। আজ নগর-সঙ্কীর্ত্তন,—অসাধারণ দৃশ্য; তাহার উপর বাবুদের দল! গ্রাম্যপথের দুই ধারে গ্রামের

লোক কাতার দিয়া দাঁড়াইয়াছে; প্রাঙ্গনতলেও অনেকে আসিয়া জুটিয়াছে। সঙ্কীর্ত্তনের আভাস পাইবামাত্র ঢক্কাধ্বনি থামিয়া গেল; এবং সমতালে চারিখানি মৃদঙ্গের 'ভুজ্‌তাভুজাং' শব্দ আরম্ভ হইল। সূর্য্যকুমার বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র নবীন বাবু সঙ্গীতরচনায় সুনিপুণ, অদ্যকার এই নগর-সঙ্কীর্ত্তনের জন্য তিনি নূতন 'পদ' রচনা করিয়াছেন; নবীন বাবুর হস্তে একখানি কাগজ, তাহাতে গানটি লেখা আছে। নবীন বাবু গান ধরিলেন,—

"আনন্দবদনে সবে হরি হরি বলো।
হরি ব'লে বাহু তুলে রাধার কুঞ্জে চলো॥
(শ্রীরাধার কুঞ্জে হে!)
(মাখি' হরি-পদো-রজো হে!)"

সঙ্গে সঙ্গে বালক, যুবক ও বৃদ্ধ,—প্রায় বিশ জন গায়ক দক্ষিণ বাহু উৎক্ষিপ্ত করিয়া মুখব্যাদান পূর্ব্বক সমস্বরে গায়িতে লাগিল, "মাখি' হ'র-পদো-রজো হে!" চারিদিকে দর্শকগণ উন্নমিত দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী ঘুরাইয়া প্রেমভরে যুগপৎ হরিধ্বনি করিয়া উঠিল,—"কৃষ্ণানন্দে পূর্ণ ক'রে একবার হরি হরি বলো!" মিনিট পাঁচেকের মধ্যে বৈষ্ণবচূড়ামণি গোবর্দ্ধন দাস ভাবাবেশে বিভোর হইয়া চিন্তামণি অধিকারীকে আলিঙ্গন করিতে গেল; চিন্তামণির বোধ করি তখনও তেমন ভাব লাগে নাই, সে দুই হাতে গোবর্দ্ধনকে সরাইয়া দিয়া গান করিতে লাগিল। সঙ্কীর্ত্তনকারীগণ নাম গায়িতে গায়িতে প্রাঙ্গণ ছাড়িয়া দেউড়ীর বাহিরে আসিল। চারি চারিজন বাহক গঙ্গোদক-স্পর্শে দেহ পবিত্র করিয়া, এক এক ঠাকুরের সিংহাসন স্কন্ধে লইয়া সঙ্কীর্ত্তন-দলের অনুবর্ত্তী হইল; ঢাক, ঢোল,

সানাই, বাঁশী, ডগর, কাড়া উচ্চনাদে শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিল।

বাঁড়ুয্যে-বাড়ীর ফটকের বাহিরে বিস্তীর্ণ খোলা ময়দান। রথ ও দোল উপলক্ষে এখানে মেলা বসে। এই মাঠের এক প্রান্তে একটি ইষ্টকনির্ম্মিত দোলমঞ্চ। মঞ্চটি অতি প্রাচীন; কিন্তু উৎসব-উপলক্ষে তাহা চুনকাম ও সুসজ্জিত করা হইয়াছে। আজ নৈশ আলোকমালায় ইহা অতি সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছে। কতকগুলি 'মৈ-মশাল', সোলার ফুলবাগান, অভ্রের ঝাড় শ্রেণীবদ্ধ বাহকস্কন্ধে অদূরে প্রতীক্ষা করিতেছিল; একদল চাষা কতকগুলি খাস ও নিশান স্কন্ধে লইয়া সারিদিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।—সঙ্কীর্ত্তনকারিগণ বাহিরে আসিবামাত্র ছোটবাবুর আদেশে সকল দল সমতালে পা ফেলিয়া বাজারের দিকে অগ্রসর হইল। প্রত্যেক ঠাকুরের সিংহাসনের দুই পাশে বড় বড় মশাল জ্বলিতে লাগিল; দীপক ও রঙ্গমশালের লাল, সবুজ ও শুভ্র আলোকে রাজপথ রঞ্জিত বোধ হইল, এবং শুক্লাচতুর্দ্দশীর চন্দ্রের সুধাধবল নির্ম্মল কিরণ ও ম্লান হইয়া গেল!

বোসপাড়া, চক্রবর্ত্তীপাড়া, আচার্য্যপাড়া প্রভৃতি বিভিন্ন পাড়ার ছেলেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সিংহাসনে মাটীর গোপাল বসাইয়া, সেই সকল সিংহাসন লইয়া এই উৎসবদলের সহিত সম্মিলিত হইল। গ্রামের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া যে পথ আছে, সেই পথে উৎসবের দল ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। তেমাথা বা চৌমাথা পথে, রমণীগণ—কেহ ছেলে কোলে লইয়া, কেহ পার্শ্ববর্ত্তিনী ছোট মেয়েটির হাত ধরিয়া, কেহ বা কোনও বর্ষীয়সী রমণীর পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়া, ঊর্দ্ধমুখে

অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সিংহাসনারূঢ় ঠাকুরদের শ্রীমুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল; যেমন একখানি সিংহাসন তাহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে, আর অমনই তাহারা দক্ষিণ হস্তে ললাট স্পর্শ করিয়া ঠাকুর প্রণাম করিতেছে। সংকীর্ত্তনের দল চলিয়া গেলে বৃদ্ধারা পথের উপর সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া সঙ্কীর্ত্তনকারিগণের পদস্পর্শপূত পথের রজ ভক্তিভরে কণ্ঠে, ওষ্ঠে ও মস্তকে ধারণ করিতেছে।

গ্রামের অর্দ্ধাংশ প্রদক্ষিণ করিয়া ঠাকুরদের বাহকগণ ও সঙ্কীর্ত্তনের দল পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল; আচার্য্যপাড়ার হরিশ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে গোবিন্দদেবের ও তাঁহার সহচর দেব অতিথি বৃন্দের ভোগ ও বিশ্রামের আয়োজন ছিল। হরিশ চক্রবর্ত্তী বাঁড়ুয্যে বাবুদের কুলপুরোহিত, বাঁড়ুয্যেরা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণকে অনেক ব্রহ্মোত্তর জমী দান করিয়াছিলেন; সেই অধিকারে বহু পূর্ব্ব হইতে দোলের অধিবাসের দিন গ্রামপ্রদক্ষিণকালে গোবিন্দদেব তাঁহার সহচরবৃন্দসহ চক্রবর্ত্তী-বাড়ীতে পদার্পণপূর্ব্বক কিছুকাল বিশ্রাম করেন। হরিশ চক্রবর্ত্তীর ব্রাহ্মণী সর্ব্বমঙ্গলা দেবী প্রতিবেশিনী ব্রাহ্মণকন্যাগণের সহায়তায় আজ সারা দিন ধরিয়া দেবাভ্যর্থনার আয়োজন করিয়াছেন। সর্ব্বমঙ্গলা দেবী আজ উপবাসিনী আছেন, দেবতাদের 'বৈকালী'র পর কিঞ্চিৎ প্রসাদ গ্রহণ করিবেন।

উৎসবের দল চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর সন্নিকটবর্ত্তী হইল। বাহকগণ লম্বা 'খড়ো' আটচালার মধ্যে দেবসিংহাসনগুলি রাখিয়া মুক্ত প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ললাটের ঘর্ম্মমোচন করিতে লাগিলেন। সঙ্কীর্ত্তনকারিরা সুদীর্ঘ পথ নাম গায়িয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন; শেষবার তাঁহারা গৃহপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া খুব দ্রুততালে উচ্চৈঃস্বরে সমস্ত গানটা গায়িয়া ফেলিলেন

'খুলী'র মাথা নাড়িয়া টিকি দুলাইয়া কুঞ্চিত ভ্রূযুগল কপালে তুলিয়া, নানা ভঙ্গিতে তাহাদের কণ্ঠবিলম্বিত মৃদঙ্গে অঙ্গুলি-তাড়না করিতে লাগিল; কটিপরিবেষ্টিত উত্তরীয়প্রান্ত মাটীতে লুটাইয়া পড়িল, উভয় পদের ব্যবধান ক্রমে বিস্তৃত হইতে লাগিল, ঘর্ম্মধারায় ললাটের চন্দন, নাসিকার তিলক, বাহুমূল ও বক্ষঃস্থলের 'পদাঙ্কচিহ্ন' ভাসিয়া যাইতে লাগিল। গায়কগণ উভয় বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া গান গায়িতে গায়িতে লম্ফঝম্ফে উৎসবপ্রাঙ্গণ প্রকম্পিত করিয়া তুলিল! তখন গান চলিতেছিল,—

"হরি ব'লে আমার গৌর নাচে!
নাচে রে গৌরাঙ্গ আমার হেমগিরির মাঝে;
রাঙ্গা পায়ে সোনার নূপুর রুণু-ঝুণু বাজে!"

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে গীতবাদ্য থামিয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক হইতে শতকণ্ঠে হরিধ্বনি হইল।

এইবার 'বৈকালী'র আয়োজন! দশ বারো জন ব্রাহ্মণতনয় বড় বড় রেকাবে কমলা লেবু, আক, ক্ষিরে, পেয়ারা, শাঁক-আলু, আঙ্গুর, মেদানা প্রভৃতি ফলমূল ও নানাপ্রকার 'ভিজে' সাজাইয়া আনিল; ছানা, ক্ষীর, সর, দুধ, কাঁচাগোল্লাও থরে থরে সজ্জিত হইয়া আসিল। কয়েক জন পুরোহিত দুই একটি সংক্ষিপ্ত মন্ত্র আওড়াইয়া ও কয়েকটা করিয়া ফুল ফেলিয়া এই সকল ফলমূল মিষ্টান্ন ঠাকুরদের 'নিবেদন' করিয়া দিলেন।

ঠাকুরদের ভোগ শেষ হইলে সঙ্কীর্ত্তনকারিগণ সারি বাঁধিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতে বসিলেন। বড় বড় পাথরের খোয়ার চিনির সরবৎ ছিল;

নাটীয় গেলাসের এক এক গেলাস সরবৎ, বাতাসা, খোঁওা ও ফলমূলাদি উদরসাৎ করিয়া তাঁহারা পরিতৃপ্ত হইলেন।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে সিংহাসনগুলি আবার বাহকগণের স্কন্ধে উঠিল, জোরে জোরে ঢাক ঢোল, ডগর, কাড়া, কাঁশর বাজিতে লাগিল; আবার নূতন সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল,—

"হরিনাম কি মধুর নাম!
নাম শুনে প্রাণ শীতল হ'লো রে!
কি মধুর নাম!
নামের বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে,
কি মধুর নাম!
এ নাম গোলোকে গোপনে ছিল,
কি মধুর নাম!
এ নাম জীব তরাতে এসেছে রে!
কি মধুর নাম!"

এই সঙ্কীর্ত্তন গায়িতে গায়িতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হইল। অবশেষে উৎসবের দল দোলমঞ্চের সম্মুখে আসিয়া থামিল। বহুলোকের সমাগমে দোলমঞ্চ ও তাহার চতুর্দ্দিক সরগরম হইয়া উঠিল।

অনন্তর বাহকগণ ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের সেই চতুর্দ্দশ বিগ্রহের সিংহাসনগুলি স্কন্ধে লইয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে গোবিন্দদেবের দোলমঞ্চ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। গোবিন্দদেব স্বয়ং সকলের পশ্চাতে থাকিয়া বাহকস্কন্ধে দোলমঞ্চ প্রদক্ষিণ করিলেন। গ্রামস্থ রমণীগণের সমাগমে মঞ্চটি পরিপূর্ণ। তাহারা দোলমঞ্চের উপরে ও পুরুষ দর্শকগণ তাহার চারি পাশে দাঁড়াইয়া

নির্নিমেষনেত্রে উৎসব দেখিতে লাগিল। সাতবার মঞ্চ প্রদক্ষিণ করা হইলে ভিন্ন গ্রামের বিগ্রহগুলিকে গোবিন্দদেবের সুবিস্তীর্ণ দালানে বিশ্রামার্থ লইয়া যাওয়া হইল; কিন্তু গোবিন্দদেবকে বাহিরেই থাকিতে হইল, তাঁহার অধিবাসের সকল অনুষ্ঠান তখনও শেষ হয় নাই!

দোলমঞ্চের অদূরে একটি 'নেড়া' প্রস্তুত ছিল। এই নেড়া একটি অদ্ভুত পদার্থ; অনতিদীর্ঘ কঞ্চি-সমন্বিত একটি শুষ্ক বংশদণ্ড আগাগোড়া কতকগুলি খড় ও দড়ি দ্বারা মণ্ডিত হইয়া 'নেড়া' নামে আখ্যাত হয়! গোবিন্দদেব যতক্ষণ দোলমঞ্চ প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন, ততক্ষণ কয়েকটি দীপক ও রঙ্গমশাল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছিল; তাঁহার মঞ্চপ্রদক্ষিণ শেষ হইবামাত্র একজন মশালধারী সেই 'নেড়া'র খড়ে মশালের আগুন ধরাইয়া দিল। অগ্নিস্পর্শমাত্র শুষ্ক খড় দপ্-দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বাহকগণ গোবিন্দদেবের সিংহাসনখানি সেই প্রজ্বলিত নেড়ার চতুর্দ্দিকে সাতবার ঘুরাইল। 'নেড়াপোড়া' শেষ হইলে গোবিন্দদেবকে বাজনা বাজাইতে বাজাইতে তাঁহার দালানে লইয়া যাওয়া হইল।

এইবার অগ্নিক্রীড়া। একজন মালাকর একটি জ্বলন্ত পলিতা লইয়া চক্রাকারে সংরক্ষিত ভুইচাঁপা ও তুবড়ীতে অগ্নিসংযোগ করিল; তৎক্ষণাৎ মহাবেগে অগ্নিক্রীড়া আরম্ভ হইল। সেগুলির অগ্নিস্রোত রুদ্ধ না হইতেই চরকী, সীতাহার প্রভৃতি নানাপ্রকার বাজীতে ক্রমে অগ্নিসংযুক্ত হইল; দক্ষিণে, বামে, ঊর্দ্ধে, মধ্যদেশে—চতুর্দ্দিকে মহাবেগে অগ্নিস্রোত প্রবাহিত হইল। দশ পনেরটা হাউই এক সঙ্গে সন্‌সন্ শব্দে আকাশে উঠিল, এবং রঙ্গিন তারা কাটিয়া নীচে পড়িতে পড়িতে অদৃশ্য হইয়া গেল। পাঁচ সাতটা বোম্ অগ্নিস্পর্শে যুগপৎ বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় গম্ভীর

শব্দ করিল; সে শব্দ বহু দূরে প্রতিধ্বনিত হইল। বালকবালিকাগণের কৌতুকস্পন্দিত বক্ষ দুরুদুরু করিতে লাগিল। যুবকগণ বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে বাজী পোড়ান দেখিতেছিল, তাহারা আনন্দে ও উৎসাহে করতালি দিয়া বলিল, "সাবাস বনমালী! বাহবা বাজী তৈয়েরী করেছ! না হ'বে কেন? চিনিবাস মালীর জোড়া কারিকর কি আর এ তল্লাটে ছিল? তার ছেলে কি না! 'বাপ্‌কা বেটা শিপাইকা ঘোড়া, কুছ্‌ না হোর তব্‌ বি থোড়া'!" পল্লীযুবতীগণ বাঁড়ুয্যে-বাড়ীর বাতায়ন-অন্তরালে দাঁড়াইয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত অগ্নিক্রীড়া দেখিতেছিল। বাজী পোড়ান প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় বাঁড়ুয্যেদের মেজবাবু বলিলেন,—"বনমালী! এবার তোমার বাজী খুব উৎরে গিয়েছে; এই তোমার বকশিস্‌!" মেজ বাবুর গরদের জামাটি বিদ্যাধর-হস্তমুক্ত পুষ্পমালার ন্যায় তাহার মস্তকে নিপতিত হইল। বনমালী মাথা নোয়াইয়া কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনপূর্ব্বক বাজীর ঝোড়া হইতে ডজনখানেক 'ছুঁচো বাজী' বাহির করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া ছাড়িয়া দিল! বহ্নিমুখ কৃত্রিম ছুঁচোর দল সজীব ছুছুন্দরের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া দর্শকগণের মধ্যে সবেগে ছুটাছুটি করিতে লাগিল; কাপড়ে আগুন লাগিবার ভয়ে দর্শকেরা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

দোল তলায় বাজী পোড়ান শেষ হইয়াছে দেখিয়া সকলে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিল; দেখিতে দেখিতে দোলতলা জনশূন্য হইয়া পড়িল। তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে,—চতুর্দ্দশীর চন্দ্রালোকে সমস্ত প্রকৃতি যেন হাসিতেছে। গ্রামের মধ্যে আর কোনও শব্দ নাই, কেবল গ্রামপ্রান্তস্থ নিভৃত আমবাগানের মধ্যে আম্রমুকুলের সৌরভাকুল একটা

কোকিল আকুলস্বরে ডাকিতেছে—কু-কু-কু! তাহার সেই স্বর মৌন স্নিগ্ধ প্রকৃতির বক্ষে ধ্বনিত হইয়া দিগন্তে মিলাইয়া যাইতেছে।

প্রভাতে দোলতলায় আবার নব উৎসাহে ঢাক ঢোল বাজিয়া উঠিল। আজ পূর্ণিমা, গোবিন্দদেবের দোলযাত্রা। রাত্রিশেষে ভিন্ন গ্রামের বিগ্রহেরা বাহকস্কন্ধে স্ব স্ব মন্দিরে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে যে সকল পুরোহিত আসিয়াছিলেন, তাঁহারা বাঁড়ুয্যে-বাড়ী যথারীতি দক্ষিণা লাভ করিয়া, কেহ ঠাকুরের সঙ্গে গৃহে ফিরিয়াছেন, কেহ কেহ গোবিন্দপুরের দোল দেখিবার জন্য কোনও বন্ধুগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। চতুর্দ্দশী ছাড়িয়া পূর্ণিমা লাগিলে, গোবিন্দদেব বাহক-স্কন্ধে দোলমঞ্চে উপস্থিত হইলেন। একটি উচ্চ আড়ায় দুইগাছি মোটা দড়িতে তাঁহার সিংহাসন ঝুলিতে লাগিল; এই রজ্জুদ্বয় লোহিতবস্ত্রমণ্ডিত। সিংহাসনের উভয় পার্শ্ব ও পশ্চাৎভাগ লোহিত মখমলে আচ্ছাদিত, কেবল সম্মুখভাগ উন্মুক্ত। দোলমঞ্চের উপর সর্ব্বত্র লাল 'টুলে'র কাপড় প্রসারিত। গোবিন্দদেব সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিত হইয়া সিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন; দুই জন দ্বারবান দোলমঞ্চের সোপানসন্নিধানে বসিয়া ঠাকুরের অলঙ্কার-রক্ষায় নিযুক্ত। অনেক দিন পূর্ব্বে দোলমঞ্চ হইতে গোবিন্দদেবের অনেকগুলি অলঙ্কার অপহৃত হইয়াছিল; লুব্ধ তস্করেরা দেবমহিমাকেও গ্রাহ্য করে না বলিয়াই রক্ষি-নিয়োগের ব্যবস্থা।

বেলা বারোটার পর হইতেই গোবিন্দপুরের নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীরা দলে দলে দোলতলায় সমবেত হইতে লাগিল। তখন দোকানী পশারীরা গ্রাম্যবাজার হইতে আরম্ভ করিয়া দোলতলা পর্য্যন্ত পথের দুই পাশে দোকান খুলিয়া বসিল। এই সকল দোকানের মধ্যে মিষ্টান্ন ও মণি-

হারীর দোকানই অধিক। মিষ্টান্নের দোকানদারগণ এক একখানি চৌকী পাতিয়া, তাহার উপর ধামায় চিঁড়া মুড়কী, পিতলের থালে ছানা-বর্জ্জিত মোণ্ডা, গোল্লা, রসকরা, চিনির ও গুড়ের ছাঁচ, তেলে-ভাজা জিলিপি, বিবর্ণ মেঠাই, বাতাসা প্রভৃতি সাজাইতে লাগিল। মণি-হারী জিনিসের দোকানদারেরা চটের উপর তাহাদের পণ্যদ্রব্য বিছাইয়া বসিল। ইহাদের দোকানে কাঠের পুতুল, ত্রাস, বোতাম, ছুরি, কাঁচি, তালাচাবি, দেশলাই বাক্স, কাঠের কৌটা, টিনের বাঁশী, ঝুটো মতির মালা, পিতলের বালা, গুলিসুতা, পট্‌কা, কালীঘাটের এক পয়সা দামের পট প্রভৃতি অল্প মূল্যের সামগ্রীই অধিক। এই সকল দোকান ভিন্ন আবিরের দোকান, বাঁশের বাঁশীর দোকান, তালপাতার ছাতার দোকান, কুমোরের হাঁড়ি, ছোবা, মাটীর পুতুলের দোকান—চারি দিকে কত জিনিসের দোকান বসিল, তাহার সংখ্যা নাই। পান সিগারেট ও বার্ডসাই বিক্রেতারা ছোট ছোট জলনৌকী সাজাইয়া তেমাথা চৌমাথা রাস্তায় বসিয়া হাঁকিয়া হাঁকিয়া "পান চুরোট বিড়ি বার্ডসাই" বিক্রয় করিতেছে।

বেলা তিনটার সময় দোলতলায় জনপূর্ণ হইয়া উঠিল। ছোট ছোট ছেলেরা তাহাদের মা বাপের কাছে দোল দেখিবার জন্য দুই চারি পয়সা আদায় করিয়া, কেহ চাকরের সঙ্গে, কেহ ঝির সঙ্গে, কেহ কেহ বা বাড়ীর কোন লোকের সঙ্গে, ভাল কাপড় জামা পরিয়া দোল দেখিতে চলিয়াছে। কোন ছেলে বাঁশের একটা বাঁশী কিনিয়া গলা ফুলাইয়া তাহাই বাজাই-তেছে। কেহ দুই পয়সার পট্‌কা কিনিয়া, এক একটা পট্‌কায় আগুন ধরাইয়া তাহা বন্ধুদের দলে ছুঁড়িয়া ফেলিতেছে, পট্‌কার পটাস্ পটাস্

আওয়াজ হইতেছে, আর বালকের দল সভয়ে পলাইতে গিয়া অন্য লোকের গায়ের উপর পড়িতেছে।—কেহ গালি দিতেছে, কেহ হাসিতেছে, কেহ কাহাকেও মারিয়া পলাইয়া যাইতেছে; চারিদিকেই উৎসাহ, উদ্দীপনা, কোলাহল!

দত্তদের মতি গ্রামের দুষ্ট ছেলেদের সর্দ্দার। সে দুষ্টুমীর নব নব ফন্দী আবিষ্কার করিয়া তাহার সমবয়স্ক বালকদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করিত। একটা আবিরের দোকানে আসিয়া সে চারি পয়সার আবির কিনিল, এবং তাহা কোঁচড়ে পুরিয়া শিকারের সন্ধানে বাহির হইল। কিন্তু তাহাকে অধিক দূর যাইতে হইল না; সে দেখিল, দোলতলায় তাহার পাঁচ সাতটি 'ইয়ার' দল বাঁধিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মতি কোঁচড় হইতে এক মুষ্টি আবির বাহির করিয়া ধীরে ধীরে সেই দলের নিকটবর্ত্তী হইল, এবং চক্রবর্ত্তীদের বিষ্ণুর চোখে মুখে ও কপালে তাহা মাখাইয়া দিয়াই সেখান হইতে চম্পট দিল! বিষ্ণু বেচারা সহসা আক্রান্ত হইয়া আর চক্ষু খুলিতে পারিল না, নতমুখে উভয় হস্তে চক্ষু মার্জ্জনা করিতে করিতে তাহাকে কুটুম্ব সম্বোধনে আপ্যায়িত করিতে লাগিল। এ দিকে বিষ্ণুর সঙ্গীরা ব্যাঘ্রের ন্যায় এক লম্ফে মতির উপর আসিয়া পড়িল, এবং তাহার কোঁচড় হইতে আবিরগুলি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া প্রথমে তাহা সজোরে তাহার মাথায় মাখাইয়া দিল; শেষে তাহার চোখ, মুখ, পিঠ—দেহের সকল অংশই লাল হইল! মতি বিষ্ণুর বন্ধুচক্রে পরিবেষ্টিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। সে-ও নিতান্ত নির্ব্বান্ধব হইয়া এই বিপদ-সমুদ্রে প্রবেশ করে নাই; বিপিন, মোহিনী, চারু, রজনী প্রভৃতি অনেকগুলি বন্ধু দূর হইতে তাহার আক্রমণকারীদিগের

পৃষ্ঠে কুঙ্কুম ছুড়িয়া মারিতে লাগিল; রঞ্জিত জলধারা তাহাদের কামিজ ও চাদর ভিজাইয়া, পিঠ ভাসাইয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝরিতে লাগিল। সকলে লাল হইয়া গেল। গ্রামের অনেক দুষ্ট ছেলে বাঁশের চোঙ্গার পিচ-কারীতে ম্যাজেণ্টা, আবির ও খুনখারাপি রঙ্গের 'গোলা' পুরিয়া বটগাছ, জামালকোটার বেড়, বা প্রাচীরের আড়ালে দাঁড়াইয়া, পথের লোকের সর্ব্বাঙ্গে রঙ্গধারা নিক্ষেপ করিতে লাগিল; শুভ্রবস্ত্রে কাহারও গৃহে ফিরিবার সম্ভাবনা রহিল না। চারি দিক লালে লাল!

সূর্য্য অস্তে গেল। বাঁড়ুয্যেদের দেউড়ীতে চাটাইয়ের উপর বসিয়া স্বরূপপুরের মুচীর দল জোরে জোরে ঢাক ঢোল কাঁশি বাজাইতে লাগিল; পুরোহিত ঠাকুর গোবিন্দদেবের সিংহাসনের এক পার্শ্বে বসিয়া রজ্জুবদ্ধ সিংহাসনখানি দোলাইতে লাগিলেন। গ্রাম্য-কামারেরা, মালীরা জনতার মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাদের স্বহস্তনির্ম্মিত লোহার ও শোলার শিল্পদ্রব্য বিক্রয় করিয়া ফিরিতেছে। জেলে ও বাগ্দীর মেয়েরা বটগাছের নীচে বসিয়া মাছ, তরকারী, ঢ্যাপ ও ভুট্টার খৈ, পদ্মের 'চাকি' প্রভৃতি বিক্রয় করিতেছে। চাষার ছেলেরা নাগরদোলায় উঠিয়া মহানন্দে পাক খাইতেছে। রমণীগণ কুমোরের দোকানের সম্মুখে জটলা করিতেছে—সেখানে রাশিকৃত মাটীর ভাঁড়, ছোবা, কৃষ্ণঠাকুর, সিপাই, কুকুর, বিড়াল, ব্যাং! চাষার দল [illegible] পুরোহিত, মাথায় সুরঞ্জিত রুমাল-বাঁধা, ছোট ছোট ছেলেগুলিকে কাঁধে লইয়া জনতার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এবং দৈবাৎ কোনও পরিচিত খাঁ, মণ্ডল, বা মাল্‌তের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তাম্বুলরাগরঞ্জিত দশনপংক্তি উদ্ঘাটিত করিয়া বলিতেছে, "কি গো মামু! দোল ছাখ্‌তি আয়েচো? এবার ত্যামোন জাঁক দেক্‌চি নে। মুই ত

আস্‌বো না ঠাউরেই বস্যাছ্যালাম, তা ছাবালটা র মান্‌তি ছ্যালে না, তামান বেলাডা ঘ্যান্ ঘ্যান্ করতি নাগ্‌লো ! কুলে দামড়াটা যে মোর কনে পালালো, তা সম্‌জাতি পার্‌চিনে ; একা মানুষ, বড্ডা ঝক্‌মারিতে পড়েচি। তাগাদগিরি শালা আবার দোলের পরবীর জন্যে মোর উটোনের মাটি চষে ফ্যাল্‌চে ; দু' গণ্ডা পয়সা পরবী না দিতি পাল্যি সুমুন্দি আবাব দু' টাকা গুণাগার নাগাবে, গোট্টো বাছুট্টো নিয়ে ঘব !" মামুর তখন ভাগিনেয়ের দুঃখকাহিনী শুনিবার অবসর ছিল না ; তাহার বংশধর ন্যাপ্‌লা তখন আধ পয়সার গুড়ে ছাঁচের জন্য 'বাপ্‌জী'র কাপড় ধরিয়া টানাটানি করিতেছিল ; সুতরাং "চাষার নশিবে আল্লা দুস্‌কু নিকেচে, তার চারা কি ?"—এই বিজ্ঞোচিত সংক্ষিপ্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া মামু এক জোড়া চর্ম্মনির্ম্মিত 'বাদা'র দর করিতে লাগিল। বাদা বিক্রেতা, দর হাঁকিল চারি আনা ; মামু বলিল, চারি পয়সা ! সুতরাং এবার দোলে আর মামুর বাদা ক্রয় করা হইল না।

অতঃপর চাপরাসধারী জমাদার সরিয়তুল্লা মিঞা রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিল। মাছের দোকানদারগুলির কাছে আসিয়া মিঞা হাঁকিল, "এই বেটী ! বড় যে পচা মাছ বেচ্‌ছিস্ ? চল্ থানায় !" মেছুনী প্রমাদ গণিল ! 'দারোগা ছাহেবে'র নাগোরা জুতামণ্ডিত চরণযুগল ধরিয়া বলিল, "দোহাই হুজুর ! আমার এ জলজ্যান্ত মাছ ; পচা মাছ কি আন্‌তি পারি ?" 'দারোগা ছাহেবে'র হৃদয় কিছু কোমল হইল ; সে বলিল, "তা যদি জ্যান্ত মাছ হয় ত আমাকে কিছু দে ; আর পচা হয় ত বিক্রী কর্ত্তে পাবি নে, মাটীতে পোঁতা হবে।"—'সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ'—স্বার্থরক্ষায় ধীবরবধূও কম পণ্ডিত

নয়! সব যায়, সুতরাং 'দারোগা ছাহেব'কে কিছু দিয়া সে মৎস্য বিক্রয়ের ছাড় সংগ্রহ করিল।

গোবিন্দপুরের নিকটে এক পীরের দরগা আছে; ভারি জাগ্রত পীর, তিনি দেওয়ালে চড়িয়া দেশভ্রমণ করিতেন! দরগার ফকীরগণ ময়রার দোকান হইতে সির্ণি সংগ্রহ করিতে লাগিল; কোনও দোকানদার এক-মুঠা মুড়ি বা মুড়কী, কেহ খানদুই গুড়ে বাতাসা, কেহ বা একটি গুড়ে লাড়ু দান করিল। নানা লোকে নানা উপলক্ষে তোলা তুলিতে লাগিল; দোকানদারদের কোনও আপত্তি টিকিল না! এ-ও যেন মিউনিসি-পালিটীর ট্যাক্স; আপীল নিষ্ফল, এবং 'তোলা দিব না' বলিবার সাহস কাহারও নাই; কেন না, জমীদারের খাসের জমী। একজন সাহসী 'পুঁড়ো' (তরকারী-বিক্রেতা) জমীদারদের এক সরিকের পাইককে বলিল, "আরে, তুমি যে মশাই বড্ডা ঝক্‌মারিতে ফ্যালালে! তোলা নিবা এট্টা বাগুন, তা তুমি কুমড়োর মতন দুটো বাগুন টান্যে তুল্‌চো কেন কও তো?" জমীদারের পাইক খুব সপ্রতিভ; সে বলিল, "আমি ত কেবল ছোট সরিকের তোলাই তুল্‌চি, বড় আর মেজ সরিকের পাইকও আস্‌চে! ক'টা বেগুন তাদের দিতে হয় দেখিস্‌।" দোকানদার বেগতিক দেখিয়া বার্ত্তাকুর দর শস্তা করিয়া ফেলিল;—"শস্তঞ্চ গৃহমাগতম্‌।"

সন্ধ্যা গাঢ় হইয়া আসিল। দর্শকগণ গৃহে ফিরিতে লাগিল। বালক বালিকা, যুবক, বৃদ্ধেরা দলে দলে গোধূলির ধূলি উড়াইয়া চলিতেছে। দোকান-দারেরা তাহাদের অস্থায়ী দোকান তুলিবার জন্য ছোট ছোট কেরোসিনের টিমি জ্বালিতেছে। ছোট ছেলেরা গল্প করিতে করিতে বাড়ী ফিরিতেছে; একটা চাষার ছেলে তাহার 'ফুপুতো' ভাইকে বলিতেছে, "বাপ্‌জী মোরে

এক পয়সা দোলের পরবী দিয়েলো, মুই আদ পয়সার নাড়ু কিনে খায়েচি, আর আদ পয়সার মুড়কী কিনে লিয়ে যাচ্চি, কাল সক্কাল ব্যালা খাতি হ'বে।" অনেক দিন পরে তাহার লাড়ু ও মুড়কী খাইবার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে; সে তাহার মনের আনন্দ আর চাপিয়া রাখিতে পারিতেছে না! বালকবালিকাগণের অনেকেরই হাতে আজ সোলার পাক্কী, সোলার 'বাজিকন্যো', টীয়েপাখী, কাকাতুয়া; লোহার বঁটি, ছুরি; মাটীর পুতুল ও রং করা 'ছোবা'।

বড়লোকের ছেলেরা কেহ চাকরের স্কন্ধে, কেহ ঝির ক্রোড়ে গৃহে ফিরিতেছে; তাহাদের অঙ্গে শাটিনের পরিচ্ছদ, পায়ে রঙ্গিন মোজার উপর জরীর বা বিলাতী বার্ণিশ-জুতা, মাথায় সাচ্চার কারু-শোভিত মখমলের টুপি, এবং কণ্ঠে সোনার স্থূল গার্ড-চেন।

পূর্ণিমার শশধর পূর্ব্বগগনের ঊর্দ্ধে উঠিল; তখনও গোবিন্দদেব দোলমঞ্চ ত্যাগ করেন নাই। এক জন বৃদ্ধ পুরোহিত ঠাকুরের অদূরে টুলের উপর উপবিষ্ট; তাঁহার দৃষ্টি পথের দিকে। দোলমঞ্চের প্রত্যেক কার্ণিশে ও চূড়ায় প্রলম্বিত লাল নীল পীত হরিৎ নানা বর্ণের লণ্ঠনে দীপালোক প্রজ্বলিত; বিবিধ বর্ণের উজ্জ্বল আলোকমালায় মঞ্চ সুশোভিত।

চন্দ্রালোক আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সমগ্র প্রকৃতি বাসন্তী পৌর্ণমাসীর পূর্ণচন্দ্রের অমল ধবল স্নিগ্ধ কিরণে ভাসিতে ও হাসিতে লাগিল। দেশোয়ালীরা মাথার পাগড়ী হইতে পদনখর পর্য্যন্ত আবিরে রঞ্জিত করিয়া, মাদলের খচ-মচ শব্দে রাজপথ ধ্বনিত করিয়া গান গায়িতে গায়িতে দলবদ্ধভাবে ধনী-গৃহে হোলির পার্ব্বণী আদায়ের চেষ্টায় থালা লইয়া ঘুরিয়া

বেড়াইতেছে ;—কাহারও কাহারও আবিরে পূর্ণ থালার এক কোণে টাকা পয়সা। অদূরবর্ত্তী একটি দ্বিতল অট্টালিকারছাদে বসিয়া একজন বাঁশী বাজাইতেছে ; বাঁশীর সুর আনন্দোচ্ছ্বসিত, তাহা এই নৈশ বসন্তানিলের ন্যায় তৃপ্তিকর, বিহ্বলতাপূর্ণ।

দোলতলায় আর একটিও পুরুষমানুষের সমাগম নাই। বনপথ দিয়া গৃহস্থরমণীগণ দলে দলে দোল দেখিতে যাইতেছেন ; তাঁহাদের মস্তকে বনের ঘনচ্ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে, তাঁহাদের মুখে শুভ্র চন্দ্রকিরণ খেলা করিতেছে, তাঁহাদের কেশদামের উপর শুভ্র বস্ত্রপ্রান্ত মৃদু সমীরণে আন্দোলিত হইতেছে ; কাহারও নাসিকার নোলকের মুক্তা, কাহারও নথের মতি চন্দ্রালোকে এক একবার টল-টল করিতেছে ; কোনও রমণীর কোলে শিশু, সে তাহার মাকে দুই হাতে ঠেলিয়া বলিতেছে, "তিগ্‌গিল বালি তল, গুম্ এতেতে, মা, তোব !"—পুত্রের অনুযোগে মায়ের লক্ষ্য নাই, তিনি সঙ্গিনীগণের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে দোলমঞ্চের দিকে অগ্রসর হইতেছেন।

জঙ্গলবেষ্টিত সঙ্কীর্ণ বক্রপথ ঘুরিয়া রমণীগণ দোলমঞ্চে উঠিয়া গললগ্নীকৃতবাসে নতজানু হইয়া ঠাকুর প্রণাম করিতেছেন। কেহ বা দুই একটি পয়সা গোবিন্দদেবকে প্রণামী দিতেছেন ; যাঁহার কোলে ছেলে কিংবা মেয়ে আছে, তিনি তাঁহার শিশুর মাথা ধরিয়া তাহা দেবচরণে অবনত করিতেছেন।

রাত্রি ক্রমেই গভীর হইল। গ্রামখানি তখন সুপ্তিমগ্ন। মধ্যে মধ্যে পল্লীপ্রান্তস্থ বাগ্দীপাড়ার দুই একটা কুকুর বাগ্দীদের কুঁড়ের পাশে মান গাছের গোড়ায় ছাই গাদায় শুইয়া আহারান্বেষণ-রত ত্রস্ত শৃগাল দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বীরদর্প প্রকাশ করিতেছে ; এবং বিঞাজান হালসানার

অশীতিপর বৃদ্ধ পিতা মামুদ শেখ একটা মাটীর প্রদীপের সম্মুখে বসিয়া 'ঢেরা'র পাট কাটিতে কাটিতে অবসাদ-বিজড়িত ক্ষীণ কণ্ঠে গায়িতেছে,—

"ও! এক দিনও না দেখিলাম তারে!
আমার এই ঘরের কাছে আরসি-নগর—
তাতে এক পড়শী বসত্ করে।
পড়শী যদি আমার হ'ত,
তবে যম-যাতনা সকল যেত দূরে!
মরি হায় রে—
আবার, সে আর লালন এক স্থানে রয়,
তবু লক্ষ যোজন দূর রে!"

চড়ক

চড়ক

চৈত্রমাস বসন্ত ও গ্রীষ্মের সন্ধিস্থল। এই সময়ে পল্লীজীবনে নব আনন্দের হিল্লোল বহে। গম, ছোলা, যব, অরহর প্রভৃতি রবিশস্য পাকিয়া ঘরে উঠিয়াছে; সুতরাং দীর্ঘকালের অনাহারে শীর্ণকায়, ক্ষুধাতুর কৃষক-পরিবারে যে হর্ষের উচ্ছ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সুদীর্ঘ হিমযামিনীর অবসানে বসন্তের মলয়ানিলের মতই তৃপ্তিদায়ক।

পল্লীগ্রামে এ সময়ে তরিতরকারীরও অভাব থাকে না; বাগানে বাগানে কচি আম, গৃহপ্রাঙ্গণস্থ সজনে গাছে লম্বমান অসংখ্য সজনে-খাড়া, পুকুরের পাড়ে বেড়ার ধারে নিবিড়পত্র ডুমুর গাছে থোকা থোকা যগড়ুমুর, ও সঙ্কীর্ণকায়া মন্থরগামিনী তটিনীর উভয় তীরে যেখানে বালুকারাশি ভেদ করিয়া ছোট ছোট ঝরণা উঠিয়াছে, সেই সকল সুশীতল জলপূর্ণ ঝরণার চতুর্দ্দিকে সমুদ্গত সুস্বাদ শুশুনির শাক—প্রভৃতি দ্বারা এ সময় গ্রাম্য গৃহস্থগণের তরকারীর অভাব পূর্ণ হয়। প্রায় সকলের ঘরেই ময়দা, খেজুরে গুড়, যবের ছাতু ও ছোলার ডাল সঞ্চিত থাকে। যে সকল কৃষকের অবস্থা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল, তাহাদের দুগ্ধবতী গাভীরও অভাব নাই; অনেকেই ঘোল হইতে সঞ্চিত 'ননী' জ্বাল দিয়া ঘৃতেরও সংস্থান করিয়া রাখে; কেহ কেহ সর বাটিয়া তাহাই জ্বাল দিয়া ঘৃত প্রস্তুত করে; সুতরাং যখন কোন গোপপত্নী বা কৃষকরমণী তাহার 'দামাল' ছেলের কালো নধর শরীর প্রচুর তৈলে ও অল্প জলে অভিষিক্ত করিয়া,

এবং তাহা সযত্নে মুছাইয়া দিয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইতে পাড়াইতে বলে,

"খোকা যাবে মোষ্ চরাতে, খেয়ে যাবে কি ?
আমার, শিকের উপর গমের রুটী, তবলা ভরা ঘি !"

তখন এই সুন্দর ছেলেভুলান ছড়াটির সুরে ও তাহার প্রত্যেক কম্পনে কেবল যে সুকোমল মাতৃহৃদয়ের স্নেহমধুর উচ্ছ্বাসের পরিচয় পাই, তাহাই নহে, তাহাদের পারিবারিক জীবনের নিখুঁত চিত্র ও তৃপ্তিভরা সরল সুন্দর বৈচিত্র্যও নয়ন-সমক্ষে সুস্পষ্টরূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

আনন্দের এই পূর্ণ উচ্ছ্বাসকালে পল্লীগ্রামের কৃষক ও শ্রমজীবিগণ কয়েক দিনের জন্য একটি মহোৎসব-উপলক্ষে সমবেত হইয়া নানাপ্রকার আমোদে রত হইবে, ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ শিবোপাসনার অধিকারী, আবার হিন্দুর অধিকাংশ উৎসবের সহিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান অল্পাধিক-পরিমাণে বিজড়িত; সুতরাং চৈত্রমাসের শেষভাগে গাজনের ঢাক সজোরে বাজিয়া উঠে। চড়ক বঙ্গদেশের নিম্নশ্রেণীর সকল সম্প্রদায়স্থ হিন্দুর সর্ব্বপ্রধান পার্ব্বণ।

আমরা বাল্যকালে চৈত্রমাসের মধ্যভাগেই চড়কের ঢক্কাধ্বনি শুনিতে পাইতাম; এবং সেই সময় হইতেই পল্লীর হিন্দু কৃষক ও রাখালের দল, ঘরামী, মজুর প্রভৃতি শ্রমজীবিবর্গ কাজ ছাড়িয়া গাজনের আমোদে মত্ত হইত। আজকাল জীবন-সংগ্রাম কঠোর হইয়া উঠিয়াছে, কাজেই চড়ক-সংক্রান্তির এত বেশী আগে আর তাহাদের উৎসবে-মাতিবার অবসর নাই। এখন সংক্রান্তির আট দশ দিন পূর্ব্ব হইতেই চড়কের আয়োজন চলে।

প্রত্যেক গ্রামে গাজনের তিন চারিটি দল থাকে। কোন কোন গ্রামে দলের সংখ্যা আরও অধিক হয়। বিভিন্ন পাড়ায় সাধারণতঃ এক একটা

দল গঠিত হয়; প্রত্যেক দলে এক জন দলপতি থাকে, তাহাকে "মূল সন্ন্যাসী" বলে। মূল সন্ন্যাসী হইতে হইলে জাত্যংশে শ্রেষ্ঠ হওয়া যে একান্তই আবশ্যক, এরূপ নহে। কৈবর্ত্ত, গোপ, নাপিত, বণিক, গণ্ডকাদি সকল জাতির লোককেই মূল সন্ন্যাসী হইতে দেখা যায়; কিন্তু তাহার পরিণতবয়স্ক হওয়া আবশ্যক। শিবের সিংহাসন-বহন, উৎসবের কয় দিন নিয়মিতরূপে শিবপূজা, দলস্থ সন্ন্যাসীগণকে পরিচালিত করা মূল সন্ন্যাসীর প্রধান কার্য্য; এতদ্ভিন্ন তাহাকে আরও দুই একটি কঠিন কাজ করিতে হয়,— আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিব।

চড়ক-সংক্রান্তির দশ দিন পূর্ব্বে মূল সন্ন্যাসী ক্ষৌরকর্ম্ম দ্বারা পবিত্র হইয়া, ক্ষুদ্র কাষ্ঠসিংহাসনে একটি শিবলিঙ্গ স্থাপন পূর্ব্বক নিজের পাড়ার গাজনতলায় আখড়া জমাইয়া বসে। মহাদেবের এই সকল নৈমিত্তিক সেবক এ সময় তাহাদের বাড়ীতে থাকে না; কোনও বৃক্ষতলে বা বনান্তরালে ইহাদের যে আড্ডা নির্দ্দিষ্ট, আছে সেই আড্ডাই 'গাজনতলা' নামে প্রসিদ্ধ। প্রত্যেক পাড়ায় এক একটি গাজনতলা নির্দ্দিষ্ট আছে; যে বৎসর যে লোকই তাহার পাড়ার দলের মূল সন্ন্যাসী হউক,—নির্দ্দিষ্ট গাজনতলায় তাহাকে আড্ডা করিতেই হইবে।

গাজনতলার দৃশ্য বড়ই রমণীয়। নিকটে কোন দিকে কাহারও ঘরবাড়ী নাই। চারি দিকে আশ্শাওড়া ও ভাঁট-বন, ভাঁট ফুলের সৌরভে জঙ্গলটি আমোদিত; নিকটে দীর্ঘশীর্ষ নারিকেল-কুঞ্জ, মধ্যে মধ্যে দুই চারিটি সুপারি গাছ, দুই একটি তমাল বা বেলগাছ ও বাঁশের ঝাড়। বৎসরের অন্য সময় সেখানে জনসমাগম দেখিতে পাওয়া যায় না; কেবল এই সময়টিতেই যথানির্দ্দিষ্ট স্থান পরিষ্কার করিয়া সন্ন্যাসীর দল খর্জ্জুরপত্রা-

চ্ছাদিত ক্ষুদ্র কুটীরে শিবস্থাপনা করে, এবং সন্নিকটবর্ত্তী বট, পাকুড় বা তেঁতুল গাছের প্রচ্ছন্ন ছায়ায় আড্ডা পাতিয়া লয়।

ক্ষৌরকর্ম্মের পর মূল সন্ন্যাসী পৈতা গলায় দেয়; এ পৈতা ব্রাহ্মণের উপবীতের মত দীর্ঘ নহে, ইহা তাহারা গলায় ঝুলাইয়া রাখে। পৈতাগুলি হরিদ্রারঞ্জিত, তাহাতে এক একটি পিত্তলনির্ম্মিত অঙ্গুরী বা আংটা ঝুলিতে দেখা যায়।

মূল সন্ন্যাসীর সঙ্গে সেইদিনই অনেকে দাড়ি গোঁফ কামাইয়া সন্ন্যাসী হয়; চৈত্রসংক্রান্তির দশ দিন পূর্ব্বে যাহারা কামায়, তাহাদের ক্ষৌরকর্ম্মের নাম 'দশের কামান।' এই ভাবে ক্ষৌরকর্ম্মের দিন গণনা করিয়া পাঁচের কামান, তিনের কামান নাম হইয়াছে। ক্ষৌরকর্ম্মের পর ও উৎসব শেষ হইবার পূর্ব্বে এই সন্ন্যাসীদের গৃহকর্ম্মে যোগদানের নিয়ম নাই, দলের সঙ্গে ঘুরিয়া ভিক্ষাসংগ্রহ ও গাজনতলায় রাত্রিযাপনই ব্যবস্থা। সুতরাং যাহাদের অবসর অল্প, অথচ একটু সখও আছে, তাহারা অধিক দিন পূর্ব্বে না কামাইয়া তিনের কামানের দিন কামাইয়া সন্ন্যাসী হয়। অনেকে আবার মোটেই কামায় না, চড়কের দিন সন্ন্যাসীর দলে মিশিয়া বাণ ফুঁড়িয়া আমোদে মাতিয়া থাকে।

মূল সন্ন্যাসী ও তাহার অনুচরবর্গের হাতে বেতের এক রকম ছড়ি দেখা যায়; পাঁচ ছয়গাছি সরু বেত একত্র ঝাঁটার আকারে বাঁধিয়া এই ছড়ি প্রস্তুত হয়; শিবের জটার প্রতিনিধিস্বরূপ এই ছড়ি হাতে লইয়া সন্ন্যাসীর দলকে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায়।

সংক্রান্তি ক্রমে যতই নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, ঢাকের বাদ্য ততই উচ্চ হইয়া উঠে। সন্ন্যাসীদল ঘন ঘন "বলো শিবো মহাদেব, দেব!"

বলিয়া হুঙ্কার করিতে থাকে। চড়কের ঢাকের বাদ্য শুনিয়া ছোট ছোট ছেলেরা দলবদ্ধ হইয়া নাচিতে নাচিতে চীৎকার করে,—

"চড়ক চড়ক ড্যাড্যাং-ড্যাং,
পাব্‌দা মাছের দুটো ঠ্যাং!"

সংক্রান্তির দুই তিন দিন পূর্ব্ব হইতেই গাজনতলায় আমোদের ধুম পড়িয়া যায়। অপরাহ্নে বিভিন্ন গাজনতলার ঢাকের বিকট শব্দে কর্ণ বধির হয়, সন্ন্যাসিদলের অবিশ্রান্ত নৃত্যে মাটী কাঁপিতে থাকে! পাড়ার ছোট ছোট ছেলে মেয়ে হইতে বৃদ্ধ বৃদ্ধা গাজনতলার চারি দিকে সমবেত হইয়া তাহাদের উদ্দাম নৃত্য উপভোগ করে। অনেক কুলবধূ জল আনিবার ছলে কলসী কক্ষে লইয়া গাজনতলার পথে নদীতে যায়, এবং বৃক্ষের আড়ালে দাঁড়াইয়া, অবগুণ্ঠন ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া কৌতূহল-বিস্ফারিত নেত্রে এই দৃশ্য দেখিতে থাকে; কিন্তু বড় যা, শাশুড়ী, বা ননদের ভয়ে তাহারা সেখানে অধিক বিলম্ব করিতে পারে না।

নাচিতে নাচিতে যে সকল সন্ন্যাসীর অতিরিক্ত ভাবাবেশ হয়, তাহারা মাটীতে উপুড় হইয়া বসিয়া পড়ে, এবং অবনত মুখে ঢাকের তালে তালে মাথা নাড়িতে থাকে;—এই মুদ্রাটির নাম "বয়াল খাটা"। ভাবোন্মত্ত সন্ন্যাসিগণ শুধু 'বয়াল খাটিয়া'ই ছাড়ে না, বাদ্যের তালে তালে সবেগে মাথা নাড়িতে নাড়িতে 'হামা টানিয়া' অনেক দূরে চলিয়া যায়; কখনও বনে প্রবেশ করে, কখনও বা গর্ত্তে গিয়া পড়ে! শুনা যায়, যখনই তাহাদের উপর মহাদেবের 'ভর' হয়, তখনই উহাদের সংজ্ঞালোপ হয়; তখন ঢাক আরও জোরে জোরে বাজিতে থাকে, এবং অন্যান্য সন্ন্যাসীর কণ্ঠে "বলো শিবো মহাদেব দেব!" ধ্বনি ঘন ঘন উচ্চারিত হয়।

অনন্তর তাহারা সেই 'ভর'-প্রাপ্ত সন্ন্যাসীকে 'হাতসাঁই' করিয়া তুলিয়া লইয়া আসিয়া তাহার চৈতন্যসম্পাদনের চেষ্টা করে।

সংক্রান্তির আর এক দিন বিলম্ব আছে। সন্ন্যাসীরা শিবের সিংহাসন মাথায় লইয়া বিভিন্ন দলে গৃহস্থের বাড়ী-বাড়ী ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে। চাষার ছোট ছোট ছেলেরা বাজনার তালে তালে নাচিতে নাচিতে সন্ন্যাসীদের অনুসরণ করিতেছে। গৃহস্থেরা ইহাদিগকে সাধারণ ভিক্ষুকের মত অবজ্ঞা করে না; সকলেই ইহাদের ধামায় অধিক-পরিমাণে চাল ডাল দান করে। ভিক্ষা করিয়া যাহা পায়, সন্ন্যাসীরা সন্ধ্যাকালে স্নান করিয়া আসিয়া তাহা রাঁধিয়া মহানন্দে একত্র আহার করিতে বসে।

সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে গ্রামের সমুদয় সন্ন্যাসী সমবেত হইয়া দল বাঁধিয়া নদীকূলে চলিল; তাহার পর পূর্ব্বোক্ত 'বেতের ছড়' হাতে লইয়া জলে নামিয়া চড়কগাছের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। পূর্ব্বে পিঠ বা হাত ফুঁড়িয়া চড়কে 'পাক খাইবার' নিয়ম ছিল; কিন্তু একালে 'পিনাল কোডে'র ভয়ে ভক্তের দল সেই সনাতন প্রথা বর্জ্জন করিয়াছে। চড়ক-গাছ মহাশয়ও সেই সময় হইতে নদীর জলে গা ঢাকা দিয়া ঠাণ্ডা হইতেছেন! সংবৎসর পরে আজ সন্ন্যাসীরা সুদীর্ঘ চড়কগাছটিকে নদীর ভিতর হইতে তীরে টানিয়া আনিল, এবং যথারীতি পূজার্চ্চনা করিয়া আবার জলের মধ্যে ঠেলিয়া দিল। সন্ন্যাসীদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, এই চড়কগাছ বড় জাগ্রত দেবতা, ইনি সারা বৎসর নদীতে নদীতে ঘুরিয়া ঠিক সময়টিতে পূজা খাইবার লোভে পীঠস্থানে আসিয়া হাজির হন!

চড়কগাছের পূজা শেষ করিয়া সন্ন্যাসীরা ঢাকের সঙ্গে নাচিতে নাচিতে স্ব স্ব গাজনতলায় ফিরিয়া আসিল। এ দিন অন্নাহার নিষিদ্ধ; ফল খাইয়া রাত্রি যাপন করিতে হয়! ফলাহারের ব্যাপারটি গুরুতর আড়ম্বরে সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। দিবসে ভিক্ষায় বাহির হইয়া আজ তাহারা নানাপ্রকার ফলমূলাদি উপহার পাইয়াছে; কারণ এই দিন সন্ন্যাসীদের ফলদান করিলে গৃহস্থরমণীগণ পুণ্যের অধিকারিণী হইবেন বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। বাগানে বাগানে এখন সুপক্ক নোনা, বেল, পেঁপে, পেয়ারা প্রভৃতি ফলের অভাব নাই; পল্লী অঞ্চলে নারিকেল গাছও প্রচুর, সুতরাং ফলের দুর্ভিক্ষ হয় না। ফল ভক্ষণের সময় বাহিরের অনেক পরিচিত লোকও ইহাদের সঙ্গে যুটিয়া গেল; কিন্তু তাহাতে ইহাদের আপত্তি নাই, সন্ন্যাসী হইয়া ইহারা 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' মনে করে।

সারারাত্রি ঢাকের অশ্রান্ত আওয়াজে পল্লীবাসীদের কানে তালা লাগিয়া গেল। ঘন ঘন "বলো শিবো মহাদেব দেব!" শব্দে গ্রামখানি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অবশেষে রাত্রি গভীর হইলে ইহারা একত্র সমবেত হইয়া অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিল, এবং কণ্টকময় কুলের ডাল সেই আগুনে ফেলিয়া তাহার উপর দিয়া যাতায়াত করিতে লাগিল। এই ব্যাপারে বিস্মিত হইবার কারণ নাই; যখন ইহারা অগ্নিকুণ্ডে পদার্পণ করে, তখন ভস্ম ভিন্ন তাহাতে আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না, এবং কুলের ডালগুলির কণ্টকরাশিও ক্রমাগত ঘর্ষণে ঝরিয়া যায়।

রাত্রিশেষে 'কাকবলি' দেওয়া হইল। 'কাকবলি' জিনিসটি অতি অপূর্ব্ব! সন্ন্যাসীরা চড়ক পূজার সময় শিবেরই উপাসনা করিয়া থাকে,

সুতরাং শিবের অনুচর ভূতেরও মর্য্যাদা রক্ষা না করিলে পাছে তাহারা রাগ করে, এই ভয়ে সন্ন্যাসীরা এই দিন রাত্রে ভূতের প্রীতি-কামনায় কিঞ্চিৎ আহারের যোগাড় করে; এবং ভাত, শোল মাছের ঝোল ও অম্বল রাঁধিয়া, তাহা একটা মালসাতে তুলিয়া লইয়া শেষরাত্রে ভূত মহাশয়ের সন্ধানে বাহির হয়।

রাত্রি তিন চারিটার সময় সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী ও শুদ্ধাচারী মূল-সন্ন্যাসী সেই মালসাটি লইয়া নদীর দিকে অগ্রসর হইল; পাঁচ সাত জন বলবান সন্ন্যাসী প্রসারিত বাহুর শৃঙ্খলে তাহাকে বেষ্টন করিয়া চলিল, সঙ্গে সঙ্গে গাজনের ঢাক নৈশাকাশ প্রকম্পিত করিয়া বাজিতে লাগিল।

এক-বুক জলে নামিয়া মূল-সন্ন্যাসী মালসাটি জলে ভাসাইয়া দিল, এবং ভূতগণকে আহ্বান করিয়া সেই ভোগ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। সন্ন্যাসীরা বলে ভূতগণকে প্রায়ই এ জন্য অনুরোধ করিতে হয় না; মূল-সন্ন্যাসী জলে নামিতে না নামিতেই ভূত মহাশয়েরা আসিয়া তাহার হাতের মালসাটি ছোঁ মারিয়া লইয়া যায়! এমন কি, অন্য সন্ন্যাসীরা মূল-সন্ন্যাসীকে সবলে ধরিয়া না রাখিলে ভূতেরা তাহাকে পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যায়! বাল্যকালে প্রায়ই শুনিতাম, অমুক মূল-সন্ন্যাসী 'কাকবলি' দিতে গিয়াছিল, ভূতেরা ঝড়ের মত বেগে আসিয়া খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া গিয়াছে; অন্যান্য সন্ন্যাসীরা তাহাকে আটকাইয়া রাখিতে পারে নাই! পরদিন খুঁজিতে খুঁজিতে মূল-সন্ন্যাসীকে দুই তিন ক্রোশ দূরে নদীতীরস্থ কোনও শ্মশানে, বা অরণ্যের কোনও বৃক্ষমূলে, কিংবা কোনও উচ্চ বৃক্ষশাখায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। প্রবাদ আছে, ডুব দিয়া জল পান করিলে শিবের

সাধ্য নাই—তাহা তিনি টের পান ; কিন্তু শিবের অনুচরদের সম্বন্ধে এই প্রবাদ খাটে না। মূল-সন্ন্যাসী সম্পূর্ণ শুদ্ধাচারসম্পন্ন না হইলে ভূতেরা তাহা টের পাইয়া তাহাকে এইরূপে বিপন্ন করিয়া থাকে! কিন্তু এ সকল কথা আমরা বাল্যকালেই শুনিতে পাইতাম ; সভ্যতার প্রভাবে আজ কাল বোধ হয় ভূতেরা শান্তশিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের ঐ রকম দৌরাত্ম্যের কথা এখন আর শুনিতে পাওয়া যায় না।

চড়ক-সংক্রান্তির দিন সন্ন্যাসীরা সাজ সজ্জায় মনোনিবেশ করিল। অপরাহ্নে 'ধূপবাণ' খেলিতে হইবে, তাহারই আয়োজনে প্রভাত হইতেই ইহারা বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিল! সকল সন্ন্যাসীই তাহাদের পাড়ার অবস্থাপন্ন ভদ্র গৃহস্থের গৃহ হইতে রমণীগণের পট্টবস্ত্র, শান্তিপুরে ডুরে, বা গুলবাহার শাড়ী, ও গোট, চন্দ্রহার, চিক, পাঁচনর, বাজু, বালা, তাবিজ প্রভৃতি গহনা চাহিয়া আনিয়া অপরাহ্নের উৎসব-সজ্জার ব্যবস্থা করিল ; তাহার পর বাজার হইতে ধুনো কিনিয়া আনিয়া তাহা উত্তমরূপে পিষিয়া মালসায় সঞ্চয় করিল, এবং কতকগুলি ন্যাক্‌ড়ার ফালি তেলে ভিজাইয়া রাখিল। এই ধুনো ও তৈলসিক্ত বস্ত্রখণ্ড ধূপবাণের প্রধান উপকরণ।

এই দিন অপরাহ্নে কোন্ পাড়া হইতে কিরূপ সঙ্ বাহির হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য পাড়ায় পাড়ায় মজলিস্ বসিয়া গেল।

বেলা শেষ হইতে না হইতে চারি দিকে তুমুলরোলে ঢাক ঢোল বাজিয়া উঠিল। সন্ন্যাসীরা বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া এক একটি 'বাণ' লইয়া নদীতীরে সমাগত হইল। সন্ন্যাসীদের বাণগুলি দেখিতে অনেকটা স্বর্ণকারের সাঁড়াশীর মত, কিন্তু অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতর ; দণ্ডদ্বয়ের প্রান্তভাগ সূচ্যগ্রবৎ তীক্ষ্ণ, মাথার দিকে ঠোঁট বাহির করা ; তাহারই অদূরে এক

একটা সরু লৌহশৃঙ্খল সংযোজিত থাকে ;—কিন্তু মূল-সন্ন্যাসিগণকে কখন বাণ ফুঁড়িয়া খেলা করিতে দেখা যায় না।

মূল-সন্ন্যাসী দলস্থ সন্ন্যাসীদের সঙ্গে লইয়া শিবের সিংহাসন নদীতীরে বহিয়া আনিল।

এই সিংহাসন নদীকূলে নামাইয়া শিবের পূজা করা হইল। কোন কোন সন্ন্যাসী ধোপাদের কাপড় কাচিবার পাটের মত এক একখানি কাঠের পাট মাথায় বহিয়া নদীতীরে লইয়া আসিল ; তাহা সিন্দূরে রঞ্জিত করিয়া পূজা করা হইল। তাহার পর মূল-সন্ন্যাসী অন্যান্য সন্ন্যাসীদের চক্ষু পানের পাতা দিয়া ঢাকিয়া বাণের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ তাহাদের দুই পাঁজরের মাংসে বিঁধাইয়া দিল। সন্ন্যাসীরা বাণ ফুঁড়িয়া পূর্ব্বকথিত লৌহশৃঙ্খল দ্বারা সেই বাণটি গলার সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিল ;—ইহাতে এই সুবিধা হয় যে, যখন তাহারা দুই হাত তুলিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া নানা ভঙ্গিতে সবেগে নৃত্য করিতে থাকে, তখন বাণগাছটি পাঁজরের মাংস হইতে খুলিয়া পড়িতে পারে না। ছোট ছোট ছেলেরাও আজ বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া সখ করিয়া বাণ ফুঁড়িতে আসিয়াছে ; কিন্তু তাহারা মাংসভেদের কষ্ট সহ্য করিতে পারিবে না ভাবিয়া সন্ন্যাসীরা তাহাদের পাঁজরে গামছা জড়াইয়া তাহাতেই বাণ বিদ্ধ করিতেছে।

সন্ন্যাসীদের মধ্যে যাহারা বেশী সৌখীন, তাহারা বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইয়াই সন্তুষ্ট নহে, কাঠমল্লিকা ও আকন্দ ফুলের মালা গাঁথিয়া কেহ গলায় পরিয়াছে, কেহ বা বাবরীকাটা চুলের উপর মণ্ডলাকারে স্থূল মালা জড়াইয়া দিয়াছে। শিবের কাষ্ঠসিংহাসন গুলিও বহুসংখ্যক মাল্যে সুশোভিত।

বাণফোঁড়া শেষ হইলে বাণের মাথায় তৈলসিক্ত ধুনা-মিশ্রিত বস্ত্রখণ্ড জড়াইয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিল। বাণের মাথার সেই ন্যাকড়া মশালের মত সতেজে জ্বলিয়া উঠিল। তখন এক এক দল সন্ন্যাসী চক্রাকারে নাচিতে নাচিতে নদীতীর হইতে গ্রামের দিকে অগ্রসর হইল। অনেক আমোদলিপ্সু নিম্নশ্রেণীর লোক বাণ না ফুঁড়িয়াই এই দলের সঙ্গে মিশিয়া, উভয় হস্ত ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া ত্রিভঙ্গ হইয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। নাচিবার উৎসাহে কোনও কোনও সন্ন্যাসীর বাণের অগ্নিশিখা হঠাৎ তাহাদের পিঠে ঠেকিতেছে, কিন্তু সে দিকে তাহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। তাহাদের অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি ও উদ্দাম নৃত্য দেখিয়া, দর্শকগণ হাসিয়া পরস্পরের গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে গোবিন্দপুরের ক্ষুদ্র বাজার ও সংকীর্ণ রাজপথ জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল। বাজারে শিবমন্দির-প্রাঙ্গণে ও কালীবাড়ীতে বহুসংখ্যক স্ত্রীপুরুষের সমাগম হইল। হাসি, গল্প, গান ও উচ্চ কোলাহলে উৎসবক্ষেত্র গম্‌গম্‌ করিতে লাগিল! অনেক পুত্রবৎসল চাষী তাহাদের দুই তিন বা ততোধিক বৎসর বয়সের ছেলেদের নীলাম্বরী বা লাল কাপড় পরাইয়া, কোমরে লাল চাদর কিংবা রাণী-মার্কা ও নোট-মার্কা চিত্র-বিচিত্র রুমাল বাঁধিয়া, তাহাদিগকে কাঁধে লইয়া সেই জনতার মধ্যে সদম্ভে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

সন্ধ্যার অনেক পূর্ব্ব হইতেই নানারকম সঙ বাজারে আসিয়া হট্টগোল করিতে লাগিল। স্থূল রসিকতা দ্বারা সাধারণ দর্শকগণের মুখে হাস্যরসের সঞ্চার করাই তাহাদের সঙ্‌ সাজিবার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহাদের আমোদের এই উপলক্ষগুলি লক্ষ্য করাও অল্প আমোদের বিষয় নহে। কেহ বাঘের

মুখোস্ পরিয়া, চিটেগুড় ও কতকগুলি শিমুলের তূলার সাহায্যে কৃত্রিম লোম গায়ে লাগাইয়া, এবং চাদর পাকাইয়া লেজ করিয়া বাঘ সাজিয়া বাহির হইয়াছে! একটি লোক তাহার গলার দড়িগাছটি ধরিয়া অগ্রসর হইতেছে, আর সেই বাঘের সঙ্ হাতে ও পায়ে ভর দিয়া তাহার অনুসরণ করিতেছে। তাহার চারি দিকে প্রায় পঞ্চাশ জন দর্শক! কোন কোন সাহসী চাষার ছেলে রহস্যচ্ছলে সেই নর-শার্দ্দুলের লাঙ্গুল আকর্ষণ করিতেছে, আর সে 'হালুম্' শব্দ করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে যাইতেছে; সঙ্গে সঙ্গে সকলে সন্ত্রস্তভাবে চারি দিকে দৌড়াইয়া পলাইতেছে, এবং তাহাদের উদ্ঘাটিত মুখবিবর হইতে হাস্যরস সশব্দে উৎসারিত হইয়া উঠিতেছে।

বাজারের আর এক অংশে এক জন 'বাবাজী' অন্য একটি বাবাজীর সেবাদাসীটাকে চুরী করিয়া লইয়া যাইতেছে; তাহাদের হস্তে খঞ্জনী; মিলিত কণ্ঠে তাহারা সরু মোটা সুরে গায়িতেছে,—

"বেলা গেল ও ললিতে! কৃষ্ণ এল না;
আমার, মনের কথা রৈল মনে 'প্রেকাশ' হ'লো না!"

উভয়ে গান গায়িয়া চলিতে চলিতে পথিমধ্যে এক প্রচণ্ড বাধা উপস্থিত! বৈষ্ণবী-হারা বাবাজী ব্যাকুলভাবে দৌড়াইয়া আসিয়া সঙ্গীতমত্ত বোষ্টুমীচোর বাবাজীকে আক্রমণ করিল, ও বাবাজীর স্কন্ধ-প্রলম্বিত ঝোলা ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল! ক্রমে উভয় পক্ষে প্রচণ্ড বচসা, তাহার পর কিলোকিলি আরম্ভ হইল। হ্যাঁচ্‌কা টানে বাবাজীদের কালীমাখা পাটের দীর্ঘ টিকি ও গলার তিনকণ্ঠি মালা ছিঁড়িয়া পথের ধূলায় লুটাইতে লাগিল; তাহাদের ঝুলির ভিতর হইতে পাঁঠার ঠ্যাং

ও মদের বোতল বাহির হইল! ইত্যবসরে আর একটি লুব্ধ বাবাজী আচম্বিতে সেখানে আসিয়া বোষ্টুমীটাকে ইসারা করিবামাত্র সে—

"মনের কথা রৈল মনে 'প্রেকাশ' হ'লো না!"

গানের এই চরণটি গায়িতে গায়িতে নবাগত সেই বাটপাড় বাবাজীর গলা ধরিয়া একদিকে সরিয়া পড়িল!

ক্রমে সন্ধ্যা গাঢ় হইয়া আসিল। বাজারের দোকানে দোকানে, গৃহস্থের গৃহে গৃহে সান্ধ্য-দীপ জ্বলিয়া উঠিল। সন্ন্যাসীর দল নানা রাস্তা ঘুরিয়া গ্রাম্য জমীদারের বাড়ীর সম্মুখে কিয়ৎকাল 'ধূপবাণ' খেলিয়া বাজারে প্রবেশ করিল; তখন বাজারের আমোদ সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে জমাট্ বাঁধিয়া উঠিল।

খেলা দেখাইয়া ক্রমে এক দল যাইতেছে, আর এক দল আসিতেছে; ঢাক বাজিতেছে, সন্ন্যাসীদের পা সমতালে উঠিতেছে, নামিতেছে, ঘুরিতেছে; বাণের ডগায় ধ্বক্-ধ্বক্ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে; এবং মিনিটে মিনিটে সেই অগ্নিতে এক এক মুঠা ধুনোর গুঁড়া নিক্ষিপ্ত হইতেছে, আর সকল সন্ন্যাসীর বাণের আলো এক সঙ্গে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে! আলোকদীপ্ত কুণ্ডলীকৃত ধূম অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশতল বহু দূর পর্য্যন্ত আলোকিত করিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে আরও জোরে জোরে ঢাক বাজিয়া উঠিতেছে; বস্ত্রালঙ্কারপরিহিত পুষ্পদাম-বিভূষিত সন্ন্যাসীর দল উন্মত্তপ্রায় হইয়া বাহুদ্বয় শূন্যে তুলিয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া আরও অধিক উৎসাহের সহিত নাচিতেছে; এবং সমস্বরে হুঙ্কার দিতেছে, "বলো শিবো মহাদেব দেব!"—তাহাদের পরিধেয় সর্ব্বাঙ্গ-প্রবাহিত ঘর্ম্মধারায় সিক্ত; পুষ্পদাম শিথিল ও স্বস্থানভ্রষ্ট; কণ্ঠের চিকে, হাতের তাবিজ, বাজু ও বালায় বাণের অগ্নি প্রতিফলিত; পদপ্রান্তের নূপুর-ধ্বনি ঢাকের বিকট শব্দে সমাচ্ছন্ন।

এইভাবে চক্রাকারে নাচিতে নাচিতে গ্রামের সকল দল বাজার অতিক্রম করিয়া প্রথমে শিবমন্দির-প্রাঙ্গণে, তাহার পর কালীতলায় সমবেত হইল। সেখানে অনেকক্ষণ নৃত্য প্রদর্শনের পর ভিন্ন ভিন্ন দল গ্রামস্থ বড় লোকদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া গাজনতলায় ফিরিয়া আসিল এবং নবোৎসাহে পুনর্ব্বার নৃত্য আরম্ভ করিল!

ক্রমে রাত্রি গভীর হইলে গাজনতলার ঢক্কাধ্বনি ও কলরব থামিয়া গেল। ক্ষুদ্র গ্রামখানি প্রচণ্ড আনন্দোচ্ছ্বাসের পর যেন শ্রান্তিভরে অবসন্ন হইয়াই ঘুমাইয়া পড়িল। কেবল আকাশের অগণ্য নক্ষত্র স্তিমিত নেত্রে স্তব্ধ গ্রামখানির দিকে চাহিয়া রহিল, এবং চৈত্রের উদ্দাম উদাস বায়ুপ্রবাহে প্রস্ফুটবকুলের ও নিম্বমঞ্জরীর মৃদু সৌরভ অন্ধকারাবৃত প্রকৃতির বিস্তীর্ণ বক্ষে ভাসিয়া যাইতে লাগিল; বোধ হইল, আজ এই অবসানোন্মুখ বৎসর তাহার অতীত সুখ ও দুঃখের, হর্ষ ও বিষাদের বিচিত্র স্মৃতিভার বক্ষে লইয়া, তিমিরাবগুণ্ঠিতা নিদ্রাহীন মৌন বিরহাশঙ্কাকুলা নিশীথিনীর ক্রোড়ে মস্তকস্থাপন করিয়া, নিবিড় রহস্যমণ্ডিত অনন্ত আকাশের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া অন্তিম দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছে!

STATE LIBRARY
18, NOV. 1924.

সম্পূর্ণ।